আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-৫

কুরআন, কোয়াসার শিঙ্গায় ফুৎকার

মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

সিঙ্গায় ফুৎকার

কল্পনাতীত এক
মহাবিপর্যয়কর
অবস্থার প্রচণ্ডতা ও
ভয়াবহতা বুঝাবার
জন্যই আল-কুরআন
'শিঙ্গায় ফুৎকার'
নামক বাগধারা
ব্যবহার করেছে।

কুরআন, কোয়াসার ও শিঙ্গায় ফুৎকার

THE QURAN, THE QUASAR AND THE BUGLE CALL

"এ লোকদের সম্মুখে এসে গেছে সেই সংবাদ, যাতে আল্লাহ্দ্রোহিতা থেকে বিরত রাখার বহু শিক্ষাপ্রদ উপকরণই নিহিত রয়েছে এবং এমন পরিপূর্ণ বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ রয়েছে, যা উপদেশ দানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণমাত্রায় পূরণ করে।"

(৫৪ ঃ ৪-৫)

আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-৫

কুরআন কোয়াসার শিঙ্গায় ফুৎকার

(প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক)

মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনা

ড. এস এম আজহারুল ইসলাম

প্রফেসর, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাপ্তিস্থান

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (নীচতলা), ঢাকা।

কুরআন, কোয়াসার ও শিঙ্গায় ফুৎকার

মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন
পরিচালক
দি ডিভাইন লাইট রিসার্চ সেন্টার
মোবাইল ঃ ০১৯১৫৯৮৩৭৪৮

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
র‍্যাক্‌স পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯

পরিবেশনায়
- আহসান পাবলিকেশন
- মক্কা পাবলিকেশন্স
- খেয়া প্রকাশনী

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও ছাপা
র‍্যাক্‌স প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-873-001-1

RAQS Publications Series- 08

Al-Quran the true Science, Series-5

The Quran, The Quasar and The Bugle Call

(Scientific findings Confirmed)
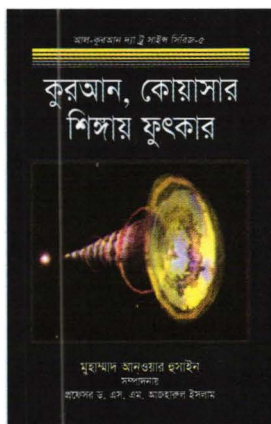
Mohammad Anwar Hossain

উৎসর্গ

এ পৃথিবীতে মানব জাতির জন্য তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়েত আল্-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সেই মহান প্রভু ও মালিক আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে নোবেল বিজয়ী যাঁরা

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সম্মানজনক এবং অর্থের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান পুরস্কারটি হচ্ছে নোবেল পুরস্কার। সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড বেনহার্ড নোবেল উইল করে তাঁর নিজের অর্থ দ্বারা নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন করেন। মোট পাঁচটি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রতি বছর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হয়। এই পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম দু'টি ক্ষেত্র হলো পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত যাঁরা পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানে বিশেষ অবদান রাখার জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তাঁদের পুরস্কার বিজয়ের সাল ও বিষয়ের তালিকা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে দেয়া হলো।

পদার্থ বিজ্ঞানে যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেলেন

- ১৯১১ সালে জার্মান বিজ্ঞানী Wilhelm Wien তেজস্ক্রিয় (Radiation) তত্ত্বের নিয়মগুলো উদঘাটনের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।
- ১৯১২ সালে সুইডিস বিজ্ঞানী Nils Gustar Dalen কে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় lighting buoys-এর স্বয়ংক্রিয়রেগুলেটর আবিষ্কারের জন্য।
- ১৯১৩ সালে পেয়েছেন প্রফেসর এইচ. ক্যামেরলিং ওন্‌স (লেইডেন) নিম্নতাপে বস্তুর ধর্ম অনুসন্ধান ও সেই সাথে তরল হিলিয়াম উৎপাদনের জন্য।
- ১৯১৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী M. Fon laue ক্রাইস্টালব্যবহার করে X-ray-র diffraction সম্পন্ন করার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভকরেন।
- ১৯১৫ সালে ইংল্যান্ডের দু'জন বিজ্ঞানী Sir William Bragg এবং Sir lawrence Bragg নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন X-ray ব্যবহার করে Crystal-এর গঠন ব্যাখ্যা করার জন্য।
- ১৯১৬ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়নি।
- ১৯১৭ সালে X-ray-র উপাদান আবিষ্কার করার জন্য ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী Charles Barkla কে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।
- ১৯১৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী Prof. Max Plank-কে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশেষ কৃতিত্বস্বরূপ 'এনার্জি কোয়ান্টাম থিওরী' উদ্ভাবনের জন্য।

- ১৯১৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী Johannes Stark কে Doppler shift আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- ১৯২০ সালে সুইচ বিজ্ঞানী Charles Guillaume নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নিকেল ও ইস্পাত জাতীয় শঙ্কর ব্যবহার করে পদার্থ বিজ্ঞানে পরিমাপের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি আবিষ্কার-এর জন্য।

রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন যাঁরা

- ১৯১১ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী Marie Curie রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম ধাতু আবিষ্কার করার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৯১২ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী Victor, Grignard গ্রীগনার্ড বিকারক আবিষ্কার করার জন্য এবং একই দেশের অপর বিজ্ঞানী Paul Sabatier তার আবিষ্কৃত Hydrogenating compound পদ্ধতির জন্য যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৯১৩ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী 'Alfred Werner' অণুর ভেতর পরমাণুর সংশ্লিষ্টতার তথ্য উদ্‌ঘাটনে কাজের কৃতিত্বস্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৯১৪ সালে বিজ্ঞানী T.H.W. Rechards পদার্থের অনেকগুলো রাসায়নিক উপাদানের পারমানবিক ওজন আবিষ্কার করার জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।
- ১৯১৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী Richard Willstatter উদ্ভিদের ক্লোরোফিল-এর উপরে বিশেষ গবেষণা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার পান।
- ১৯১৬ সালে এবং ১৯১৭ সালে রসায়নে কোনো নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়নি।
- ১৯১৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী 'Prof. Fritz Haber' কে Ammonia-র উপর Synthesis কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- ১৯১৯ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়নি।
- ১৯২০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী 'Walther Nerrst' কে Thermo-chemistry-র উপর কাজের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রকাশকের কথা

'আল্হামদুলিল্লাহ্' অবশেষে মহান রাব্বুল 'আলামিন তাঁর বিশেষ করুণায় আমাদের প্রকাশিত সিরিজের ৫ম খণ্ডটিও প্রকাশ করার তাওফীক দান করলেন। এতে আমাদের কোন প্রকার কৃতিত্ব নেই। সমস্ত কৃতিত্বই একমাত্র তাঁর, আমরা শুধু আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র।

সুধী পাঠক! বক্ষমান ৫ম খণ্ডটি আপনাদের জন্য বহন করে নিয়ে এসেছে পরকালীন অদৃশ্য বিষয়ের ডালিপূর্ণ 'সত্য তথ্য ও তত্ত্ব', যা অধ্যয়নের মাধ্যমে আপনি বৈজ্ঞানিক বাস্তব প্রমাণের ভেতর দিয়ে বিশ্বাসের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের কাঙ্ক্ষিত সুযোগটি লাভ করতে সমর্থ হবেন। সাথে সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে আধ্যাত্মিকতার জ্ঞানময় সিঁড়িতেও কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারবেন ইন্শাআল্লাহ্। এর মাধ্যমে আপনার অন্তরের চক্ষুও যে আরো অধিকতর সুদূর প্রসারি দৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হবে মহাসত্যের পানে, সে ব্যাপারেও আমরা আশাবাদী।

উল্লিখিত বিষয়গুলো আপনার, আপনার পরিবার, আপনার সমাজ ও চারপাশের মানুষগুলোর কল্যাণময় চলার পথে, পূর্বের তুলনায় আরো মজবুত ও দৃঢ়ভাবে আরো আশা-ভরসার সাথে নির্ভয়ে সবার অগ্রযাত্রায় সাথী হয়ে থাকুক– এই কামনা করছি।

লেখকের কথা

'আল্ হামদুলিল্লাহ্', চিরবহমান সময়ের ছুটে চলা স্রোতের বাহনে দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর বিশেষ করুণার মাধ্যমে আমাদের প্রিয় সিরিজের ৫ম খণ্ডটিও প্রকাশিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করে সত্যিকার অর্থেই আমাদেরকে ধন্য করলেন, সেজন্য আমরা তাঁর শাহী দরবারে অবনত শিরে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আমাদের এ সিরিজের শুরু থেকেই কোনো কাজে কখনো আমাদের ব্যক্তি বিশেষের কোনো প্রকার কৃতিত্ব নেই এবং থাকবেও না, আমরা আল্লাহর নিতান্তই গোলাম, আমাদের একমাত্র কাজই হচ্ছে আমাদের চিন্তা, ভাবনা, গবেষণা ও সার্বিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এর বাইরে কি পেলাম, কি পেলাম না তা আমাদের ভাবার বিষয় নয়। উল্লিখিত কথাগুলোর গণ্ডির মধ্যে আমাদেরকে দাঁড়াবার জন্য তিনি যে বাছাই করেছেন এবং সামগ্রিকভাবে তাওফীক দিয়েছেন সেজন্যও আমরা চিরদিন তাঁর কাছে (গোলামীর সম্পর্কে) ঋণী থাকবো।

সুপ্রিয় পাঠক, আমাদের এ ৫ম খণ্ডটি মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের মাধ্যমে এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, যে বিষয়গুলো পরকালীন জগতের আওতায়

থাকায় এতদিন প্রকৃত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হলেও এবার সেগুলো দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে পাঠককুলকে উপকৃত করবে ধারণাতীতভাবে। সাথে সাথে ইহ্‌কাল ও পরকাল সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্যও জানা যাবে অবলীলাক্রমে।

এছাড়াও খণ্ডটিতে মহাবিশ্বব্যাপী মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তা'আলার গোলামীর মহাবিস্ময়কর যে 'একই নিয়ম' সর্বত্র চালু করেছেন তিনি তাঁর মহাজ্ঞান দিয়ে, সেই অভূতপূর্ব জ্ঞানময় বিষয়টি এখানে আলো ছড়িয়েছে বিধায় পাঠক সমাজ অধ্যয়ন করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই মাথা অবনত করে মহান প্রভু আল্লাহ্‌র সম্মুখে ধন্য হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

'আল্‌-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ' প্রতিটি খণ্ডের মাধ্যমে অল্প অল্প করে হলেও এ মহাবিশ্বের প্রকৃত সত্য ও সঠিক জ্ঞানের অধিকতর নিকটবর্তী হতে সকল সম্মানিত পাঠককে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখুক এবং বিনিময়ে প্রাপ্ত জ্ঞানের আলোকে পাঠক সমাজ মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হোন, এ কামনায় শেষ করছি।

মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান নিবেদন করছি সেই মহান স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যিনি 'আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' সিরিজের ৫ম খণ্ডটিও সম্পাদনের তাওফীক আমাকে দিলেন। আশা করি খণ্ডটি প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত পাঠক সমাজের অপেক্ষার পর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে সাময়িক প্রশান্তির ঝরনাধারা মনের মাঝে বইয়ে দিতে সক্ষম হবে। ৫ম খণ্ডটি এমন অনেকগুলো প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাহার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যে বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা কিংবা সমাধান পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন পাঠক সমাজ হন্যে হয়ে ফিরছিলো। আশা করা যায় এবার তাদের সে কষ্টের এবং আকাঙ্ক্ষার অবসান হবে। এছাড়া এমন কিছু বিষয় নতুনভাবে তাদের নিকট মেলে ধরবে, যে বিষয়গুলো অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ একজন বিশ্বাসী মানুষের জন্যে, অথচ তা জানার কোনো প্রকার আগ্রহ তাঁরা এতদিন অনুভবই করতে পারেননি।

বক্ষমান খণ্ডে আলোচিত পরকাল বিষয়ক তথ্যগুলো পাঠক সমাজকে যে মহাবিশ্বের মৌলিক জ্ঞানের দিকে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি আকর্ষিত ও উৎসাহিত করবে, তা নিশ্চিতভাবেই আশা করা যায়। কারণ অনিশ্চয়তায় ভরা এ মহাবিশ্বে বস্তু দিয়ে সৃষ্ট ইহ্‌জগতের তুলনায় প্রতিবস্তু দিয়ে সৃষ্ট পরজগতই বেশি বাস্তবতায় পরিপূর্ণ। আর সেই বাস্তব পরজগতের তথা অদৃশ্য-আজানা জগতের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বুকে নিয়ে এ খণ্ডটির আগমন ঘটেছে বিধায় আমরা সবাই অধ্যয়নের মাধ্যমে বর্ণনাতীত সাফল্যের যে সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হবো, তা আর না বললেও বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। প্রকাশিত ৫টি খণ্ড এবং প্রকাশিত হওয়ার পথে আরো অনেকগুলো খণ্ড 'পৃথিবী' নামক এ বিশ্বে সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে তাদের সঠিক গন্তব্য জান্নাতের পথেই দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুক। আমিন।

ড. এস এম আজহারুল ইসলাম

সূচি	পৃষ্ঠা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ১৫
কোয়াসার জাহান্নামের বিস্ময়কর নিদর্শন ১৯
বৃহৎ বৃহৎ অগ্নি লেলিহান শিখা ৫৫
ধ্বংস সাধন এক ও অভিন্ন ৫৭
বিজ্ঞান 'পুলসিরাত'কে মেনে নিয়েছে ৫৯
মহাভয়ঙ্কর অগ্নি লেলিহান শিখা (Flare) ৬৯
জাহান্নাম-এর জ্বালানী হচ্ছে পাথর 'ইউরেনিয়াম' ৭২
আল-কুরআন-এ বিগ-ব্যাংগ ৯৫
একই নিয়মে গোলামী ১২৩
নক্ষত্রবিহীন পরকাল আল্লাহ্‌র 'নূর' দিয়ে আলোকিত হবে ১৮৩
শিঙ্গায় ফুৎকার ২৪৭
শেষ কথা ২৯১

মহাগ্রন্থ 'আল্-কুরআন'

আমাদের আবাসস্থল 'পৃথিবী' নামক এ বিশ্বে আগত সমগ্র মানব জাতির জন্য মহাবিশ্বের এক ও একক মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ আল্-কুরআনে এমন সব উক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর বর্ণনা রয়েছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত। বাস্তবতার নিরীখে যখন দেখা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানের নানা ধরনের আবিষ্কারের সঙ্গে কুরআনের ঐ সকল তথ্যসমূহ হুবহু মিলে একাকার হয়ে যায়, তখন একথা ভাবতে পারা যায় না যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এসবের সমন্বয়ে যে কুরআন তা চৌদ্দশত বছর পূর্বে মুহাম্মদ (সা) দ্বারা বা অন্য কোনো মানুষ দ্বারা রচিত হয়েছিল। এ উপলব্ধি আরো দৃঢ় হয় যখন লক্ষ্য করা যায় যে, কুরআনে এমন সব আয়াত বা উক্তি রয়েছে, যার সঠিক অর্থ গ্রহণ পূর্বের শতাব্দিগুলোতে জ্ঞানী-গুণীজনের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না, বর্তমান বিংশ শতাব্দিতে এসেই কেবল অত্যাধুনিক আবিষ্কার, গবেষণা ও তথ্য-জ্ঞানের পরিমাপে সেসবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, 'আল্-কুরঅন' একখানা যুগোপযোগী অতুলনীয় 'ক্রমবিকাশমানমহাগ্রন্থ'। মানব জাতির জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে এর বিকাশ ঘটছে এবং এ ধারা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্তই চলতে থাকবে।

আবার কুরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত এমন তথ্যেরও সম্মুখীন হতে হয় যা বর্তমান সময় পর্যন্ত আহরিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও জ্ঞান দ্বারা সঠিকভাবে অবহিত হওয়া সম্ভবপর নয়। সেজন্য বর্তমান 'বিজ্ঞান'কে আরো অনেক অগ্রসর হতে হবে। কারণ 'আল্-কুরআন' সর্বশেষ আসমানি কিতাব হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে সব মানুষের জন্য, মহাকালের জন্য, একথা আমাদের সবারই জানা থাকতে হবে।

আল্-কুরআন : "আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য সহজ করে দিলাম। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কী?" (৫৪ : ১৭)
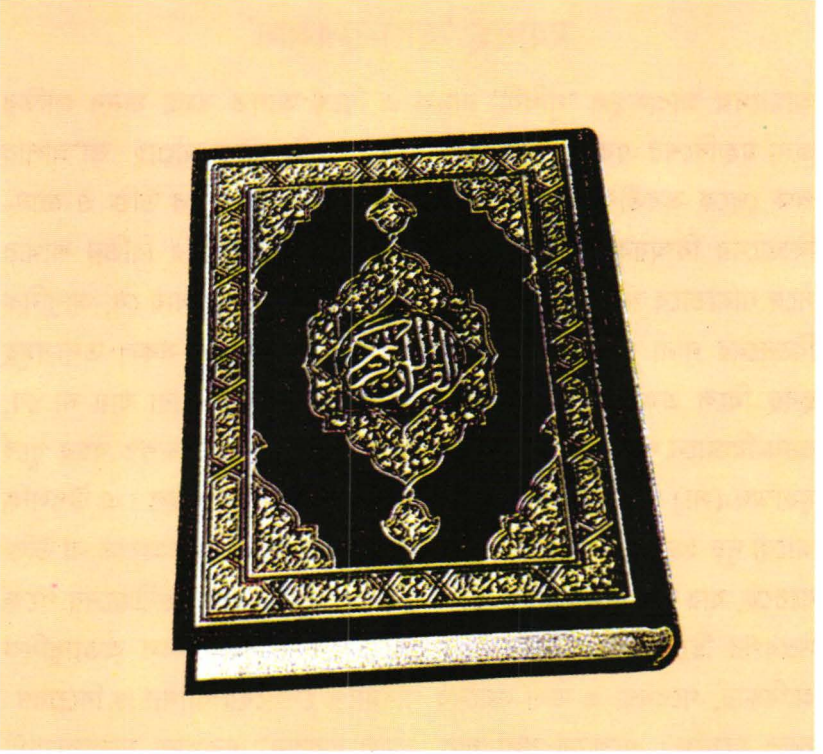
মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন মূলতই এ মহাবিশ্বের মালিক ও স্রষ্টা এক ও একক 'আল্লাহ্' তা'আলার-ই পবিত্র বাণী সম্ভার। সেই কারণে পবিত্র কুরআনের পাতাসমূহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য মু'জেযা দিয়ে ভরপুর হয়ে রয়েছে। অধ্যয়ন করতে গিয়ে মানব সমাজ বার বার তার সম্মুখীন হচ্ছে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে যে, অতুলনীয় এ কুরআন কোন মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। আসলেই কুরআনের রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন, যিনি মহাজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান। যিনি সকল প্রকার দুর্বলতার উর্ধ্বে।

তাই তিনি মানুষ সৃষ্টি করে তার সুষ্ঠু জীবন নির্বাহকল্পে এ কুরআন মানব সমাজে অবতীর্ণ করে আমাদের প্রতি সত্যিকার অর্থেই বিশাল অনুগ্রহ করেছেন, যেন আমরা কুরআন অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে তাঁর প্রিয় বান্দাহ্ হতে পারি। তাহলে চলুন না! আমরা সবাই সেই অনন্য তুলনাহীন কল্যাণময় পথে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে এগিয়ে যাই!

'আল্-কুরআন'-এর যে বিষয় এ যাবত কালের বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে বুঝা যাবে না, তা বুঝার জন্য অবশ্যই ভবিষ্যতে আরো জ্ঞান-সাধনা করে এগিয়ে যেতে হবে, কেননা জ্ঞানার্জনের কোন শেষ যে নেই!

সুবিখ্যাত আল্লামা ফকীহ আবদুল লায়স সমরকন্দী (রহ) তাঁর বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে তাজবীদের ওস্তাদ আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ হতে নিম্নে বর্ণিতভাবে আল্-কুরআনের একটি গ্রহণযোগ্য পরিসংখ্যান দান করেছেন। চলুন আজ আমরা অতুলনীয় মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের সেই গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানটি একবার দেখে নেই। মোট সূরার সংখ্যা : ১১৪, তন্মধ্যে মক্কী সূরা= ৯৩, মাদানী সূরা= ২১টি, মোট আয়াত= ৬৬৬৬টি, শব্দ সংখ্যা= ৮৬৪৩০টি, হরফের সংখ্যা= ২২১২৬৫টি, তার মধ্যে আলিফ= ৪৮৮৭২টি, বা= ১১২২৮টি, তা=১১৯৯টি, ছা= ১২৭৬টি, জীম= ৩২৭৩টি, হা= ৭৭৩টি, খা= ২৪১৬টি, দাল= ৫৬৪২টি, যাল= ৪৬৯৭টি, রা= ১১৭৯৩টি, যা= ১৫৯০টি, সীন= ৫৮৯১টি, শীন= ২২৫৩টি, সোয়াদ= ২০১৩টি, দোয়াদ= ১৬০৭টি, ত্ব= ১২৭৪টি, যা= ৮৪৬টি, আইন= ৯২২০০টি, গাইন= ২২০৮টি, ফা= ৮৪৯৯টি, ক্বফ= ৬৮১৩টি, কাফ= ৯৫২২টি, লাম= ৩৪৩২টি, মীম= ২৬৫৩৫টি, নুন= ২৬৫৬০টি, ওয়াও= ২৫৫৩৬টি, হা= ১৯০৭০টি, লাম আলিফ= ৩৭২০টি, হামযা= ৪১১৫টি, ইয়া= ২৫৯১৯টি।

হরকতের সংখ্যা : যবর= ৫৩২৪২টি, যের= ৩৯৫৮২টি, পেশ= ৮৮০৪টি, নুকতা= ১,০৬,১৮৪টি, মদ= ১৭৭১টি, তাশদীদ= ১২৫২টি।

আরবের লোকদের মাতৃভাষা হচ্ছে আরবী, আর এজন্য তারা 'হরকত' ছাড়া কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে পারতেন, কিন্তু 'ইসলাম' যখন আরব ভূ-খণ্ড অতিক্রম করে চতুর্দিকে অন্যান্য ভূ-খণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন অনারবদের জন্য হরকতের আবশ্যকতা বোধ করে ৮৬ হিজরী সালে 'হাজ্জাজ বিন্ ইউসুফ' কুরআন শরীফে হরকত সংযোজন করতে আদেশ

প্রদান করেন। তখন থেকেই কুরআনে হরকত চালু হয়ে যায়। ফলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী সবার জন্যই কুরআন তিলাওয়াত সহজ হয়ে যায়।

আয়াতের শ্রেণী বিভাগ : ওয়াদা= ১০০০ আয়াত, ভীতি প্রদর্শন= ১০০০ আয়াত, আদেশ= ১০০০ আয়াত, নিষেধ= ১০০০ আয়াত, হালাল বিষয়ক= ২৫০ আয়াত, হারাম বিষয়ক= ২৫০ আয়াত, দৃষ্টান্ত= ১০০০ আয়াত, ইতিহাস= ১০০০ আয়াত, আল্লাহ্ পাকের 'তসবীহ সম্বন্ধীয়= ১০০ আয়াত, নামায বিষয়ক= ১৫০ আয়াত ও বিবিধ= ৬৬ আয়াত।

আল্-কুরআনে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পরিপূর্ণ 'সূরা' হচ্ছে- 'সূরা মুদ্দাস্‌সির', আবার সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে- 'সূরা নসর', কুরআনে পাকে সর্বাপেক্ষা বড় সূরা হচ্ছে- 'সূরা বাকারা'। সর্বাপেক্ষা ছোট সূরা হচ্ছে- 'সূরা কাওছার', সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত হচ্ছে 'আয়াতে দাইয়ান' অর্থাৎ সূরা বাকারার ৩৮ নং রুকু হতে শেষ পর্যন্ত। আবার কুরআনে সবচেয়ে ছোট আয়াত হচ্ছে- 'মুদহাম্মাতান' (সূরা আর-রাহমান), 'ওয়াল ফাজরে', 'ওয়াদ্দোহা'।

পবিত্র কুরআন শরীফে মোট রুকুর সংখ্যা= ৫৪০টি, সিজদার সংখ্যা= ১৪টি

একমাত্র আসমানী গ্রন্থ 'আল্-কুরআন'-এর সমগ্র বিশ্বব্যাপী রয়েছে লক্ষ লক্ষ হাফেজ, যার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত নেই এ পৃথিবীতে। সুবহানাল্লাহ্।

‘কোয়াসার’ জাহান্নামের বিস্ময়কর নিদর্শন

আল্-কুরআন

“আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদন হতে, অতঃপর আমি তাকে শুক্রানুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ স্থানে। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি ‘আলাকে’, অতঃপর আলাককে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে এবং রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে; অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কতো মহান!” (২৩ ঃ ১২-১৪)

“হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রয়েছে, তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (২ ঃ ১৬৮)

“আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথের দিশা দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।” (৭৬ ঃ ২-৪)

“আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন। তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন।” (৩০ ঃ ৪০)

"যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার দরজা খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য।" (৩৯ ঃ ৭৩)

"আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার শিখা ওদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। ওরা পানীয় চাইলে ওদের দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা তেলচিটচিটের মতো এবং তা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। এ পানীয় ও অগ্নি কতো নিকৃষ্ট আর তাদের খুবই নিকৃষ্ট আশ্রয়।" (১৮ ঃ ২৯)

"যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এটা সত্য! তখন তাদেরকে বলা হবে 'শাস্তি' আস্বাদন করো, কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।" (৪৬ ঃ ৩৪)

"যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিকুণ্ডে।" (৪০ ঃ ৭১-৭২)

"অপরাধীরা মহাঅগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে।" (৮৭ ঃ ১২)

"আমি তোমাদেরকে বিরাট-স্ফুলিঙ্গ (Huge spark) ওয়ালা অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করছি।" (৯২ ঃ ১৪)

"তুমি কি জান ওটা কী? ওটা হচ্ছে আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত 'অগ্নিদুর্গ' (জাহান্নাম), যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, নিশ্চয়ই বিরাট বিরাট লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।" (১০৪ ঃ ৫-৯)

"এটা উৎক্ষেপণ করবে বৃহৎ 'স্ফুলিঙ্গ' (Huge spark) অট্টালিকাতুল্য।" (৭৭ ঃ ৩২)

"বিদ্রোহীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।" (৬৭ ঃ ৩৫)

"নিশ্চয়ই এই অগ্নিদুর্গ (জাহান্নাম) ভয়াবহ বিপদের আগুনের শাস্তিস্বরূপ ।"
(৭৪ ঃ ৩৫)

"যারা আমার বাণীকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি আগুনে দগ্ধ করবোই, যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি আর শাস্তিই ভোগ করতে থাকে । আল্লাহ পরাক্রমশালী-প্রজ্ঞাময় ।" (৪ ঃ ৫৬)

"ভয় করো সেই অগ্নিকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর এবং যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে অস্বীকারকারীদের জন্য ।" (২ ঃ ২৪)

"নিশ্চয়ই জাহান্নাম (অগ্নিদুর্গ) ওঁৎ পেতে রয়েছে, সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল ।" (৭৮ ঃ ২১-২২)

"জাহান্নামের (অগ্নিকুণ্ডের) এ বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী ।"
(৭৪ ঃ ৩১)

"সেদিন অপরাধীরা বলবে হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম ।" (৭৮ ঃ ৪০)

"অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তথায় থাকবে (জ্বলে-পুড়ে) বীভৎস চেহারায় ।" (২৩ ঃ ১০৪)

"তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (৪৭ ঃ ২৪)

"সুতরাং তারা কুরআনের পরে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?"
(৭৭ ঃ ৫০)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বের সর্বত্র) গৌরব, গরিমা একমাত্র তাঁর-ই এবং তিনি পরাক্রমশালী-প্রজ্ঞাময় ।" (৪৫ ঃ ৩৭)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের পবিত্র যে বাণীসমূহ উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে লক্ষ্য করা যায় যে 'আল্লাহ্ তা'আলা' ইতোমধ্যে 'জাহান্নাম' তৈরী করেছেন । যার স্পষ্ট ঘোষণা তিনি দিয়েছেন এবং বলেছেন যে বিচারের দিন মানুষেরা বাস্তব চোখেই নিকট থেকে 'জাহান্নাম'কে প্রত্যক্ষ করে থাকবে, যদিও দুনিয়ার জীবনে মানুষ জাহান্নাম সরাসরি দেখতে পাবে না ।

তবে তাঁর পক্ষ থেকে পরজগতে তাঁর সৃষ্টি প্রায় সকল বিষয়েরই তিনি অসংখ্য-অগণিত নিদর্শন, নমুনা (Sample) তৈরী করে মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন, যাতে করে সৃষ্টির সেরা মানুষ ঐ নিদর্শনগুলো (এ নিদর্শন বা নমুনা সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে) দর্শন লাভ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে তারা যেন আর অদৃশ্য ঐ বিষয়গুলো অস্বীকার না করে, বরং স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে মহাসত্য আল্লাহ্‌কে খুঁজে বের করতে পারে এবং একমাত্র তাঁর নির্দেশিত সঠিক পথের উপর জীবন পরিচালনা করে সফলতায় পৌঁছতে পারে। তাই যেহেতু এ পৃথিবী থেকে 'জাহান্নাম' দেখা যাবে না সেহেতু আল্লাহ্‌র বাণীতে বর্ণিত জাহান্নামের আকার-আকৃতি, গঠন, চিত্র-চরিত্র ও তার কর্মতৎপরতার সাথে যদি মহাকাশে আবিষ্কৃত কোনো জ্যোতিষ্কের হুবহু সাদৃশ্য বা মিল পাওয়া যায়, তাহলে তাকে জাহান্নামের নিদর্শনস্বরূপ বিবেচনা করে নিজ অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি করা যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে সম্ভব, তা বর্তমান আবিষ্কৃত 'কোয়াসার' (Quasar)-এর প্রেক্ষাপটে যুক্তিযুক্তভাবেই মেনে নিতে হবে। কারণ আবিষ্কৃত বস্তু 'কোয়াসার' এবং 'জাহান্নাম' কোন্‌টাই মানুষের তৈরী নয়, সবই আল্লাহ্‌র তৈরী এবং তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সময়ের ব্যবধানে মানবমণ্ডলীর সামনে এগুলো নিদর্শন হিসেবে পেশ করে থাকেন। "প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের-ই একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।" (৬ ঃ ৬৭)

এ অধ্যায়ে পরিবেশিত বিস্ময়কর নিদর্শন সম্পর্কে অবগতির মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের অন্তর চক্ষু খুলে যাওয়ার সুযোগ পাবে এবং বাস্তবতার আলোকে জাহান্নামের ভয়াবহতা মানুষের বোধের সীমায় স্বপ্রমাণে হাজির হবে।

এবার উদ্ধৃত আসমানী বাণীসমূহের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ আমরা প্রথমে আলোচনায় আনবো এবং পরে একই বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'তথ্যসমূহ এবং প্রাপ্তি' পরস্পর মিলিয়ে দেখব।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি এ পৃথিবীর মানবমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে তাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে জ্ঞানপূর্ণ ও দৃষ্টি আকর্ষণমূলক এবং পরিণতির ভয়াবহতা সংক্ষিপ্ত বাক্য সমাহারে তাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন– তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা, জ্ঞান ও ক্ষমতায় মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর পৃথিবী পৃষ্ঠে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন নির্বাহের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থা-ই সুসম্পন্ন করেছেন। এমনকি তাদের এই জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এবং কোন্ ধরনের জীবন পদ্ধতিতে তাদের সফলতা- ব্যর্থতা আসতে পারে- তাও যথাসময়ে যথাযথভাবে অবহিত করেছেন। এর পর জীবন চক্রের পরিসমাপ্তিতে তিনিই তাদের মৃত্যু ঘটান। এ জীবন এবং মৃত্যুতে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কোন হাত নেই। অতঃপর পুনরুত্থান দিবসে মানুষের এ দুনিয়াবী জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য পুনরায় মানুষকে জীবন্ত করে হাশরের মাঠে তিনিই একত্রিত করবেন। সফলতা লাভকারীদেরকে সেখান থেকে 'জান্নাত'-এ পাঠাবেন এবং বিফলতা লাভকারী বা ব্যর্থদেরকে সেখান থেকে 'জাহান্নাম'-এর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন। বিষয়টি যতোই মানুষ তাদের জ্ঞানে বোধগম্য নয় বলে উপহাস করুক না কেন– এতে কিন্তু সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই। অধিকাংশ মানুষই দুর্ভাগ্যক্রমে এ রূঢ় বাস্তব সত্যটিকে জ্ঞানের বাইরে ফেলে রেখেছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, 'পৃথিবী' নামক এ গ্রহ পৃষ্ঠে মানবমণ্ডলীর মাঝে যারা আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করবে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলকে, কিতাবকে মেনে নেবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যারা অস্বীকার করবে, মানবে না, তাদের এ সত্যবিরোধী আচরণের জন্য 'জাহান্নাম' নামক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। সৃষ্টির সেরা মানবমণ্ডলীর জন্য এমন নিকৃষ্ট স্থান সত্যিই বড় অমঙ্গলজনক। অথচ এ জঘন্য অপমানজনক গুরুতর শাস্তি থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তথা

গোটা মহাবিশ্বের সর্বত্রই তিনি অসংখ্য-অগণিত সত্যতাবহনকারী ও বাস্তব চিহ্ন সম্বলিত 'নিদর্শন' দিয়ে ভরপুর করে রেখেছেন। যাতে করে মানুষ তার জ্ঞান দিয়ে নিদর্শনগুলোর সত্যতা যাচাই করে এগুলোর পেছনে যে অদৃশ্যে কর্ম-কৌশলী-মহাজ্ঞানী সত্তা এক 'আল্লাহ্' বর্তমান আছেন তা উদ্ঘাটন করতে পারে। তাঁকে পরিপূর্ণরূপে মানার সাথে সাথে তাঁর প্রেরিত দূত, কিতাব এবং জীবন ব্যবস্থাও মেনে নিয়ে জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সফলতার স্বর্ণ শিখরে যেন আরোহণ করতে পারে।

এরপর তিনি (আল্লাহ্) বলেছেন যে, সকল ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা সুসম্পন্ন করার পরও মানুষ যদি তাদের কৃত মন্দ কর্মের বিনিময়ে ওয়াদাকৃত শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে এবং উদ্ধৃত জীবন চালাতে থাকে, তাহলে তাতে আল্লাহ্র কোন পরোয়া নেই, কিন্তু তাদের ভালো করেই জানা থাকা দরকার যে একদিন সে সময় অবশ্যই আসবে, যখন তাদের নিজস্ব চোখ দিয়েই সেই ভয়ঙ্কর শাস্তির স্থান 'অগ্নিকুণ্ড' তারা ঠিকই দেখতে পাবে। অপরাধীদের জন্য এই প্রচণ্ড তাপযুক্ত বিরাট-বিশাল অগ্নিশিখা বিশিষ্ট শাস্তির স্থান 'অগ্নিদুর্গ' আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করে রেখেছেন, যা এক সময় মানুষ প্রত্যক্ষ দৃষ্টি শক্তিতেই দেখতে পাবে। সেই দর্শন লাভে তারা আর তখন 'জাহান্নাম' অস্বীকার করতে পারবে না, কোনো সুযোগই তখন আর পাবে না, বরং লাঞ্ছিত অবস্থায়, মাথা নুইয়ে অপমানের সাথেই স্বীকারোক্তি পেশ করবে। বিচারের মাঠে 'জাহান্নাম' নামক অগ্নিদুর্গের অবর্ণনীয় ও হতবাক করার মতো প্রচণ্ডতা এবং ধ্বংসযজ্ঞ বাস্তব চোখে দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে মানুষ সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হবে, সেখানে তাদের গলায় বেড়ী ও শিকল পেঁচিয়ে নিম্নস্তরের প্রাণীর মতো টেনে হেঁচড়ে 'অগ্নিদুর্গে' ফেলা হবে। অগ্নিদুর্গের বিরাট-বিশাল উত্থিত অবিশ্বাস্য এবং ভয়াবহ লেলিহান শিখাগুলোর প্রচণ্ড ধ্বংসের মধ্যে পতিত মানুষ নিমিষেই জ্বলে-পুড়ে, ছিন্ন-ভিন্ন ও টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। অবর্ণনীয় মহাক্ষমতাসম্পন্ন প্রচণ্ড তাপে মানুষের গায়ের চামড়া, গোশ্ত ঝল্সে গিয়ে

খুলে খুলে শরীর থেকে ঝরে পড়তে থাকবে, কিন্তু তাতে মরণ আসবে না, কারণ মৃত্যু যে সেখানে নেই! অনবরত শাস্তি ভোগ করার জন্য পুনরায় গায়ের গোশ্ত ও চামড়া তৎক্ষণাত নতুনভাবে সৃষ্টি হবে, এভাবে একবার জ্বলে-পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হবে, আবার তা নতুনভাবে সৃষ্টি হবে। অনন্ত জীবন এভাবে 'জাহান্নাম'-এর আগুনের ভেতর আযাব চলতে থাকবে। 'অগ্নিকুণ্ড'-এর প্রচণ্ড প্রতাপশালী ও উত্তপ্ত ভয়ঙ্কর চরিত্রের লেলিহান শিখাগুলো বিরাট-বিশাল এলাকা জুড়ে (প্রায় পৃথিবীর সমান চওড়া) প্রভাব বিস্তার করে অপরাধী মানুষগুলোকে পেঁচিয়ে আবদ্ধ করে রাখবে, মানুষ শত চেষ্টা করেও তার কবল থেকে বেরুতে পারবে না। ৭৭ ঃ ৩২ আয়াতে এ বিরাট-বিশাল অগ্নিশিখা বা লেলিহানকে 'কাসর' (QSRS-Quasi Steller Radio Source) বলা হয়েছে, তাদের ভেতরকার প্রচণ্ড ধ্বংস সাধনকারী তাপ এবং উজ্জ্বলতার জন্য। এ তাপ এবং উজ্জ্বলতার (Heat & light) পরিমাণ এতো ব্যাপক যা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মানবমণ্ডলীর জন্য উল্লিখিত চরিত্র সম্পন্ন এ 'অগ্নিদুর্গ' ভয়াবহ বিপদসমূহের মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য। সত্য অস্বীকারকারী মানুষগুলোকে চরম শাস্তি প্রদানের জন্য তা অপেক্ষায় রয়েছে। সময় একদিন আসবে যখন তারা এ দুর্ধর্ষ-ধ্বংস সাধনকারী অকল্পনীয় 'অগ্নিদুর্গ'কে নিকট থেকেই বাস্তব চোখে প্রত্যক্ষ করবে।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশ্নাকারে বলেছেন যে, 'কুরআন'-এ বর্ণিত বিষয়গুলোর 'নিদর্শনসমূহ' মহাবিশ্বের সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হওয়ার পরও 'কুরআন' যে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্যতাসহকারে অবতীর্ণ তা কি তারা চিন্তা-ভাবনা করে না বা তাদের বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে না? তাদের বিবেক, অন্তর ও জ্ঞানের দরজা কি তারপরও বন্ধ হয়ে থাকবে? কল্পনাতীত মহাজ্ঞান ও চাক্ষুস প্রমাণ সম্বলিত অগণিত নিদর্শন নিয়ে আগত এ পবিত্র বাণীর পর এমন আর কি কোনো বাণী আছে, যার উপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে?

লেলিহান শিখা : "আমি তোমাদেরকে বিরাট স্ফুলিঙ্গওয়ালা (Huge Spark) অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করছি।" (৯২ : ১৪)
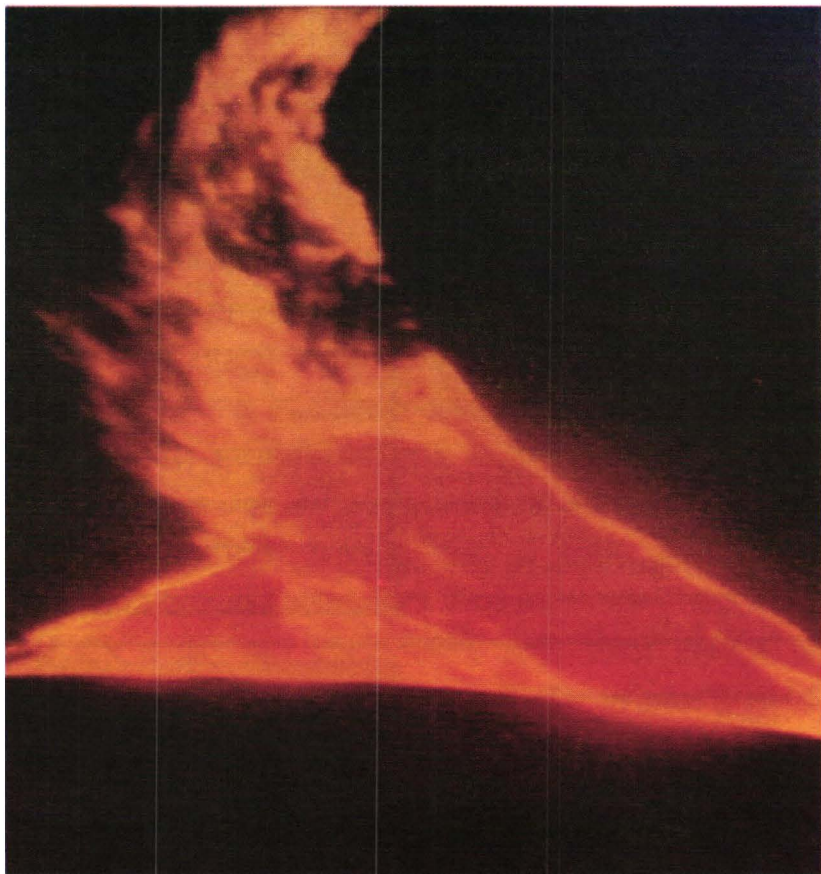
চিত্র-২

– জাহান্নাম-এর বিশাল বিশাল অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে আল-কুরআনে 'কাসর' বলা হয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে, এদের ভয়াবহ তাপ ও আলো বা উজ্জ্বলতার জন্য। মানবমণ্ডলীর মধ্যে যারা আল্লাহকে, রাসূলকে (সা), আসমানী কিতাবকে, পরকালকে অস্বীকার করবে, তাদের জন্যই প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে উল্লিখিত ভয়াবহ অগ্নিদুর্গ, জাহান্নাম। প্রকৃতপক্ষে এক কঠিন শাস্তির জন্য উল্লিখিত এ ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

কোয়াসার : "ভয় কর সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিকে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে অস্বীকারকারীদের জন্য।" (২ : ২৪)
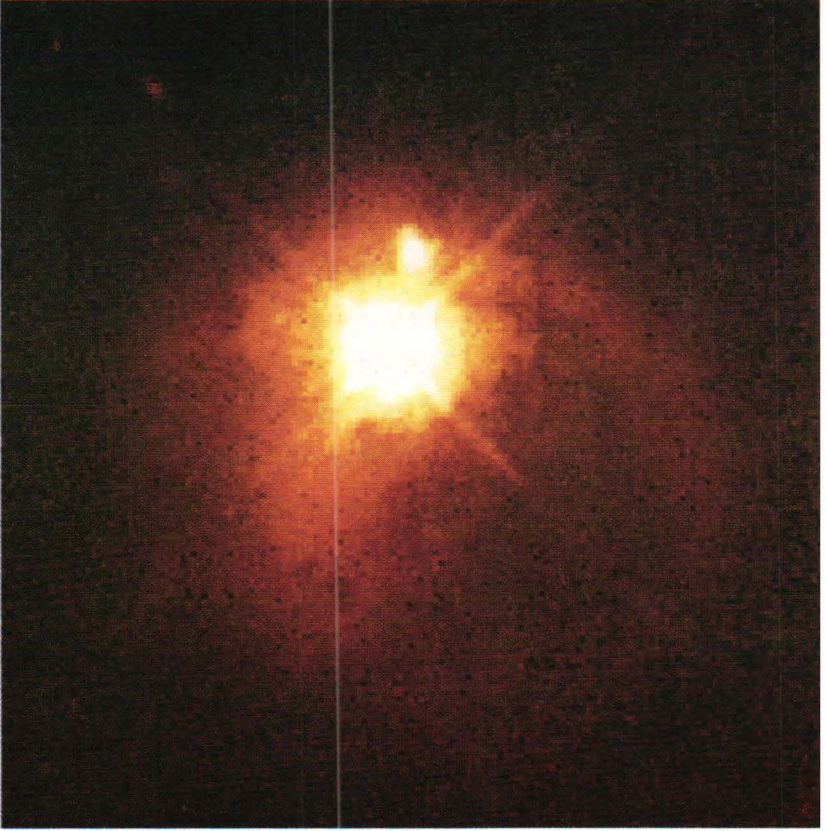
চিত্র-৩

– 'জাহান্নাম'-এর নিদর্শন মহাকাশে দর্শন করার পরও কি অবিশ্বাসী সম্প্রদায় সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করবে না? মিথ্যা ধ্যান ধারণা ও কর্মপন্থা কি পরিত্যাগ করবে না? তারা কি তাদের নিজেদের কল্যাণের কথা একবারও ভাববে না? মহাকাশে এমন ভয়াবহ 'অগ্নিদুর্গ' দর্শন করার পরও কি তারা সত্যকে অস্বীকার করেই যাবে? তাদের জানা উচিত আল্লাহ দৃশ্যমান ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডের মত 'জাহান্নাম' সৃষ্টি করে রেখেছেন, যেখানে পরকালে অবশ্যই অবিশ্বাসীদের নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হবে, ছাই ভস্ম করে ধ্বংস করা হবে। সচেতন ও বিবেকবান মানুষ কখনই যা কামনা করতে পারে না।

গোটা মহাবিশ্বের এক ও একক সৃষ্টিকর্তা– 'আল্লাহ্ তা'আলা' সকল কিছু সৃষ্টি করে- তাদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ জ্ঞানপূর্ণভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরবর্তীতে তাঁর পক্ষ থেকে আবার 'দূত' এবং 'কুরআন'এর মাধ্যমে ইহজগত ও পরজগতের সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করে আবার অসংখ্য অগণিত বাস্তব 'নিদর্শন' সর্বত্র স্থাপন করে তাঁর নিজ সত্তার উপস্থিতির স্বাক্ষর মানবমণ্ডলীর সামনে তুলে ধরেছেন। এ ব্যাপারে মানুষের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার প্রশ্নের সুযোগ বাকী রাখেননি। এখন এ অবস্থায় তারা ইচ্ছা করলে সত্যকে মেনে নিয়ে ধন্য হতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সকল ব্যাপারেই, সকল কিছুতে 'বাস্তব নিদর্শন' দেখেও সত্যকে অস্বীকার করতে পারে। এই স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে। তবে সত্যকে অস্বীকার করে তারা তাদের প্রভুর শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না। এ নির্ধারিত শাস্তির ভয়াবহতা তারা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করবে এবং ভোগ করবে। আর সত্যের প্রতি তাদের এ অস্বীকৃতির কারণে আল্লাহ্‌র মহান সত্তার এতটুকুও মর্যাদা কমবে না বা ম্লান হয়ে যাবে না, বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সর্বত্র তাঁর গৌরব-গরিমা স্বমহিমায় উদ্দীপ্ত উদ্ভাসিত এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বি পরিবেশে বিরাজিত। তাঁর মহাজ্ঞান ও অসীম প্রজ্ঞা এবং প্রচণ্ড শক্তি-ক্ষমতার মোকাবেলায় সবাই পরাভূত হতে বাধ্য, তাঁকে কেউ পরাজিত-পরাভূত করতে পারেনি এবং কখনো পারবেও না। মহান সৃষ্টিকর্তা ও মহাবিশ্বের প্রভু মহান 'আল্লাহ্'র সত্তা সকল প্রকার গৌরব ও মহিমার স্বর্ণ শিখরে আরোহণকৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত। সুব্হানাল্লাহ্।

উল্লিখিত কুরআনিক 'অগ্নিদুর্গ'কে একটু গুরুত্বসহকারে স্মরণে রেখে এবার চলুন বিজ্ঞানের বর্তমান উৎকর্ষতায় সর্বশেষ 'কোয়াসার' (Quasar) নামক মহাকাশীয় অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে উদ্‌ঘাটিত তথ্য ও প্রাপ্তিতে, যা আশ্চর্যজনকভাবে গোটা বিজ্ঞান জগতে চাঞ্চল্য এবং বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। আপনি সেখানে দেখতে পাবেন– মিথ্যা যেমন সত্যের পদতলে নিজের সকল কিছুকে সপে দিয়ে ধন্য হতে চায়, ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান

প্রশংসিত বিজ্ঞানও যেনো নিত্য নতুন আবিষ্কার, উদ্‌ঘাটন এবং প্রাপ্তির মাধ্যমে 'কুরআন'কে সত্যগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠার 'সনদ' দিয়ে তারই পদতলে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। তাই সকল প্রকার বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র এবং রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নির্ভীক 'বিজ্ঞান' তার আবিষ্কারসমূহকে আসমানী গ্রন্থ 'কুরআন'-এর বক্তব্যের অনুকূলেই প্রকাশ করে চলেছে।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান তার মহাকাশীয় আশ্চর্যজনক বস্তু 'কোয়াসার' (Quasar) আবিষ্কারের পেছনে যে ইতিহাস, তা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছে যে, ১৯৬০ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ হঠাৎ করেই কয়েকটি অদৃশ্য উৎস থেকে নির্গত 'রেডিও সোর্স'-এর সন্ধান লাভ করেন। তারা উক্ত Radio source-এর ক্যাটালগ তৈরী করে পরবর্তীতে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সনাক্ত করার জন্য ইংল্যান্ডের Cambridge University-তে প্রেরণ করেন। সেখানে এ ক্যাটালগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে মহাকাশে দৃশ্যমান কোন জ্যোতিষ্ক বা বস্তু থেকে এ radio emission হচ্ছে না, বরং এদের উৎস অদৃশ্য কোন বস্তু হবে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে Radio Telescope যথেষ্ট উন্নতমানের না হওয়ায় এদের অবস্থান নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে ১৯৬২ সালের ৫ই আগস্ট 3C-273 নামক বস্তুটিকে আগত radio emission-এর একটি উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। নিউ সাউথ ওয়েলস-এর Parker radio astronomy observatory থেকে Radio emission কৃত বস্তুটিকে একটি সাধারণ নীলাভো তারা (Ordinary bluish star) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলকে আমেরিকায় California Palomar Observatory-তে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে সেখানে Helae reflector-এর Spectrum-এ পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে

"নিশ্চয়ই জাহান্নাম ওঁত পেতে (আড়ালে) রয়েছে, যা সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল।" (৭৮ : ২১-২২)
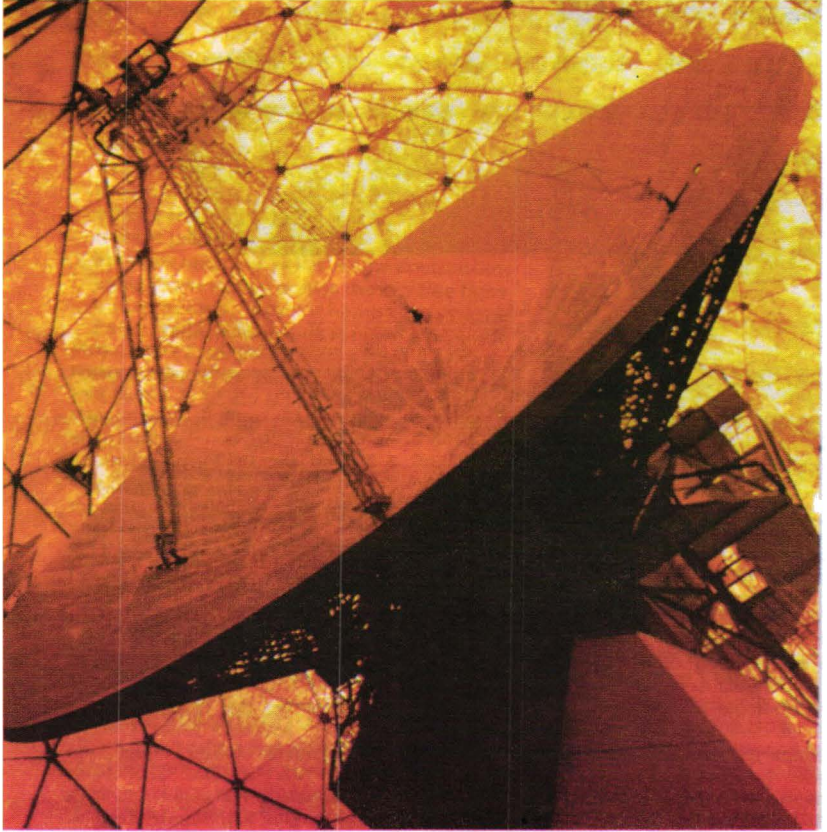
চিত্র-৪

- আমাদের এ মহাবিশ্বের মহাকাশে কল্পনাতিত ও ভয়ঙ্কর অগ্নিদুর্গ 'কোয়াসার' সম্পর্কে সর্বপ্রথম 'Radio Telescope'-এ ১৯৬২ সনে ৫ই আগস্ট প্রথমবারের মত একটি কোয়াসারকে রেডিও 'সোর্স'-এর উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। ১৯৬৩ সালে Quasi-Stellar Radio Source থেকে 'Quasar' নামকরণ করা হয়। ১৯৬০ সালে বিজ্ঞানবিশ্ব 'কোয়াসার'কে 'নক্ষত্র' মনে করতো, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ভুল ভাঙ্গে এবং তারা বুঝতে পারে যে, নিশ্চয়ই মহাকাশে তারা নতুন কিছু আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। পরবর্তী সময়ে তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই মহাকাশীয় বস্তু 'কোয়াসার' নামে আবির্ভূত হয়।

"এ অগ্নিদুর্গ ভয়াবহ বিপদের আগুনের শাস্তিস্বরূপ।" (৭৪ : ৩৫)
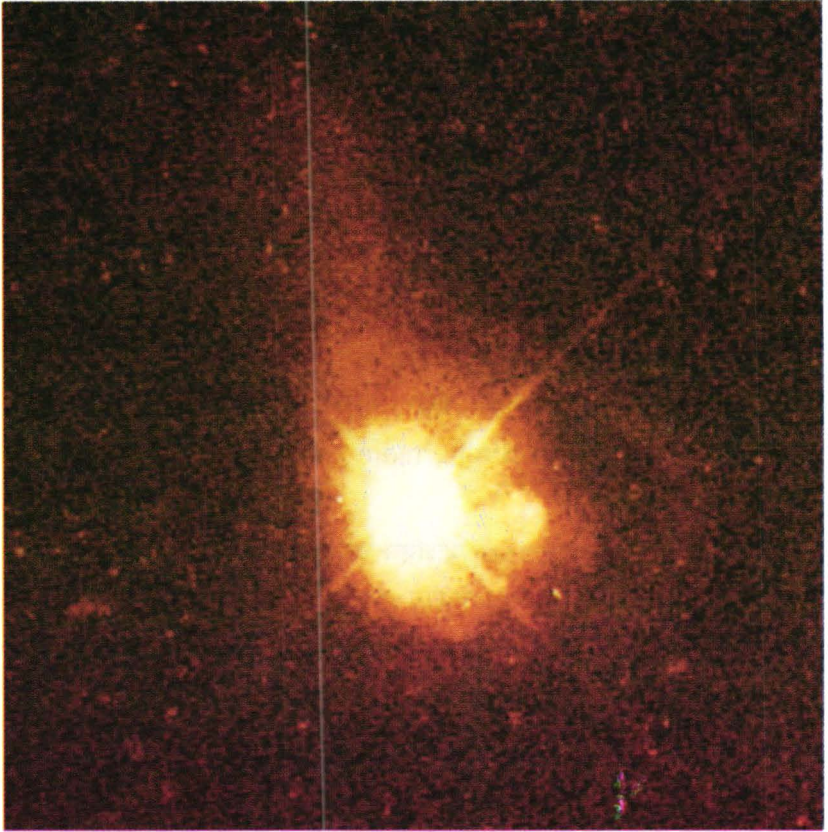
চিত্র-৫

– ছবিতে দৃশ্যমান 3C-273 একটি জ্বলন্ত অগ্নিদুর্গ, যা ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তায় পরিপূর্ণ হয়ে মহাকাশের মহাশূন্যতায় পরিভ্রমণ করতে করতে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর দিকে 'কোয়াসার' সৃষ্টি হয়ে থাকবে। তারা অনুমান করছেন কোয়াসার-এর কেন্দ্রে বিশাল বিশাল ব্লাক হোল থাকতে পারে। যারা পূর্বে জাহান্নামকে অস্বীকার করেছিল, কোয়াসার আবিষ্কারের পর এখন তাদের অবস্থা হচ্ছে ভাষাহীন নির্বাক। কোয়াসার-এর ভয়াবহতা ও রুদ্ররোষ দেখে তারা এখন দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অনেকেই নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে কুরআন যেমন সত্য, তেমনি এক ও একক আল্লাহ্‌ও সত্য।

প্রমাণিত হয় যে বস্তুটি নক্ষত্র বা সে জাতীয় কোনো Star নয়। Spectrum-এর red shift প্রমাণ করে বস্তুটি প্রায় ৩০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে আছে এবং প্রায় একটি গড় ব্যাসসম্পন্ন গ্যালাক্সির চেয়েও অনেক অনেক বেশি আলো ছড়াচ্ছে। যদিও বস্তুটির আকৃতি দূর থেকে দেখতে একটি নক্ষত্রের (তারকা) মতোই মনে হয়। এর পরপরই পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েকটি আবিষ্কার একই রকম বস্তুকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়ায় বিজ্ঞানীগণ বুঝতে পারলেন যে তারা অবশ্যই নতুন কোন মহাকাশীয় বস্তুর সন্ধান লাভ করেছেন। ১৯৬৩ সালে প্রথম বারের মতো তারা এদের নাম দিলেন 'QSRS' (Quasi-Stellar-Radio-Sorce), পরে নাম পরিবর্তন করে 'Quasar' নামকরণ করা হয়। মূল শব্দ QSR (কসর) থেকেই Quasar। বস্তুগুলো থেকে Strong radio emission-ই উক্ত নামকরণের যৌক্তিকতা বহন করে।

উন্নত প্রযুক্তির কারণে ১৩০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত দূরত্বে বর্তমান বিজ্ঞান মহাকাশীয় জ্যোতিষ্কের সন্ধান করতে সক্ষম হয়েছে। উক্ত বিশাল দূরত্বের মধ্যে এ যাবৎ প্রায় ১০,০০০ 'কোয়াসার' আবিষ্কৃত হয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মতে একটি 'Standard' কোয়াসার আমাদের এ সৌরজগতের সমান বা একাধিক সৌরজগতের সমষ্টির সমান মাত্র, অথচ এর High energy radiation নির্গত করার ক্ষমতা ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র (প্রায়) নিয়ে গঠিত আমাদের Milky-way গ্যালাক্সির Radiation নির্গমনের চাইতে ১০,০০০ গুণ বেশি এবং Light energy নির্গমন ক্ষমতা প্রায় ১০০ গুণ বেশি। উল্লিখিত 'কোয়াসার' থেকে নির্গত Radio energy অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Gamma-ray, X-ray, Ultraviolet-ray এবং Infrared-ray হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। 'Gamma-ray' এবং 'X-ray' মানুষ বা প্রাণী জগতের সংস্পর্শে আসা মাত্রই তাদের গায়ের চামড়া এবং গোশতকে অত্যধিক তেজস্ক্রিয়তার মাধ্যমে ঝলসিয়ে দেয়, এতে সাথে সাথেই জীবন্ত কোষগুলো (Cells) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে চামড়া এবং গোশত গলে গিয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

"সুতরাং তারা কুরআন-এর পর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?" (৭৭ : ৫০)
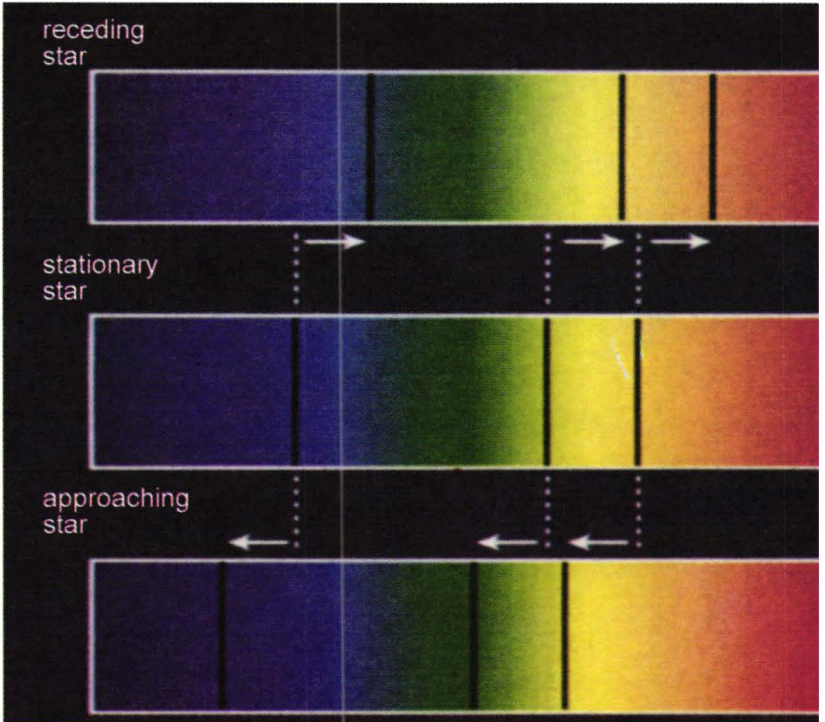
If an object is receding or approaching,
its spectral lines are shifted by the Doppler
effect. AN graphic by Mark McLellan.

চিত্র-৬

– ছবিতে Reflector-এর Spectrum এ আগত আলোর Red shift-এর অবস্থান আলোর উৎস নামক বস্তুটি কত দূরত্বে আছে, তা মাপা যায় এবং প্রস্থান বেগও তা থেকে জানা যায়। কোয়াসার আবিষ্কারের পেছনে Spectrum-এ Red shift অনন্য অবদান রেখেছে। Reflector-এর এই Spectrum নীরবে জাহান্নাম অস্বীকারকারীদের চোখে আঙ্গুল রেখে 'কোয়াসার'-কে দর্শন করার আহ্বান জানাচ্ছে, যাতে করে বাস্তব চোখে জাহান্নামের নিদর্শন কোয়াসার'কে দেখে এখনই সাবধান হতে পারে। নইলে তারা তাদেরকে অগ্নিদুর্গে নিক্ষেপ করা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

"যারা আমার বাণীকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করবোই, যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি আর শাস্তিই ভোগ করতে থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪ : ৫৬)
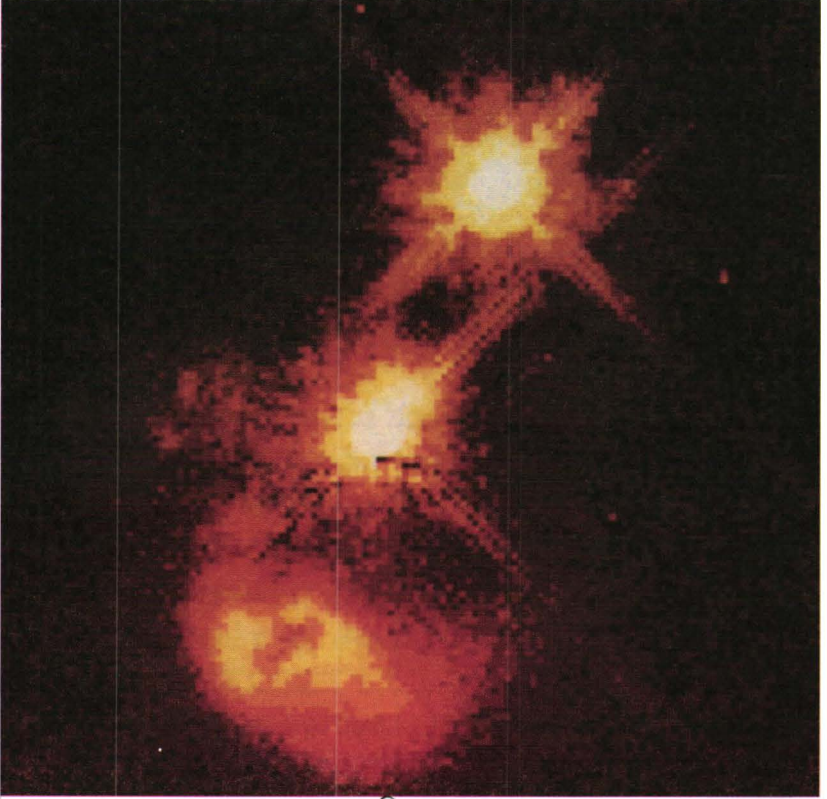
চিত্র-৭

–দুর্ধর্ষ-ভয়ঙ্কর 'কোয়াসার' ছবিতে দেখা যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ এর বেশি কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে। ছবির কোয়াসারটি প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে আছে। একটি 'কোয়াসার'-এর আয়তন মাত্র একটি সৌরজগতের সমান হলেও একটি গড় গ্যালাক্সির প্রায় ১০০ গুণ বেশি আলোক শক্তি নির্গমন করতে পারে এবং তেজস্ক্রিয়তা প্রায় ১০,০০০ গুণ বেশি নির্গত করার ক্ষমতা রাখে। এক কথায় 'কোয়াসার' এক অবিশ্বাস্য ও ভয়াবহ বিপর্যয়কর সর্বোচ্চ তাপ ও তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন অগ্নিদুর্গ, যার তুলনা শুধুমাত্র 'জাহান্নাম'-ই হতে পারে। এ সকল বাস্তব তথ্যের পরেও কী 'জাহান্নাম' অস্বীকার করা যেতে পারে?

উক্ত তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলোর মহাকাশে চলার পথে 'Wave-length' খুবই সংক্ষিপ্ত, 'Ultraviolet-ray' উপরে বর্ণিত রশ্মিগুলোর তুলনায় কম ক্ষতিকারক হলেও এরা প্রাণীদেহের সংস্পর্শে ক্যানসার (Cancer) সৃষ্টি করে থাকে। এদের Wave-length পূর্বের 'Gamma-ray'-এর তুলনায় একটু লম্বা। Infrared-ray পূর্বের তিনটি Cosmic-ray-র তুলনায় কম ক্ষতিকারক। উক্ত রশ্মি পরিমিত পরিমাণে আবহাওয়ার সাথে মিশে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তাপ সরবরাহ করে তাদের লাইফ সাইকেলকে সক্রিয় রাখে। তবে পরিমাণে বেশি হলে প্রাণীদেহের চামড়া পুড়িয়ে দেয়। 'Infrared-ray' এর 'Wavelength' অন্য তিনটির তুলনায় অনেক লম্বা হয়ে থাকে।

আশ্চর্যজনক মহাকাশীয় জ্যোতিষ্ক 'কোয়াসার' Quasar-এর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞান জগত এখনও তেমন কোন সুস্পষ্ট সুরাহা পেশ করতে পারেনি। দু' একটি সৌরজগতের মতো এতক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট স্থানে কী করে মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্রকে একত্রিত করা হয়েছে– তা বিজ্ঞানীদের চিন্তার রাজ্যকে সত্যিকারভাবেই ভাবিয়ে তুলেছে। বিজ্ঞানীদের কেউ মনে করেন মহাবিশ্বের সৃষ্টির শুরুতেই এরা গ্যালাক্সির মতো স্বাধীনভাবে সৃষ্টি হয়েছে। কেউ মনে করেন গ্যালাক্সিদের নিজেদের মধ্যে দুর্ঘটনাজনিত কারণে Galaxy centre (Ccore) পৃথক হয়ে 'কোয়াসার' সৃষ্টি হয়েছে। আবার কেউ কেউ এ ধারণা পোষণ করেন যে, গ্যালাক্সির ভেতর Star cluster-এ মহাকর্ষ বলের কারণে এক সময় নক্ষত্রসমূহ তাদের পরস্পর পরস্পরের খুবই নিকটে চলে আসাতে লক্ষ কোটি নক্ষত্র একত্রিত হয়ে 'কোয়াসার'-এর জন্ম দিয়েছে।

একটি 'কোয়াসার'কে সঠিকভাবে বুঝতে হলে প্রথমেই একটি 'নক্ষত্র' জীবন বুঝতে হবে। কারণ লক্ষ কোটি 'নক্ষত্র' নিয়েই একটি 'কোয়াসার'-এর (Quasar) জীবন আবর্তিত।

আমরা তাই আমাদের সূর্য নামক নক্ষত্রটিকেই এ বিষয়ে বিবেচনায় আনতে পারি। আমাদের 'সূর্য'টি মেইন সিকুয়েন্স (Main sequence) গ্রুপের
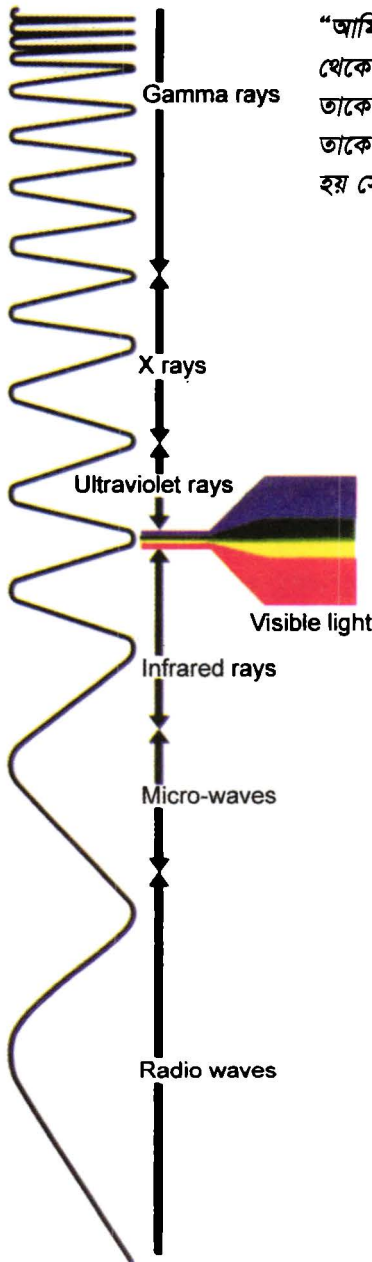
"আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। আমি তাকে পথের দিশা দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।" (৭৬ ঃ ২,৩)

চিত্র-৮

'কোয়াসার' থেকে নির্গত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন Gamma-ray, X-ray, Ultraviolet-ray এবং Infrared-ray, হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উল্লিখিত Gamma-ray, X-ray ও Ultraviolet-ray-র সংস্পর্শে আসামাত্র প্রাণীকোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গোশত এবং চামড়া খসে ও ঝরে পড়তে থাকে। আবার কখনও কখনও প্রাণীদেহে ক্ষতিকারক ক্যান্সার সৃষ্টি করে কিংবা চামড়া পুড়িয়ে দেয়। এভাবে সার্বিক বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে, কোয়াসার থেকে নির্গত আলোকশক্তি জীবন্ত প্রাণীদেহের জন্য ভয়ঙ্কর ও তুলনাহীন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা মানব জাতির জন্য একটা বড় ধরনের দুর্ভাবনার বিষয়।

"আকাশ ও পৃথিবীতে (মহাবিশ্বে) এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট লওহে-মাহফুজে উল্লিখিত হয়নি।" (২৭ : ৭৫)

চিত্র-৯

'কোয়াসার'-এর সৃষ্টি বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা হচ্ছে– একাধিক গ্যালাক্সির সংঘর্ষে পূর্বে কোন এক সময়ে একাধিক গ্যালাক্সি কেন্দ্র একত্রিত হয়ে ভয়াবহ এই অগ্নিদুর্গ সৃষ্টি করেছে। 'কোয়াসার'-এর আয়তন প্রায় আমাদের সৌরজগতের সমান অথচ এর প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা ও আলো নির্গমন ক্ষমতা ১০,০০০ গড় গ্যালাক্সির নির্গমনের ক্ষমতার সমান। কল্পনা করতে পারেন কী ভয়ঙ্কর অবস্থা? কুরআনে বর্ণিত 'জাহান্নাম' আর অস্বীকার করা যাবে কী?

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ সতর্ক বাণীকে অস্বীকার করবে।" (৫৫ : ৩৮)
"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) চাবি-কাঠি তাঁরই (আল্লাহরই) নিকট।"
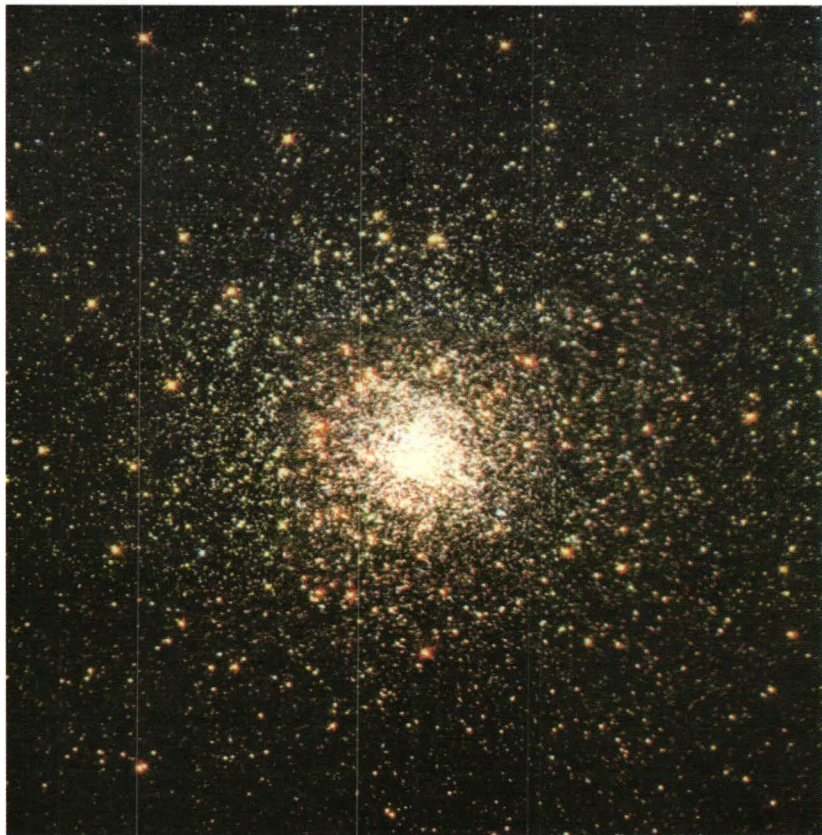
চিত্র-১০

বিজ্ঞানীদের মাঝে আরেকদল দাবী করছেন– 'কোয়াসার' সৃষ্টি হয়েছে 'নক্ষত্র গুচ্ছ' থেকে। মহাকাশে প্রতিটি গ্যালাক্সির ভেতরই বহু সংখ্যক 'নক্ষত্র গুচ্ছ' (Globular cluster) রয়েছে। যেখানে লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্র দলবদ্ধ হয়ে বাস করছে। মহাজাগতিক কোন কারণে তারা এই দলবদ্ধ অবস্থা ধরে রেখে পরস্পর, পরস্পরের আরও নিকটবর্তী হয়ে এক পর্যায়ে 'কোয়াসার' (Quasar) এর জন্ম দিয়েছে।

মধ্যম ধরনের একটি নক্ষত্র। এর ব্যাস হচ্ছে প্রায় ১৩,১৯,৯৫০ কিলোমিটার বা ৮,৬৪,৯৪০ মাইল। এর ভর হচ্ছে প্রায় ১৯৮৮৯ x $১০^{২৭}$, টন। সূর্যের মূল উপাদান হচ্ছে- হাইড্রোজেন ৭৩% এবং হিলিয়াম ২৫%, আর বাদ বাকী অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন হচ্ছে– ২% মাত্র। সূর্যের 'কেন্দ্র' বা কোর (Core) মোট আয়তনের প্রায় ৩০ ভাগ নিয়ে গঠিত। এ 'কোর'-এর পরে চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপী Radiative zone' (আলো বিচ্ছুরিত এলাকা)। এ রেডিয়েটিভ এলাকার পর চতুর্দিকে হাজার হাজার মাইল ব্যাপী যে এলাকা গঠিত, তাকে 'Convection zone' বলা হয়। তারপরের অংশকে বলা হয় 'উজ্জ্বল আবরণ' বা 'Photosphere' যা মাত্র ২০০ মাইলের মতো চওড়া। এ Photosphere-র পর ৬০০ মাইল (প্রায়) ব্যাপী পুরু অংশকে বলা হয় 'পৃষ্ঠদেশ' বা 'Cromosphere' সূর্যের দৈহিক গঠন এখানেই শেষ। এখান থেকে এবার চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপী শুরু হয়েছে সূর্যের 'আবহমণ্ডল' বা 'Corona'।

সূর্যের ভেতর 'হাইড্রোজেন' এবং 'হিলিয়াম' পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। হাইড্রোজেন পরমাণুর 'নিউক্লিয়াস' পজেটিভ চার্জযুক্ত একটি মাত্র প্রোটন দিয়ে গঠিত। সূর্যের কেন্দ্র বা Core-এ 'Fusion' (বিগলন) পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন-হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বর্ণনাতীত পরিমাণ High energy radiation তথা Gamma-ray উৎপন্ন হয় এবং সূর্যকে এভাবে অনবরত কর্মক্ষম রাখে। আমাদের সূর্যের ভেতর প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন টন 'হাইড্রোজেন'–'হিলিয়ামে' রূপান্তরিত হওয়ার সময় প্রায় ৪ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ধ্বংস হওয়ার মুহূর্তে আইনস্টাইনের সূত্র মতে ($E=mc^2$) High energy radiation (Gamma-ray) উৎপন্ন হয়ে গোটা সৌরজগতকে তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী উল্লিখিত 'Fusion' পদ্ধতিতে মাত্র ১ গ্রাম পদার্থের হারিয়ে যাওয়া শক্তির পরিমাণ হচ্ছে ৬.৭৫ x $১০^{১১}$ জৌল, যা ১kw (এক কিলো ওয়াট) শক্তিসম্পন্ন Electric fire কে ২০ বছর পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখতে যথেষ্ট– এতো প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতিময় করেছেন এবং ওদের গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত বাস্তব নিদর্শন বিশেষভাবে বিবৃত করেন।" (১০ : ৫)
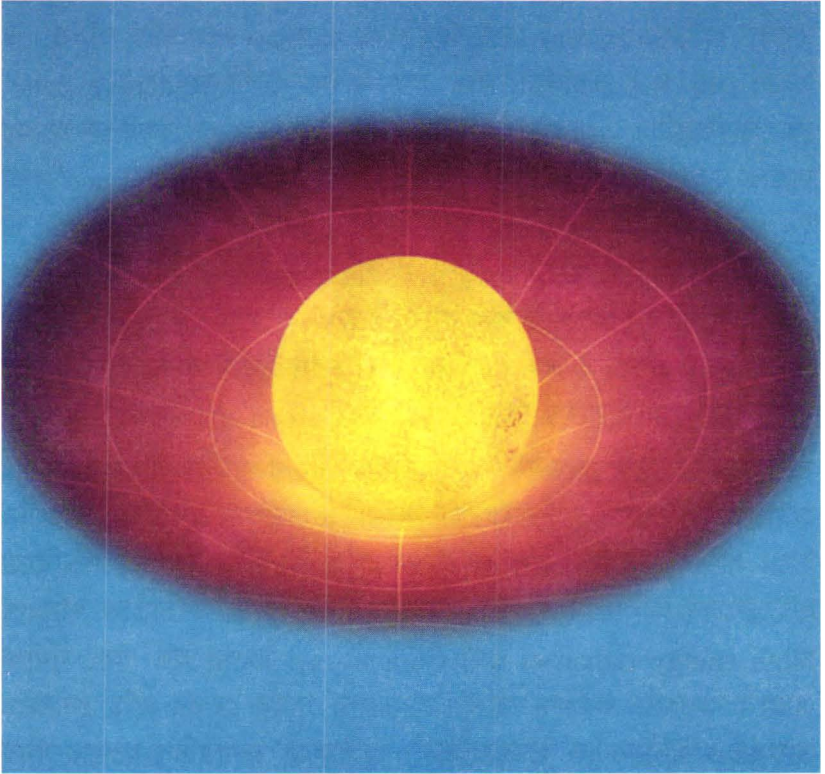
চিত্র-১১

আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র ও প্রাণ হচ্ছে ছবির জ্বলন্ত সূর্যটি। এর ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৮৬ লক্ষ মাইল। এর ভর হচ্ছে প্রায় ১৯৮৮৯x$১০^{২৭}$ টন। এর ভেতর উপাদান হচ্ছে– হাইড্রোজেন ৭৩%, হিলিয়াম ২৫%, বাদ বাকী অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ২% মাত্র।

সূর্যের ভেতর প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন টন 'হাইড্রোজেন' চেইন রিয়েকশানে 'হিলিয়ামে' রূপান্তরিত হচ্ছে। এতে প্রচণ্ড আলো ও তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হয়ে সমগ্র সৌর পরিবারকে জীবন্ত করে রাখছে।

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে ।"

(১৪ : ৩৩)
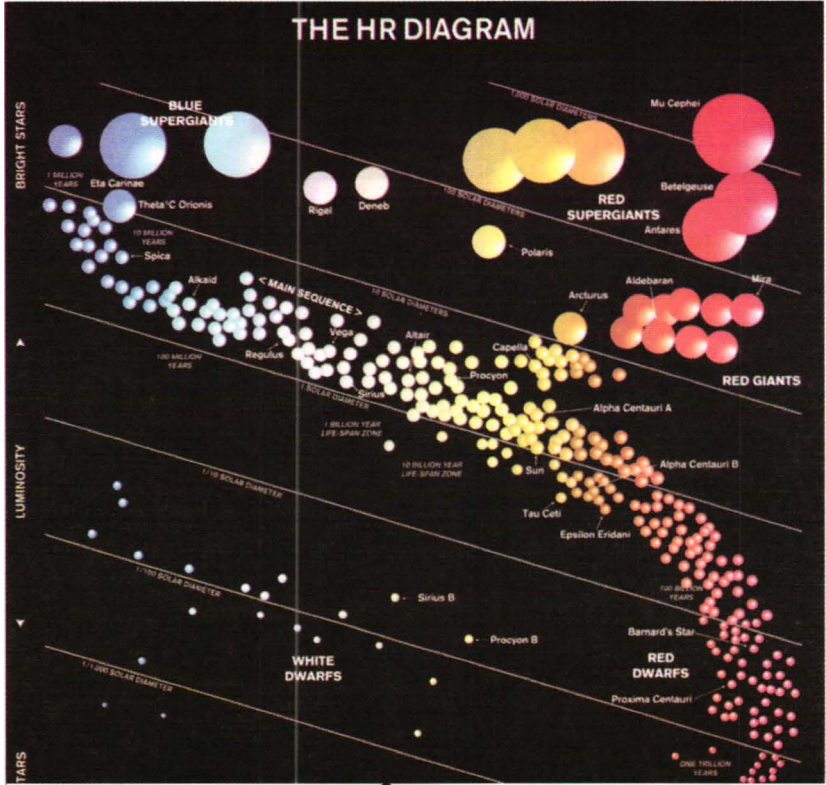
চিত্র-১২

আমাদের সূর্যটি একটি মাঝারি আকৃতির নক্ষত্র। যার অবস্থান Main sequence নক্ষত্রদের মাঝে। এ নক্ষত্রগুলো সাধারণত ধাতব পদার্থের তৈরি এবং মাঝারি গড়নের।

আমাদের এ সূর্যটির ভেতর প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৪ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন বস্তুভর চেইন রিয়েকশানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে আইনস্টাইনের সমীকরণ $E=mc^2$ এর অনুকূলে তাপশক্তিতে রূপান্তর ঘটে। উক্ত শক্তিই মূলত সৌরজগতকে বাঁচিয়ে রাখে। সূর্যের ভেতরে এত প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে যে, প্রতি ১ গ্রাম পদার্থের রূপান্তরিত তাপ শক্তির পরিমাণ হচ্ছে– ৬.৭৫x১০^{১১} জৌল, যা ১kw শক্তি সম্পন্ন Electric fire কে ২০ বছর জ্বালিয়ে রাখতে যথেষ্ট।

সূর্য এবং চন্দ্র (মহান আল্লাহর) গণনায় নিয়ন্ত্রিত রয়েছে।" (৫৫ : ৪)
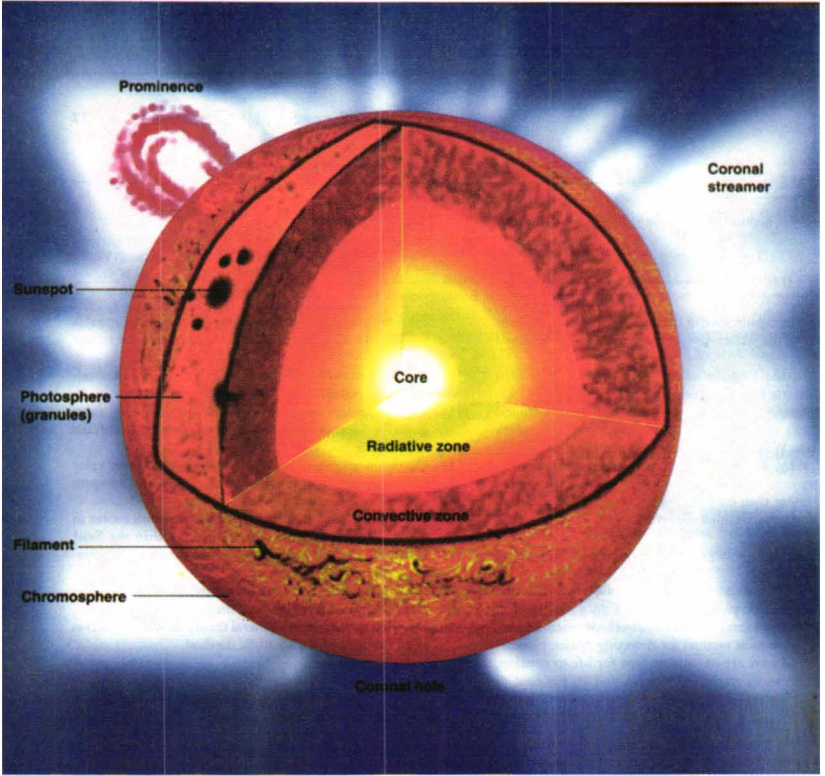
চিত্র-১৩

আমাদের সূর্যের কেন্দ্র বিন্দুতে আছে 'কোর' (Core)। এই 'Core' বা কেন্দ্র (Centre) মোট আয়তনের ৩০ ভাগ নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রের চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইলব্যাপী অংশ হচ্ছে– 'Radiatiue zone'। এই এলাকার পর চতুর্দিকে হাজার হাজার মাইলব্যাপী 'Convection zone'। তারপরের প্রায় ২০০ মাইলের চওড়া অংশকে বলে 'Photosphere'। তারপরের প্রায় ৬০০ মাইলের পুরো অংশকে বলা হয় 'Cromosphere' বা পৃষ্ঠদেশ। এ পর্যন্ত হচ্ছে সূর্যের দেহের গঠন। সূর্য থেকে মহাশূন্যে চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপী' এলাকাকে বলা হয়। 'Corona' বা আবহমণ্ডল। এখানে তাপমাত্রা প্রায় ২০০০,০০০°c (দুই মিলিয়ন ডিগ্রি)-র প্রচণ্ডতা নিয়ে বজায় থাকে।

"এতে (আল্লাহর উপস্থিতির) নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" (১৪ : ৫)
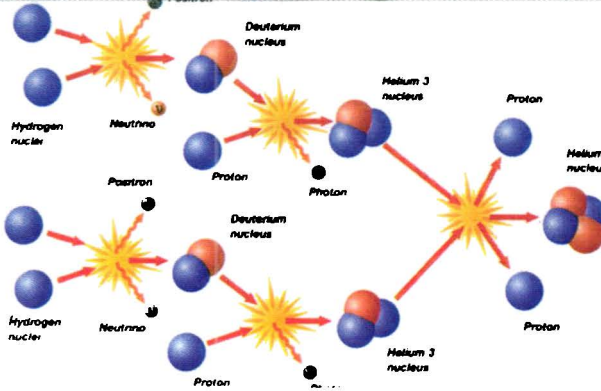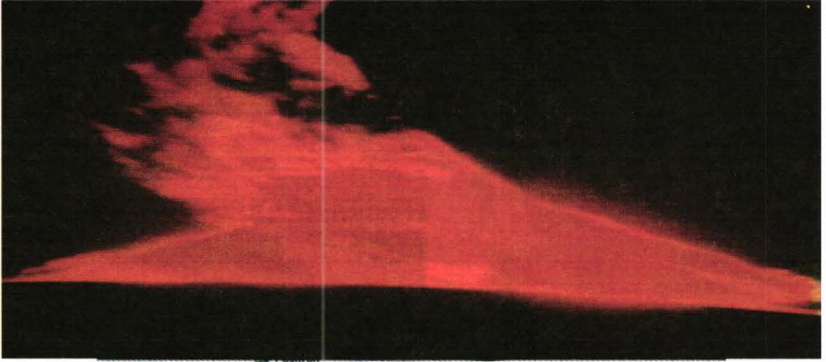
চিত্র-১৪

'প্রোটন-প্রোটন চেইন রিয়েকশান'-এ একটি 'নিউট্রন' (Neotron) কণিকার সাথে একটি 'পজিট্রন' (Positron) ও একটি 'নিউট্রিনো' (Neutrino) সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরক্ষণে 'পজিট্রন' কণিকা 'ইলেক্ট্রন' কণিকার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে উভয়ের ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে প্রচণ্ড 'গামা-রে উৎপন্ন করে। এভাবে বার বার হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম কণিকাদ্বয় নিজেরা নিজেরা পরস্পর মিলিত হতে গিয়ে 'পজিট্রন' কণিকা সৃষ্টি এবং সেই 'পজিট্রন' পরক্ষণে 'ইলেক্ট্রন' কণিকার সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে উভয়ের ধ্বংসের ভেতর দিয়ে ভয়ঙ্কর 'গামা-রে' উৎপন্ন করে সূর্যের ভেতর ভরে দিচ্ছে।

সূর্য বা নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার মুহূর্তে অভিকর্ষ বলের কারণে এর কেন্দ্রে প্রচণ্ড ঘনায়নে প্রচুর পরিমাণে চাপ এবং তাপের (প্রায় ১৫০০০°c) সৃষ্টি হয়। ঐ চাপ এবং তাপ হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থানরত 'প্রোটন' কণিকাকে অপর পরমাণুর 'প্রোটন' কণিকার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ধাক্কা (Push) দেয়। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে দু'টি 'হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস' তথা প্রোটন খুবই কাছাকাছি এসে একটি ভারী 'হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস' তৈরী করে, যা 'Deuterium' নামে পরিচিত। এই 'Deuterium' নিউক্লিয়াস একটি পজেটিভ চার্জযুক্ত 'প্রোটন' কণিকা এবং একটি নিরপেক্ষ বা চার্জমুক্ত 'নিউট্রন' কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। নতুন এই 'নিউট্রন' কণিকার আগমন ঘটে পূর্বের একটি ' প্রোটন' কণিকার রূপান্তর প্রক্রিয়ার কারণে। ঐ রূপান্তরে উল্লিখিত 'নিউট্রন' কণিকার সাথে একটি 'পজিট্রন' ও একটি 'নিউট্রিনো' নামক ক্ষুদ্র ২টি কণিকাও সৃষ্টি হয়। 'নিউট্রিনো' সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথেই সূর্য থেকে পালিয়ে যায়, কিন্তু 'পজিট্রন' ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষে (Annihilation) জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে 'পজিট্রন' (Positron) এবং 'ইলেকট্রন' (Electron) উভয়ের ধ্বংস সাধনের ভেতর দিয়ে Gamma-ray আত্মপ্রকাশ করে (A Positron is an anti-electron, an example of anti-matter, whenever a particle and its anti-particle meet, they annihilate each other, forming Gamma-rays)। পরক্ষণে অন্য হাইড্রোজেন পরমাণুর ' প্রোটন' কণিকা সৃষ্ট এই 'Deuterium' নিউক্লিয়াসকে' আঘাত করে। ফলে হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস তৈরী হয়, যা দু'টি ' প্রোটন' কণিকা ও একটি 'নিউট্রন' কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। এবার Proton-proton chain reaction-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে হিলিয়াম-৩ এর দু'টি নিউক্লিয়াস বাধ্য হয়ে পরস্পর মিলিত হওয়ার মাধ্যমে হিলিয়াম-৪ নিউক্লিয়াস তৈরী করে, যা দু'টি প্রোটন কণিকা এবং দু'টি নিউট্রন কণিকাকে ধারণ করে থাকে। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত দু'টি প্রোটন কণিকা পূর্বের ন্যায় নিরপেক্ষ বা চার্জমুক্ত 'নিউট্রন' কণিকা এবং প্রায় পজেটিভ চার্জযুক্ত 'পজিট্রন' এবং চার্জমুক্ত 'নিউট্রিনো' ক্ষুদ্র

"শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করতে বলো না।" (২১ : ৩৭)
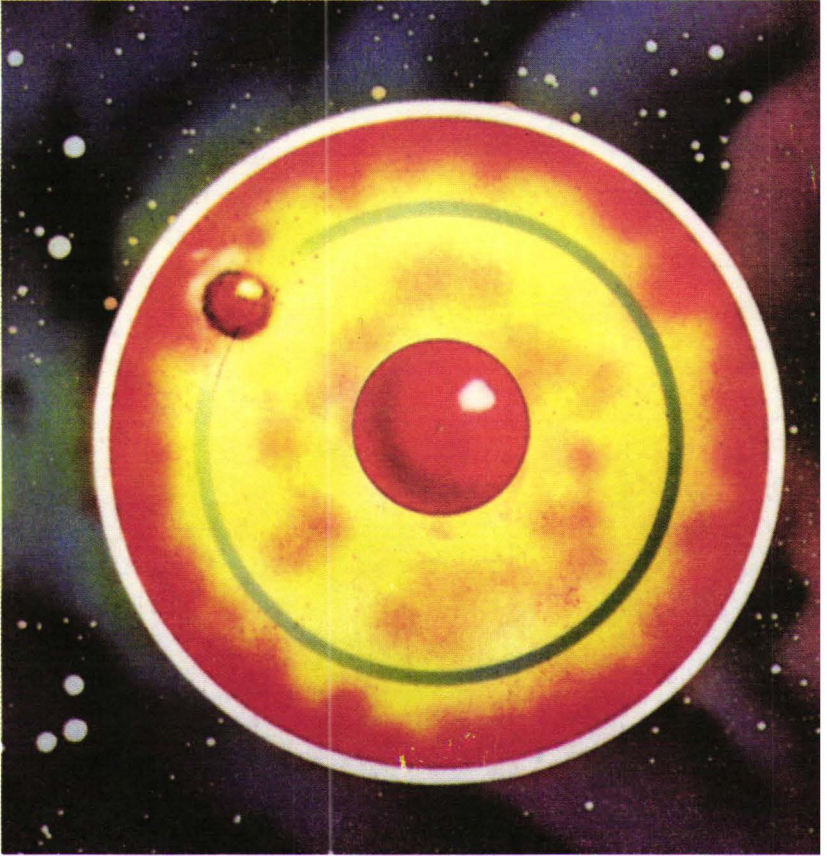
চিত্র-১৫

সূর্যের অভ্যন্তরে প্রায় ১৫,০০০°c তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর 'প্রোটন' কণিকা অপর পরমাণুর 'প্রোটন' কণিকাকে (মিলিত হওয়ার জন্য পরস্পর পরস্পরকে) ধাক্কা দেয়। যার পরিণতিতে দুটি 'প্রোটন' কণিকা মিলিত হয়ে একটি ভারী 'হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস' গঠিত হয়। একেই 'Deuterium Nucleus' বলে।

এখানে জানা দরকার, একটি 'হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস' একটি মাত্র 'প্রোটন' কণিকা দিয়ে সৃষ্ট। Deuterium Nucleus সৃষ্টির সময় সর্বপ্রথম একটি 'Neutron' (নিউট্রন) কণিকার সৃষ্টি হয়ে পরবর্তী সকল প্রকার কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া শুরু হয়ে যায়।

"তিনিই সূর্যকে করেছেন তেজস্কর (তেজস্ক্রিয়তা উৎপাদনকারী)।" (১০ : ৫)
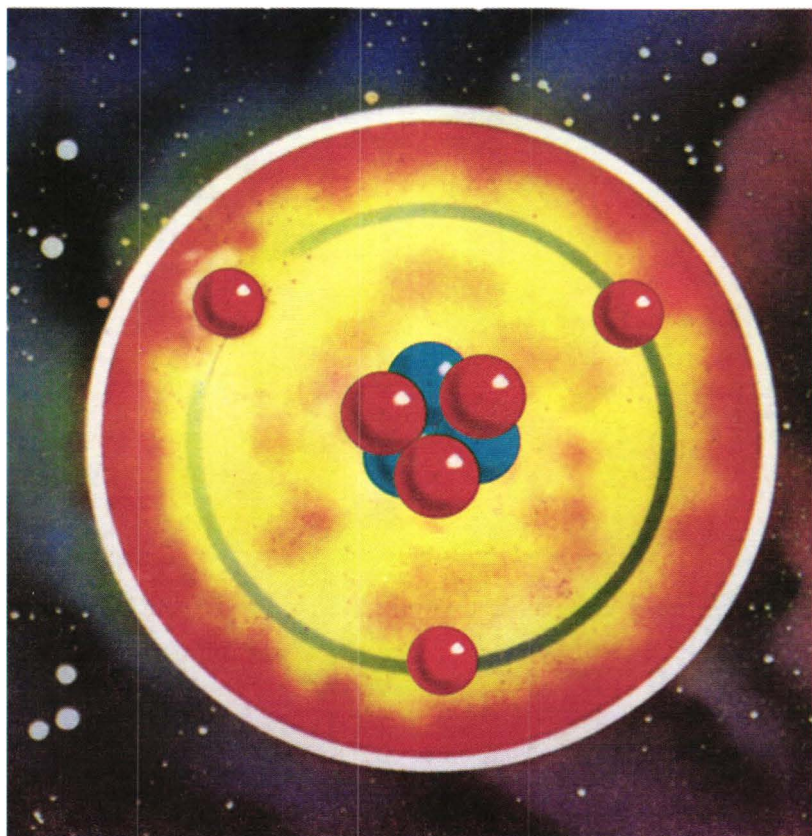
চিত্র-১৬

সূর্যের ভেতর অর্থাৎ নক্ষত্রের কেন্দ্রে 'ডিউটেরিয়াম' নিউক্লিয়াসকে দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন একটি প্রোটন' কণিকা আঘাত করে তখন 'হিলিয়াম-৩ নিউক্লিয়াস' তৈরী হয়, যা দু'টি 'প্রোটন' কণিকা ও একটি 'নিউট্রন' কণিকার সমম্বয়ে গঠিত। অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে হিলিয়াম-৩ এর দু'টি নিউক্লিয়াস প্রচণ্ড তাপমাত্রার কারণে বাধ্য হয়ে পরস্পর মিলিত হওয়ার মাধ্যমে হিলিয়াম-৪ নিউক্লিয়াস তৈরি করে, যা দু'টি প্রোটন কণিকা ও দু'টি নিউট্রন কণিকাকে ধারণ করে থাকে। উল্লিখিত Chain reaction এর মাধ্যমে একযোগে নক্ষত্রের ভেতর একদিকে নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হতে থাকে, অপরদিকে কল্পনাতীত প্রচণ্ড তাপ ও তেজস্ক্রিয়তা (Rediation) সৃষ্টি হয়ে প্রতিনিয়ত মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কণিকাদ্বয়কে সৃষ্টি করে। ফলে 'নিউট্রন' কণিকা ' প্রোটন' কণিকার সাথে মিলিত হয়ে Deuterium নিউক্লিয়াস তৈরী করে। 'নিউট্রিনো' সূর্য থেকে পালিয়ে বের হয়ে যায় এবং 'পজিট্রন' কণিকাদ্বয় Anti-electron-র কারণে ইলেকট্রন (Electron) কণিকার সাথে সংঘর্ষে পূর্বের বর্ণনানুযায়ী উভয়ের ধ্বংস সাধনের ভেতর দিয়ে ব্যাপক আকারে ক্ষতিকর প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন High energy radiation বা Gamma-ray সৃষ্টি করে। যার Wave-length খুবই ছোট। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে সূর্য বা নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তার সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে অনবরত এভাবে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয়ে চলেছে।

অতঃপর সূর্যের কেন্দ্র বা কোরে (Core) সৃষ্ট এই high energy radiation আস্তে আস্তে 'Radiative zone'-এর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে বহির্মুখী যাত্রা শুরু করে। যেহেতু সূর্যের আভ্যন্তরীণ ভাগ পদার্থে পরিপূর্ণ তাই Radiation খুব সহজেই পথ চলতে পারে না। এই Radiation-এর ক্ষুদ্র কণিকা 'Photon' (ফোটন) পদার্থ কণার সাথে সংঘর্ষে এলোমেলো পথে চলতে বাধ্য হয়। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে এভাবে এলোপাথাড়ী চলার কারণে (Photon) কণিকা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং Gamma-ray থেকে X-ray, Ultra-voilet ray, Infrared ray, এবং Visible light -এর উৎপত্তি ঘটতে থাকে। এভাবে প্রায় এক মিলিয়ন বছর লেগে যায় উৎপন্ন Gamma-ray কে Radiative zone, Convection zone-এ পৌঁছতে। Radiative zone -এ তাপমাত্রা থাকে প্রায় ৫০০০,০০০°c (প্রায় পাঁচ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এরপর Convection-এ আগমন করার পর তাপমাত্রা কমে গিয়ে ১৫,০০,০০০°c দাঁড়ায়। High energy radiation এরপর ফটোস্ফেয়ার (Photosphere)-এ আগমন করে। এখানে তাপমাত্রা আরো কমে গিয়ে প্রায় ৬০০০°c পৌঁছে। তারপর 'ক্রমোস্ফেয়ার'(Cromosphere)-এ পৌঁছা মাত্র তাপমাত্রা পুনরায় বাড়তে থাকে এবং প্রায় ১৫০০০°c পর্যন্ত প্রদর্শন করে। সূর্যের (নক্ষত্রের) অভ্যন্তরে সৃষ্ট এ ভয়ঙ্কর তাপশক্তি যখন সূর্যদেহের সর্বশেষ অংশ 'ক্রমোস্ফেয়ার' (Cromosphere) ত্যাগ করে

চতুর্দিকে 'করোনা' (Corona) নামক বহির্দেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে প্রায় ২০০০,০০০°c (দুই মিলিয়ন)-এ উন্নীত হয়। এই প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে দিনের বেলায় আমরা সূর্যের বহির্দেশে (Corona-তে) তাকাতে পারি না। চোখ ঝলসে যায় কল্পনাতীত উজ্জ্বলতার কারণে।

উল্লিখিত প্রচণ্ড তাপের কারণে সূর্যের পৃষ্ঠদেশে যে বিরাট-বিশাল 'অগ্নি লেলিহান শিখা' (Solar flare) উৎপন্ন হয়, তা প্রায় ৪০০,০০০ (চার লক্ষ কিলোমিটার) লম্বা ৫০,০০০ কিলোমিটার (পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটার) উঁচু এবং প্রায় ৮,০০০ কিলোমিটার চওড়া হয়ে থাকে।

সূর্য থেকে উৎপন্ন Gamma-ray, X-ray, Ultra-violet ray এবং Infrared-ray জীব এবং প্রাণীকুলের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তবে পরিমিত পরিমাণে কেবল মাত্র Infrared-ray এবং Visible light জীব এবং প্রাণী জগতের জীবন সাইকেল কার্যক্ষম রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরী। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং চৌম্বকক্ষেত্র উল্লিখিত ঐ ক্ষতিকর রশ্মিসমূহ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে চলেছে। এদেরকে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে দেয় না, পৃথিবীর দুই মেরুতে চলে যেতে বাধ্য করে। এছাড়াও 'Ozon' (ওজোন) লেয়ার ক্ষতিকর রশ্মি এবং Radiation-কে শোষণ করে প্রায় নিঃশেষ করে দেয়। সেই 'ওজোন লেয়ার' কোনো কারণে কমে গেলে পৃথিবী জুড়ে জীব এবং প্রাণীকুল শারীরিক বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয়। শরীরের কোষসমূহ ধ্বংস হয়, ক্যান্সারসহ শরীরের চামড়া-গোশত পুড়ে গিয়ে নানা ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে।

আমাদের প্রতিদিনের 'সূর্য' নামক একটি মাত্র নক্ষত্রের ভেতরকার যে ইতিহাস বর্ণিত হলো, তাতে তার ভয়াবহরূপে আমরা সর্বক্ষণই আতঙ্কিত না হয়ে পারি না। তার একটি সেকেণ্ডের উৎপন্ন তাপ এবং শক্তি আমাদের এ পৃথিবীতে বর্তমান সভ্যতা আগামী ৫০০ বছরেও ব্যবহার করে শেষ

"ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, এতো চিরাচরিত যাদু।" (৫৪ : ২)

চিত্র-১৭

মহাশূন্যে সূর্য নামক নক্ষত্রটির কেন্দ্রে Proton-Proton chain reaction-এ প্রতিনিয়ত প্রায় পাঁচ মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (৫০০০,০০০°c) তাপমাত্রা সৃষ্টি হচ্ছে। এই তাপ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে সূর্য দেহের বাইরে 'Corona' নামক মহাশূন্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সময় প্রায় দুই মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে (২০০০,০০০°c) নেমে আসে। এ কারণে দিনের বেলায় আমরা খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকাতে পারি না। চোখ প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তার উজ্জ্বলতায় ঝলসে যায়। একটি নক্ষত্রের বেলায় এ অবস্থা ঘটলে লক্ষ-কোটি নক্ষত্রে পূর্ণ 'জাহান্নাম'-এর অবস্থা কেমন হতে পারে, একবার ভাবতে পারেন?

"আমি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে বিরাট বিরাট স্ফুলিঙ্গ (Huge spark) ওয়ালা অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক-সাবধান করছি।" (৯২ : ১৪)
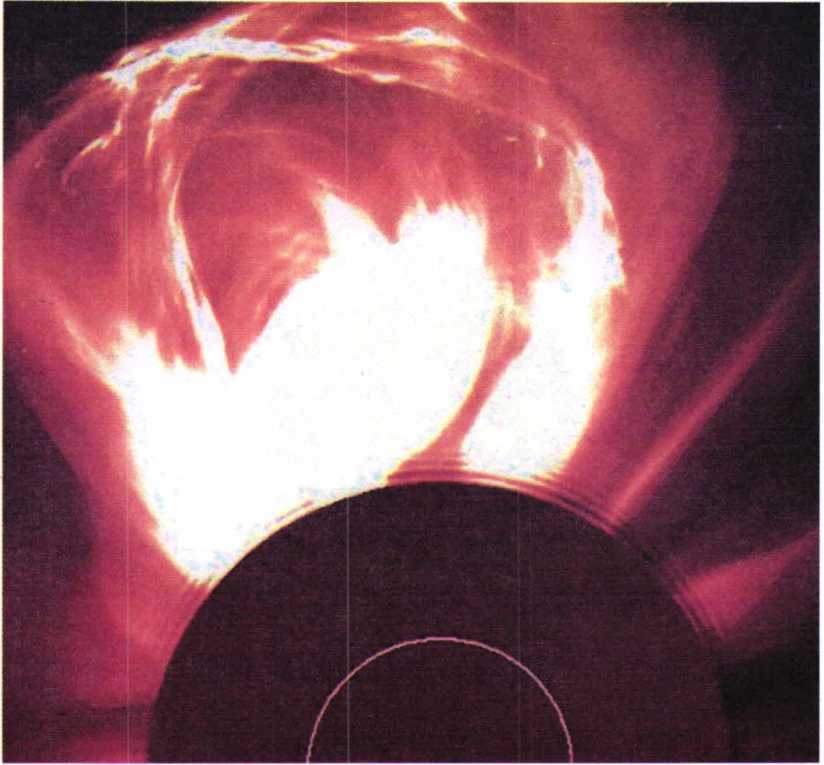
চিত্র-১৮

উপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড তাপের কারণে নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশে যে বিরাট বিরাট আগুনের লেলিহান শিখা (Solar flare) সৃষ্টি হয়ে থাকে তা লম্বায় প্রায় চার লক্ষ (৪০০,০০০) কিলোমিটার এবং উচ্চতায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) কিলোমিটার। চওড়ায় প্রায় আট হাজার (৮০০০) কিলোমিটার হয়ে থাকে।

এতে দেখা যাচ্ছে নক্ষত্রের বাইরের দিকে সৃষ্ট অগ্নি লেলিহান শিখা ভয়ানক এক ব্যাপার, যে শিখার ভেতর আমাদের ৮০০০ কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন পৃথিবীও হারিয়ে যাবে এবং নিমিষেই প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তায় জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। একটি মাত্র নক্ষত্রের ভেতর যদি উল্লিখিত অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে তাহলে কোটি কোটি নক্ষত্র প্যাক্ট (Packed) অবস্থায় 'জাহান্নাম'-এ অগ্নিকুণ্ডের অবস্থা কত ভয়ানক হতে পারে, তা কল্পনা করা যায়? 'কোয়াসার' প্রমাণ করেছে 'জাহান্নাম' সত্য ঘটনা। তাই একে ভয় করা মানুষের কর্তব্য।

"তিনি (আল্লাহ্) পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন (Main sequence নক্ষত্রের সাথে যেন সার্বিক সুবিধা হয়) সৃষ্ট প্রাণের জন্য।" (৫৫ : ১০)
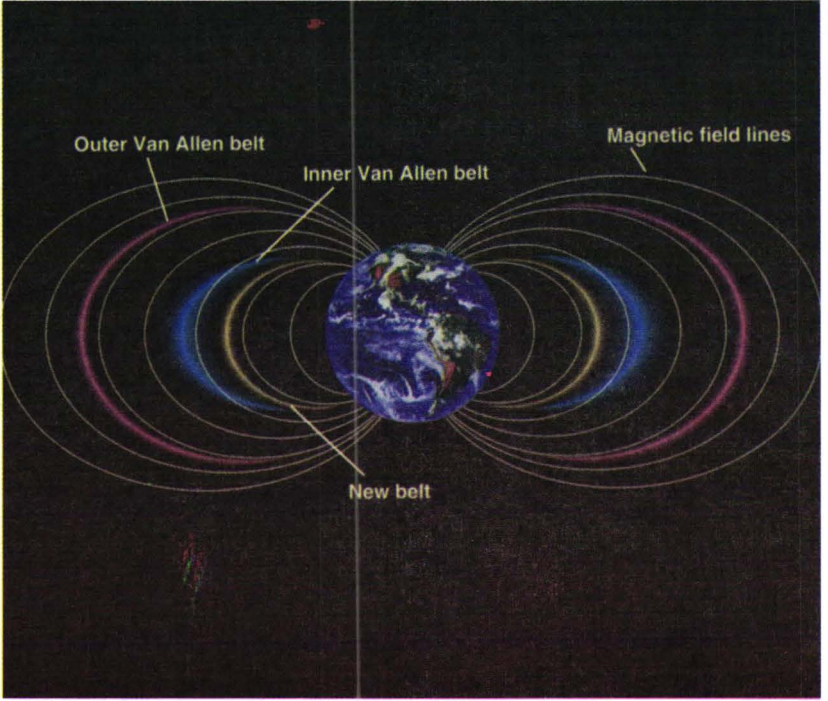
চিত্র-১৯

পৃথিবীর 'বায়ুমণ্ডল ও চৌম্বকক্ষেত্র' পৃথিবীকে ঢাল হিসেবে বিভিন্ন প্রকার বিপদ থেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছে। সূর্য নামক নক্ষত্রের ভেতর যে ভয়ঙ্কর Gamma-ray, X-ray, Ultraviolet-ray ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে এক পর্যায়ে পৃথিবীতে আসতে থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও চৌম্বকক্ষেত্র এদের প্রচণ্ডভাবে বাধা দান করে। ফলে বায়ুমণ্ডল তথা 'ওজোন লেয়ার'কে ভেদ করে আসতে পারে না। 'ওজোন গ্যাস' তাদের শোষণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করে। এরপরও যদি ক্ষতিকর ঐসকল রশ্মি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে কিছু পরিমাণে বা বেশি পরিমাণে চলে আসে তাহলে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু টেনে নিয়ে যায়। ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠ রক্ষা পেয়ে যায়। তা না হলে কোন প্রাণী পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারতো না।

"যিনি (আল্লাহ্) আকাশকে তোমাদের জন্য ছাদস্বরূপ করেছেন।" (২ : ২২)
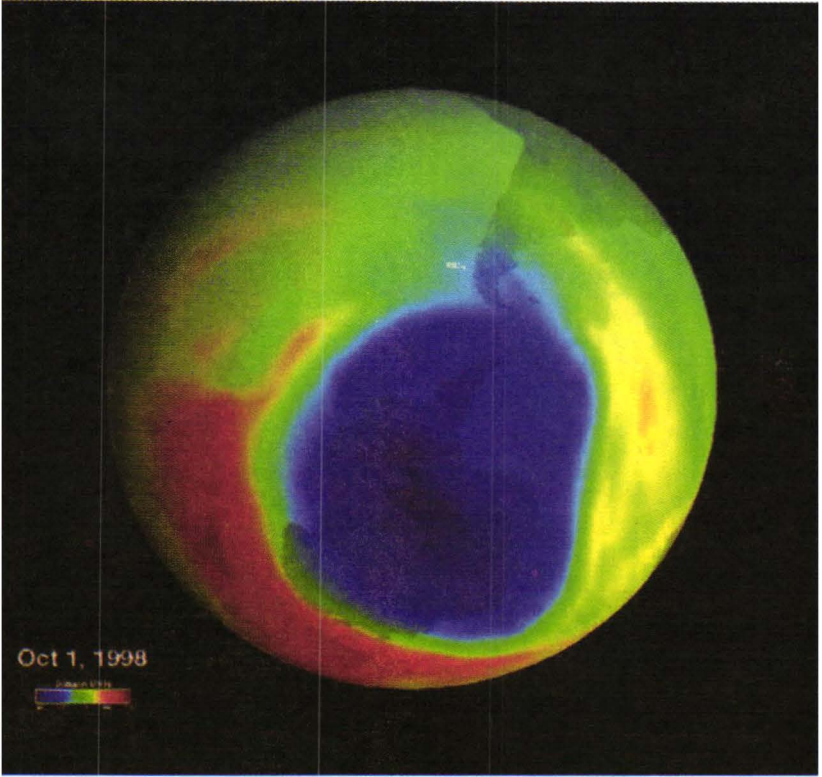
চিত্র-২০

–পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ৬০০ মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডলের স্তর রয়েছে। যতই উপরের দিকে উঠা যাবে, ততই বায়ুমণ্ডল পাতলা হতে থাকে। এক পর্যায়ে গিয়ে উপরের দিকে আর কোন প্রকার বায়ুমণ্ডল পাওয়া যায় না।

পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ৮ থেকে ১২ মাইলের মধ্যে একটি 'OZON LAYER' আছে। এখানে মূলত 'Ozon gas' বিরাজমান থাকে। এই গ্যাসের প্রধান কাজই হলো বহির্বিশ্ব থেকে আগত ক্ষতিকর যে কোন ধরনের রশ্মিকে শোষণ করে পৃথিবীকে বিপদমুক্ত রাখা। তাই গামা-রে, এক্স-রে, কিংবা এ জাতীয় ক্ষতিকর রশ্মিকে প্রতিনিয়ত প্রতিহত করে আমাদের রক্ষা করাই হচ্ছে 'ওজোন লেয়ার'-এর কাজ। এর অনুপস্থিতিতে প্রাণ এই পৃথিবীতে কখনোই টিকতে পারতো না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

করতে পারবে না। সূর্যের কেন্দ্র কোরে (Core-এ) একটি সেকেণ্ডে অভাবনীয়-অচিন্তনীয় পরিমাণে ক্ষতিকর যে Gamma ray উৎপন্ন হয়, তা যদি সরাসরি পৃথিবীতে আগমন করতে পারে, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই সকল প্রকার জীব এবং প্রাণীকুলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে-গালিয়ে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ এ ক্ষতিকর গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবার পর বিজ্ঞানবিশ্ব শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আজকের মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ সে কারণে এ ক্ষতিকর রশ্মির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সকল সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তবেই তারা মহাকাশে যাত্রা করে থাকেন।

একটি মাত্র নক্ষত্র তাও মাঝারি ধরনের নক্ষত্রের (সূর্যের) ভেতরে যদি প্রতিটি মুহূর্তে বর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে মিলিয়ন-মিলিয়ন (লক্ষ কোটি) নক্ষত্রের ঠাসাঠাসিভাবে পূর্ণ (Packed) করা 'কোয়াসার' (Quasar) নামক মহাকাশীয় বস্তুটির অবস্থা কি রকম আশ্চর্যজনক ও ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা কি একবারও ভাবতে পারেন? কোয়াসারের উজ্জ্বলতা, বিকিরণ ও তার চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ খেই হারিয়ে ফেলেছেন। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাসকেও 'কোয়াসার' হার মানিয়েছে। যার অভ্যন্তরে প্রতি সেকেণ্ডে Proton-proton chain reaction-এ অবিশ্বাস্য রকমের ধ্বংস সাধনকারী যে Gamma-ray (Highest energetic radiation) সৃষ্টি হচ্ছে যার উজ্জ্বলতা, ক্ষমতা এবং শক্তি প্রায় ১০০০টি গড় গ্যালাক্সির (একটি গড় গ্যালাক্সি প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত এবং প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাপী জায়গা নিয়ে বিস্তৃত) বিকিরণ, শক্তি-ক্ষমতার চাইতেও বেশি। অথচ একটি 'কোয়াসার' (Quasar)-এর আয়তন মাত্র এক বা একাধিক সৌরজগতের সমান। যা শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও বাস্তবে কিন্তু সত্য। অধিকাংশ কোয়াসারই কিন্তু বিলিয়ন-বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে, পৃথিবী থেকে দর্শন সীমার একেবারে প্রান্তে আবিষ্কৃত হয়েছে। এত দূরে থাকার পরও উল্লিখিত আচরণের মাধ্যমে সমগ্র মহাকাশে গৌরবের চিহ্ন বহন করে বেড়াচ্ছে।

"এটা উৎক্ষেপণ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ (Huge spark) অট্টালিকাতুল্য।"
"বিদ্রোহীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নিদুর্গের শাস্তি।" (৬৭ : ৩৫)
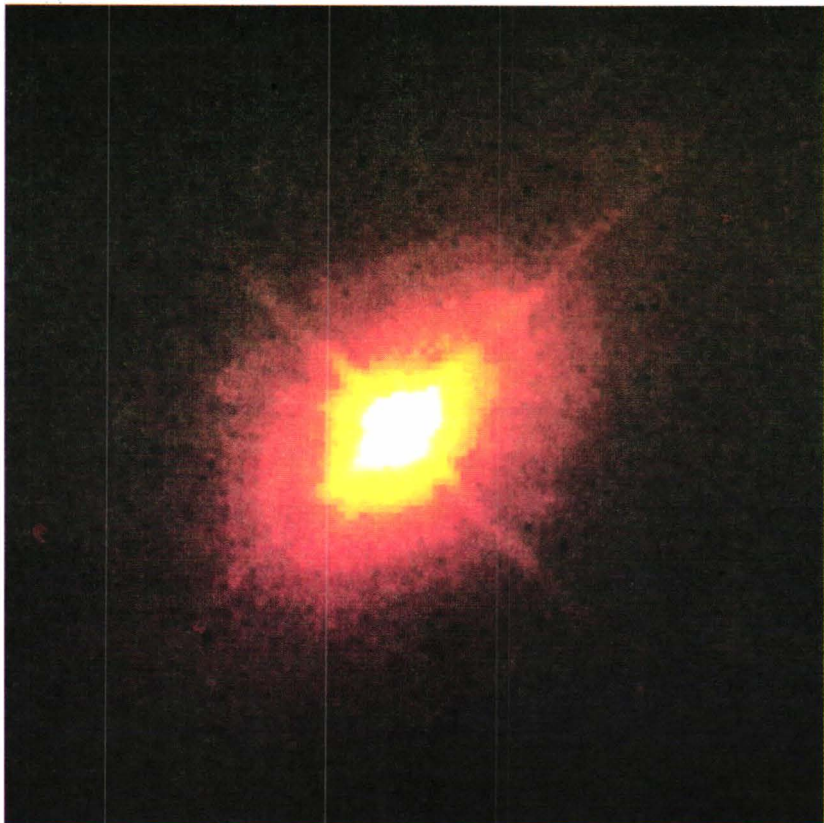
চিত্র-২১

– ছবিতে দৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নিদুর্গ 'কোয়াসার' দেখা যাচ্ছে যার অভ্যন্তরে কোটি কোটি নক্ষত্র ঠাসাঠাসিভাবে পূর্ণ করা আছে। একটি নক্ষত্র (আমাদের সূর্যটি) যেখানে ধারণার বাইরে ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ড তাপ ও তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে প্রতি মুহূর্তে মহাবিপদের পরিবেশ তৈরী করে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কোটি কোটি নক্ষত্র সমৃদ্ধ কোয়াসার মানব জাতির জন্য ভবিষ্যতে কি ধরনের ভয়াবহ অবস্থা উপহার দিতে পারে, তা বোধ হয় আর জ্ঞানীদের সম্মুখে বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ আমাদের অগ্নিদুর্গ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে অস্বীকারকারীদের শাস্তিস্বরূপ যে 'অগ্নিকুণ্ড'-এর চিত্র বর্ণনা করেছে, বর্তমান বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত আশ্চর্যজনক 'কোয়াসার' (Quasar)-এর চিত্র-চরিত্রের সাথে তার কোন গরমিল আছে কী? 'কোয়াসার' এবং 'জাহান্নাম' কি একই ভয়াবহতার পরিচয় বহন করছে না? 'কোয়াসার' নামক এই নিদর্শন বা নমুনা (Sample) আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যারা 'জাহান্নাম'কে অসম্ভব, অবাস্তব এবং কল্পকাহিনী ভেবে তামাশার মাধ্যমে উড়িয়ে দিতো, আজকের আবিষ্কৃত 'কোয়াসার' (Quasar) কি তাদের সামনে মহাসত্যের বাস্তব দুয়ার খুলে ধরেনি? আকাশ জগতের 'কোয়াসার' নামক জ্বলন্ত ও প্রচণ্ড 'অগ্নিকুণ্ড' বর্ণিত 'জাহান্নাম'-এর যে নমুনা বা মহড়ারূপে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের সামনে হাজির হয়েছে তা আর অস্বীকার করা কি সমীচীন হবে?

'বৃহৎ বৃহৎ অগ্নি লেলিহান শিখা'

আল-কুরআন

"এটা (জাহান্নাম) উৎক্ষেপণ করবে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাতুল্য অগ্নি লেলিহ-ান শিখা (QSR)।" (৭৭ ঃ ৩২)

উল্লিখিত ৭৭ ঃ ৩২ আয়াতে জাহান্নামের মধ্যে সৃষ্ট বিরাট বিরাট অগ্নি লেলিহানকে (QSR) বলা হয়েছে। যার তেজস্ক্রিয়তা, বিকিরণ এবং ধ্বংস সাধন ক্ষমতা হবে প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর, কল্পনার অতীত। অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের এই ভয়াবহ, প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা (Radiation), বিকিরণ এবং এর প্রভাবের কারণেই লেলিহান শিখাকে 'কসর' (QSR) বলা হয়েছে। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্‌র মহাজ্ঞানের পরিচয় বহনকারী এ ক্ষুদ্র আয়াতটির মূল বক্তব্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য পৃথিবীর মানবমণ্ডলীকে প্রায় দেড় হাজার বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে।

"অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ডে।" (৪০ : ৭২)
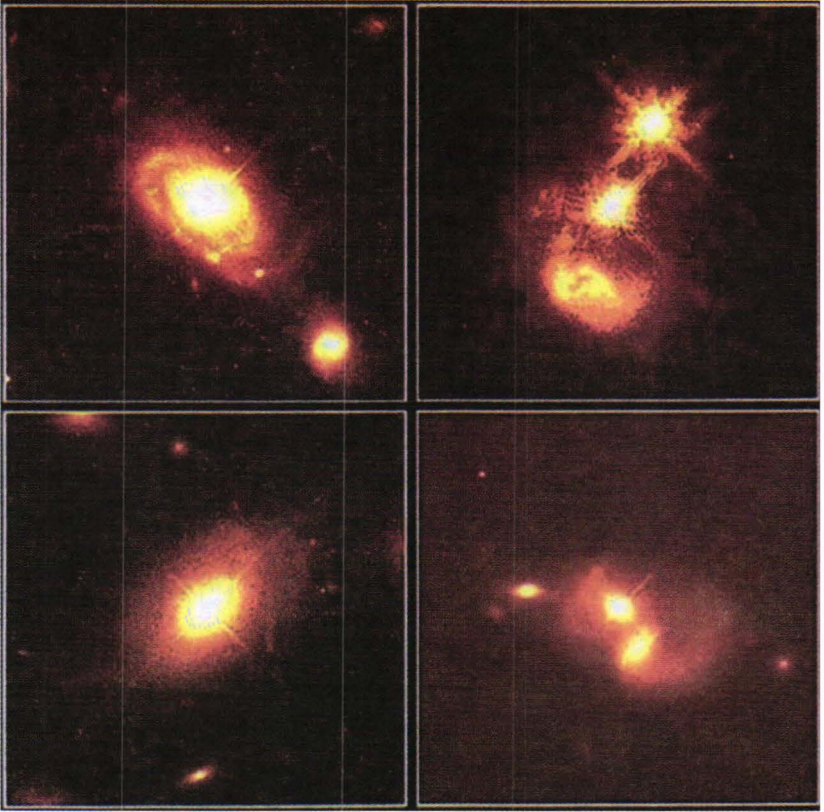
চিত্র-২২

–অতীতে প্রতিটি যুগেই মানব সমাজের একাংশ প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছে 'কুরআন'কে বিভিন্ন বিষয়ে। এর একটি অন্যতম বিষয় ছিল 'জাহান্নাম' সম্পর্কে। তারা বলতো– 'কুরআন যেভাবে প্রচণ্ড তাপ ও দগ্ধ করার তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন 'জাহান্নাম'-এর কথা বলছে, বাস্তবে কি কখনো সেরকম অগ্নিদুর্গ তৈরী করা সম্ভব?" এতো শুধু পূর্বের লোকদের থেকে চলে আসা ধারাবাহিক অবাস্তব কথা-বার্তা। এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না।'

'কোয়াসার' আবিষ্কারের পর তারা এখন নির্বাক। তারা এখন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। আল্লাহ্ বলেছিলেন তাদের "তোমরা তাড়াহুড়া করো না, আমি তোমাদের শীঘ্রই নিদর্শন দেখাবো।" সত্যিই 'কোয়াসার' আবিষ্কার অবিশ্বাস্য 'জাহান্নাম'-এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন বৈ-কিছু নয়। প্রকৃত জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।

বিজ্ঞান

প্রায় ১৪০০ বছর পর বড়ই আশ্চর্য করার মতো বর্তমান বিজ্ঞান কুরআনের বর্ণনানুযায়ী মহাকাশে যে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কার করেছে, তার নাম তারা দিয়েছে- 'কোয়াসার' (Quasar), যার মূল হলো– (QSRS) অর্থাৎ Quasi-Stelar-Radio Source, যে Radio Source-এর উৎপত্তি হচ্ছে- প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন লেলিহান অগ্নিশিখা বা Fire flare (Huge sparks) থেকে। তাহলে যে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মানুষ কয়েক শতাব্দি থেকে বিভ্রান্তির পথে বহুদূর এগিয়ে গেছে, সেই বিজ্ঞানের এই রূঢ় বাস্তব উদ্‌ঘাটন, আবিষ্কার এবং ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গিতে একই কারণে একই নামে চিহ্নিত করাকে মানুষ কোন যুক্তিতে তা অস্বীকার করতে পারে? কুরআনে বর্ণিত 'কসর' (QSR) এবং বিজ্ঞানে প্রদর্শিত ও প্রমাণিত (QSR)-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কী? উভয় বর্ণনা এক ও অভিন্ন নয় কি? এতে প্রমাণিত হচ্ছে– 'আল্লাহ্ যেমন মহাসত্য, তেমনি 'কুরআন'ও মহাসত্য একখানা আসমানী কিতাব।

'ধ্বংস সাধন এক ও অভিন্ন'

আল্-কুরআন

"যারা আমার বাণীকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি আগুনে দগ্ধ করবোই, যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতেই থাকে।" (৪ ঃ ৫৬)

উল্লিখিত আয়াত দু'টিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাহান্নামের প্রচণ্ড অগ্নিদুর্গে অপরাধীগণ নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদের গায়ের চামড়া অত্যধিক তাপে জ্বলে-পুড়ে ঝরে পড়বে। তাদের চেহারা আগুনের তীব্রতায়, তেজস্ক্রিয়তার বিকিরণে ঝল্‌সে গিয়ে বীভৎস আকার ধারণ করবে। মানুষের জন্য এ হবে এক বড় ধরনের বিপদ, যার সাথে অন্য কোনো ধরনের বিপদের তুলনাই হতে পারে না।

"তুমি কি জান ওটা কী? ওটা হচ্ছে আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদুর্গ (জাহান্নাম), যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, নিশ্চয় বিরাট বিরাট লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।" (১০৪ : ৫-৯)

চিত্র-২৩

–ছবিতে সূর্য থেকে সৃষ্টি হওয়া লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে, আল কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা অপরাধীদের কঠিন শাস্তি দেয়া প্রসঙ্গে জাহান্নাম নামক অগ্নিকুণ্ডের যে ভয়াবহতা, তীব্রতা ও তাতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির শারীরিক যে কঠিন ও বিপর্যস্ত অবস্থা তুলে ধরেছেন, ঠিক একইভাবে বর্তমান বিজ্ঞানীগণও 'কোয়াসার'-এর আবিষ্কারের পর তার আকার, আকৃতি, আভ্যন্তরীণ অগ্নিময় ভয়ঙ্কর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ফলে প্রমাণিত হয়েছে– পরকালে 'জাহান্নাম' অবশ্যই সত্য ঘটনা। এটা কোন কল্পনা বা অনুমান নির্ভর কিছু নয়। যারা বাঁচতে চান তারা সঠিক পথ দেখুন।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে 'কোয়াসার' (Quasar)-এর অভ্যন্তরে Packed করা মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র 'Fusion' (বিগলন) পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন থেকে Highest energetic radiation তথা Gamma-ray- উৎপন্ন হয়ে চতুর্দিকে লক্ষ কোটি মাইল ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে, যার সংস্পর্শে প্রাণীদেহের কোষ মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ফলে দেখা গেলো কোয়াসার এবং জাহান্নাম-এ বর্ণিত উভয় স্থানের ধ্বংস সাধন ব্যবস্থা ও ক্ষমতা এক ও অভিন্ন। প্রমাণিত হচ্ছে কুরআনের বর্ণনা পুরোপুরি একশত ভাগই সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান 'পুলসিরাত'কে মেনে নিয়েছে

আল-কুরআন

"নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে একটি পরিষ্কার ময়দানে পরিণত করবো।" (১৮ ঃ ৮)

"সেদিন যমীনকে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ যমীনে পরিণত করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে ঐ আকাশকেও, আর সবাই এক জবরদস্ত আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। (১৪ ঃ ৪৮)

"ঐ দিন জাহান্নামকে নিকটে আনা হবে।" (৮৯ ঃ ২৩)

"জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপ্ত করা হবে।" (৮১ ঃ ১২)

"এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে।" (৮১ ঃ ১৩)

"তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (১৯ ঃ ৭১)

"আর যারা স্বীয় 'রব'কে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে চালিত করা হবে।" (৩৯ ঃ ৭৩)

"অবিশ্বাসীদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে (এবং পরিশেষে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে)।" (৩৯ : ৭১)
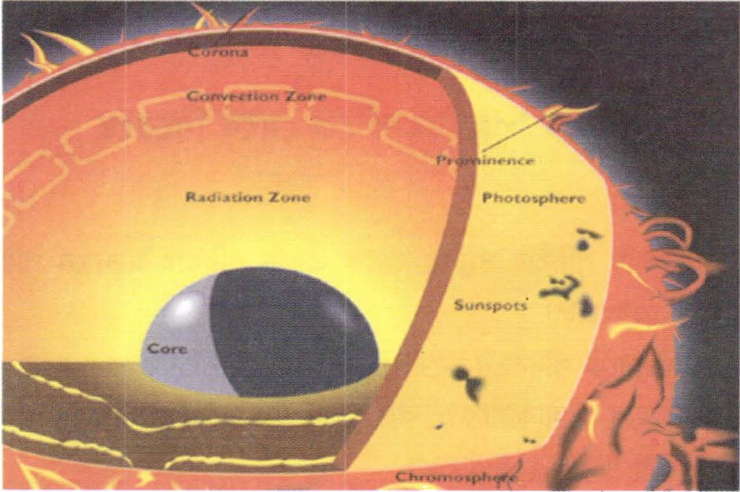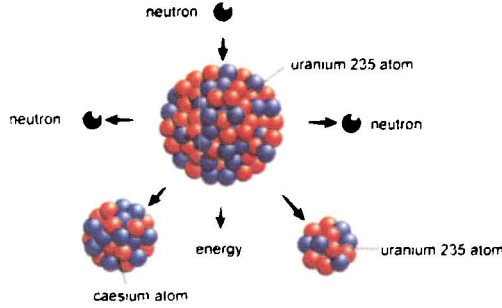
চিত্র-২৪

–আমাদের জানা মতে 'আনবিক বোমার' বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বিগলন (Fusion) পদ্ধতিতে। এতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে ধারণাতীত তাপ ও তেজস্ক্রিয়তার উৎপত্তি ঘটে এবং পারিপার্শ্বিক সমগ্র পরিবেশকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে স্থায়ী ধ্বংসে নিমজ্জিত করে। নক্ষত্রের ভেতরও সেই 'বিগলন' পদ্ধতিতেই প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। 'কোয়াসার'-এর ভেতরও একই পদ্ধতিতে একইভাবে প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর শক্তির আবির্ভাব ঘটছে।

সুতরাং জাহান্নামেও সেই একই পদ্ধতিতে Highest energetic radiation অর্থাৎ সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হয়ে অপরাধী মানুষগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গলিয়ে বার বার ধ্বংস করতে থাকবে। এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান আজ হাতে কলমে তা প্রমাণ করেছে। সাবধান হওয়ার জন্য কেউ আছে কী?

"অবিশ্বাসীদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে।" (৩৯ : ৭১)

"মুমিনদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে, তারা বলবে– 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো এবং আমাদের ক্ষমা করো, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৬৬ : ৮)

"সেদিন তুমি দেখবে মুমিন নর-নারীগণকে তাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি (আলো) প্রধাবিত হবে। বলা হবে আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য।" (৫৭ : ১২)

"সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করো। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি।" (৫৭ : ১৩)

"মুনফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে, 'হ্যাঁ' কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহ্‌র হুকুম না আসা পর্যন্ত, আর মহাপ্রতারক শয়তান তোমাদের প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।" (৫৭ : ১৪)

"আজ তোমাদের নিকট থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরি করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্য স্থান, কতো নিকৃষ্ট এই পরিণাম!" (৫৭ : ১৭)

পবিত্র বাণীসমূহ থেকে আমাদের সামনে পরকালের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, যার শুরু হচ্ছে শেষ বিচারের মাঠ থেকে,

পরবর্তীতে শেষ হয়েছে, 'পুলসিরাত'-এর উপর দিয়ে জান্নাতে এবং জাহান্নামে গিয়ে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এখানে উল্লেখ করেছেন যে বিচারের পূর্বে, এমনকি সকল মানুষকে পুনর্জীবিত করার পূর্বে এ পৃথিবীকে নতুন করে ভিন্নরূপে-ভিন্ন গঠনে তৈরী করবেন, যা খোলা ময়দানে পরিণত হবে। কোথাও উঁচু-নিচু থাকবে না। সব সমান হয়ে যাবে। জাহান্নামকে হাশরের মাঠ নামক নতুন সৃষ্ট পৃথিবীর (ভূমির) সন্নিকটবর্তী করা হবে। জান্নাতকেও নিকটবর্তী করা হবে। উভয়কে এতো নিকটে আনা হবে যাতে করে বিচারের মাঠ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় এবং বুঝা যায় বা চেনা যায়। হাশরের মাঠ, জান্নাত এবং জাহান্নাম এই তিনটিকেও এমনভাবে পরস্পরের নিকটবর্তী করে অবস্থান করানো হবে, যাতে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, হাশরের মাঠের পাশেই থাকবে প্রথমে জাহান্নাম, যার উপর দিয়ে নির্মিত হবে 'পুলসিরাত', এ 'পুলসিরাত'-এর অপর প্রান্ত সংযুক্ত থাকবে জাহান্নামের অপর পাড়ে ভিড়ানো জান্নাতের সাথে। অর্থাৎ পুলসিরাত থাকবে জাহান্নামের উপরে আর জাহান্নামের এক পার্শ্বে থাকবে হাশরের মাঠ এবং অপর পার্শ্বে থাকবে জান্নাত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেদিন তাঁর বান্দাদের সঠিকভাবে বিচার-ফায়সালা করে দেয়ার পর পুরস্কারপ্রাপ্তদেরকে জান্নাতে এবং শাস্তিপ্রাপ্তদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়ার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন। ফেরেশতাগণ সাথে সাথে জান্নাতিদেরকে ইস্তেকবাল জানিয়ে স্বসম্মানে পুলসিরাতের উপর দিয়ে আলোর ঝলকের ন্যায় দ্রুতগতিতে পার করে 'জান্নাতে' পৌঁছে দেবেন। তাদের এই দ্রুত গতিসম্পন্ন পথের সামনে এবং ডান পার্শ্বে গাইড হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা থাকবে, যা তাদের সাথে সাথে এগিয়ে যেতে থাকবে। বিচারের মাঠ থেকে জান্নাত পর্যন্ত এ দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে জান্নাতিগণ কোনো প্রকার কষ্টই অনুভব করবে না অথবা পুলসিরাতের নিচে যে জাহান্নাম নামক অগ্নিকুণ্ড

থাকবে তারও কোন ছোঁয়াই পাবে না, বরং সম্মানিত মেহমান হিসেবে সন্তোষজনক পরিবেশের ভেতর দিয়েই দ্রুত বেগে (চোখের পলকে) বিচারের মাঠ থেকে সকল প্রকার নেয়ামতে ভরা জান্নাতে অনায়াসে পৌঁছে যাবে।

অপরদিকে ফেরেশতারা শাস্তি ঘোষিত অপরাধীদেরকে জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করার জন্য ধাক্কা মেরে মেরে পুলসিরাতের উপরে উঠাবে এবং সামনের দিকে হাঁটতে বাধ্য করবে। কিন্তু জান্নাতিরা পুলসিরাতের ডানদিকের বিরাট অংশ আলো ঝলমলরত অবস্থায় ব্যবহার করায় পুলসিরাতের বাকী বামদিকের স্বল্প পরিসর বিশিষ্ট সরু-চিকন অন্ধকারময় পথ জাহান্নামীরা ব্যবহার করতে বাধ্য হবে। ফলে অপরাধীরা পুলসিরাতের উপরে উঠে অন্ধকার ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ পরিবেশে সামনের দিকে চলার পথ দেখতে পাবে না। অন্ধকারে দুর্ভাগাবস্থায় হাতড়িয়ে মরবে। আলো দিয়ে সাহায্য করার জন্য চিৎকার করে জান্নাতিদেরকে ডাকতে থাকবে। কিন্তু হতভাগ্যরা সে আলোর সাহায্যও পাবে না, তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে বলা হবে 'আজ এ আলোর অধিকারী তোমরা হতে পারো না, বরং পেছনে গিয়ে আলোর ব্যবস্থা করে আসো।' হতভাগ্যরা সে অবস্থায় আর পেছনের দিকেও যেতে পারবে না; কারণ ফেরেশতারা পেছন থেকে অনবরত সবাইকে ঠেলে ঠেলে, ধাক্কা মেরে মেরে অন্ধকার এই আযাবের পথে চালিত করে এগিয়ে আসতে থাকবে।

এ করুণ অবস্থায় মহান আল্লাহ্ পুলসিরাতের উপর জান্নাতি এবং জাহান্নামীদের মাঝখানে একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেবেন; যাতে করে জাহান্নামীরা সামনের দিকে আর অগ্রসর হতে না পারে। এ দেয়ালের বাইরের দিকে থাকবে জাহান্নামের ঐ ভয়াবহ আযাবের পরিবেশ এবং ভেতরের দিকে থাকবে পুরস্কারপ্রাপ্তদের জন্য তৈরী অকল্পনীয় নেয়ামতে ভরা জান্নাতি পরিবেশ। এই চরম সঙ্কটাপূর্ণ পরিস্থিতিতে পুলসিরাতের উপর থেকে অপরাধীরা নিচের দিকে জাহান্নাম নামক অগ্নিকুণ্ড এবং তার

অকল্পনীয় ভয়ঙ্কর আযাবও প্রত্যক্ষ করতে থাকবে, ভয়ে পাগলপারা হয়ে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হবে না। পরিশেষে দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা অপরাধীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদাকৃত শাস্তির স্থান- 'প্রচণ্ড অগ্নিময় জাহান্নাম'-এ নিক্ষেপ করবে। অতঃপর ঐ অগ্নিময় শাস্তির স্থান জাহান্নাম থেকে মানুষ আর নিজকে বাঁচানোর কোনো পথই পাবে না। এভাবে এক প্রচণ্ড শাস্তিময় অগ্নিকুণ্ডে, আযাবপূর্ণ, নিকৃষ্টতম এক দীর্ঘ জীবন লাভ করবে অপরাধীরা।

বিজ্ঞান

পূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, 'কুরআন'-এ জাহান্নামের যে চিত্র-চরিত্র এবং আকৃতি আঁকা হয়েছে, অনেকটা সেই রকম চিত্র-চরিত্রের মতো নিদর্শনসহ মহাকাশীয় বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন বর্তমান বিজ্ঞানীগণ, যার নামকরণ করা হয়েছে 'কোয়াসার' (Quasar)। ১৯৬৩ সালে আবিষ্কৃত সর্বপ্রথম 'কোয়াসার'- 3C 273 আমাদের এ পৃথিবী থেকে প্রায় ১.৮ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। এর মূল দুর্গের আয়তন যদিও মাত্র এক বা একাধিক সৌরজগতের সমান; কিন্তু এর Jet-র চিত্র-চরিত্রের সাথে মূল কোয়াসারের চিত্র-চরিত্রের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা আছে তা হলো তাপীয় অবস্থার পার্থক্য, যা Jet- এর বিভিন্ন স্থানে বিভি-ন্ন রকম প্রদর্শন করছে।

অনুরূপভাবে আবিষ্কৃত 'কোয়াসার 'Markarian-205' ও তার বিরাট জেট (Jet) দিয়ে 'গ্যালাক্সি NGC 4319- এর সাথে সেতু বা ব্রীজ (Bridge) তৈরী করেছে। বিজ্ঞানীগণ Red shift দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে গ্যালক্সিটির Red shift খুবই নগণ্য; যা আমাদের পৃথিবী থেকে মাত্র ৬৯ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব নির্দেশ করে। অপরপক্ষে কোয়াসারটি Red shift- এ বড় ধরনের পার্থক্য সূচিত করে। হিসাব করে দেখা যায় যে কোয়াসারটি প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে তার অবস্থান নির্দেশ

"কিয়ামাতের দিন 'জাহান্নাম'কে নিকটে আনা হবে।" (৮৯ : ১২)
"যখন জাহান্নাম-এর অগ্নি বাড়ানো হবে।" (৮১ : ১২)
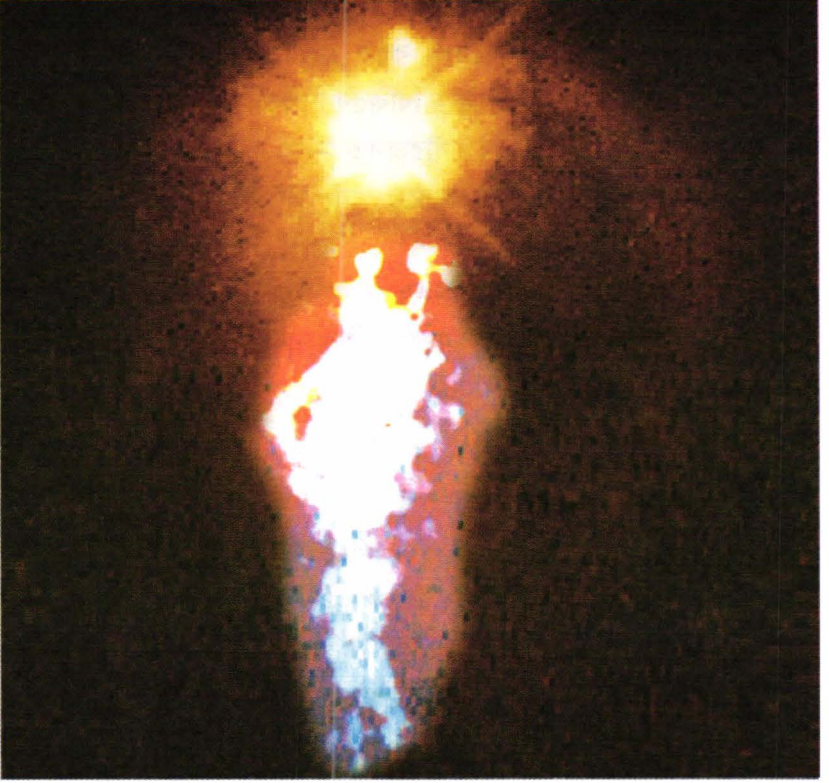
চিত্র-২৫

–উপরের ছবিতে একটি জ্বলন্ত প্রচণ্ড তাপ, আলো ও তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন 'কোয়াসার-3c-275' কে দেখা যাচ্ছে, এরও আছে কেন্দ্র বা 'নিউক্লিয়াস' যেখানে সর্বোচ্চ তাপ ও তেজস্ক্রিয়তা বিরাজমান। বাকী অন্যান্য অংশে অপেক্ষাকৃত কম তাপ ও তেজস্ক্রিয়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিষয়টি একেবারে হুবহু জাহান্নামের বর্ণনার মতই কোথাও আগুনের তাপ বেশি, কোথাও কম, কোথাও আবার ঠাণ্ডা। এক কথায় কোয়াসার ও জাহান্নামের মধ্যে যেন কোন পার্থক্য নেই।

'কোয়াসার 3c-275' ১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং ১৪০০ বছর পর বিজ্ঞানই প্রমাণ করলো 'জাহান্নাম' বাস্তব, একটি চির সত্য বিষয়।

করছে। তাহলে কোয়াসারের Jet টি যে ন্যূনতমপক্ষে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ লম্বা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই অবস্থায় আরও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে 'কোয়াসার মার্কারিয়ান-২০৫'-এর আবিষ্কার একেবারে পরিষ্কারভাবেই নির্দেশ করে যে, মহাকাশীয় এই অদ্ভুত-আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গতকারী 'কোয়াসার' নামক বস্তুটি নক্ষত্র সমষ্টি ও তাদের সৌরজগত নিয়ে গঠিত গ্যালাক্সির সাথে মহাকাশে সেতু বা ব্রীজ গঠন করেছে এবং তা সম্ভব। প্রয়োজনে জেট বিশিষ্ট কোয়াসার যে কোনো গ্যালাক্সি বা বিশেষ কোনো গ্রহের ভূ-ভাগের সাথেও জেট দিয়ে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে, তা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় বরং খুবই সম্ভব। বাস্তবতার আলোকে আজ একথা প্রমাণিত ও স্বীকৃত।

বিজ্ঞানের উক্ত আবিষ্কার এবং তার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে যে সত্যটি ভেসে ওঠে, তা হলো– এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র বাণীতে ১৪০০ বছর পূর্বে মানুষ পরকালে শেষ বিচারের মাঠ থেকে জান্নাত-জাহান্নামে পৌঁছার যে বাস্তব ছবি অগ্রিম এঁকেছেন, তারই কিছু নিদর্শন-নমুনা বর্তমানে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যদিয়ে মানবমণ্ডলীর সামনে অবিকল ছবি তুলে ধরছেন। তাই 'কোয়াসার' যদি অস্বীকার করা না যায় তাহলে জাহান্নাম অস্বীকার করা হবে কোন্ যুক্তিতে? 'গ্যালাক্সি NGC 4319, অগ্নিদুর্গ 'কোয়াসার মার্কারিয়ান-২০৫' এর সাথে এক প্রান্তে Jet দিয়ে যে সম্পর্ক স্থাপন করেছে– তা যদি স্বীকার করতে বিজ্ঞান জগতের এবং তার অনুসারীদের আপত্তি না থাকে, তাহলে জাহান্নামের এক প্রান্তে বিচারের মাঠ এবং অপর প্রান্তে জান্নাত সংযোগ স্থাপন করে পরকালে পুলসিরাত নির্মিত হতে পারে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃত একটি ওয়াদা, তা অসম্ভব-অবাস্তব হয় কিভাবে? আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান সত্তা নন্ কী? সুতরাং বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত বাস্তব আবিষ্কারগুলো পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের পরকাল বিষয়ক তথ্যগুলোকে যে মহাসত্যতার আলোকে মানব

"তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) লুকায়িত বা অদৃশ্য বস্তুসমূহকে (বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে) প্রকাশিত করেন।" (২৭ : ২৫)
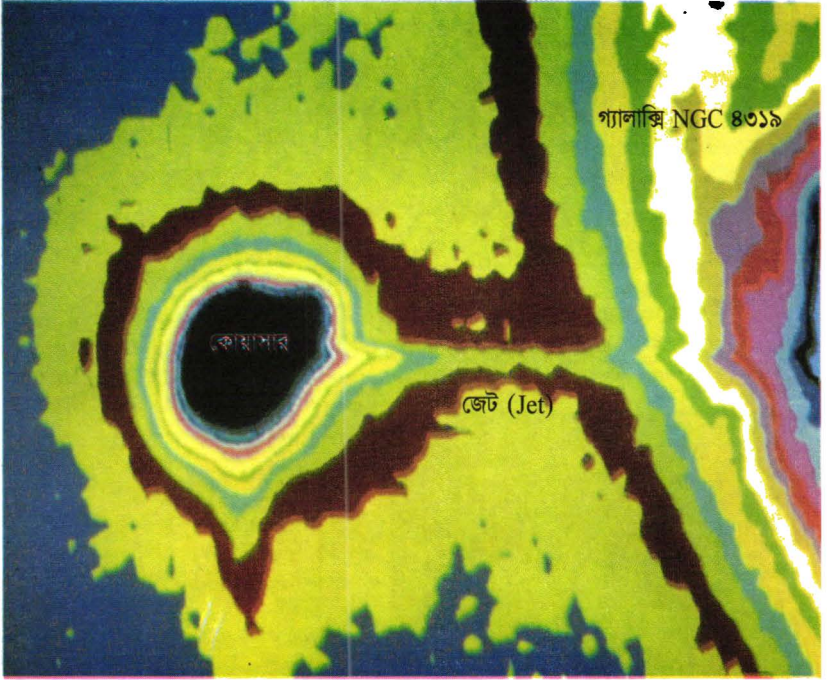
চিত্র-২৬ (ক)

– বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বাস্তব সত্য ছবিতে দেখতে পাচ্ছি, আকাশে একটি 'কোয়াসার Markarian-205' (যা জাহান্নামের নিদর্শন) একটি 'গ্যালাক্সি NGC 4319' (যার মধ্যে অসংখ্য সৃষ্ট জগত বিদ্যমান)-এর সাথে তার Jet বা লম্বা দেহ দিয়ে সেতু বা ব্রীজ তৈরী করে সংযোগ সাধন করেছে। এ অবস্থায় তারা আবার মহাশূন্যে ভাসমান ও চলমান থেকে পরিভ্রমণও বজায় রেখেছে। উভয়ের মাঝখানে ব্যবধান প্রায় ৮০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ, কল্পনা করতে পারেন– আবিষ্কারটি পরকালীন পুলসিরাত, জাহান্নাম, বিচারের মাঠ ও জান্নাত-এর মধ্যে সংযোগের মাধ্যমে কিভাবে তৈরী হবে তার একটি অগ্রিম নিদর্শন আল্লাহ্ দেখিয়ে দিলেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে। অপেক্ষা করুন শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানই আল্লাহকে পরিচয় করিয়ে দেবে, ইনশায়াল্লাহ।

"তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (পুলসিরাত) অতিক্রম করবে। এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (১৯ : ৭১)
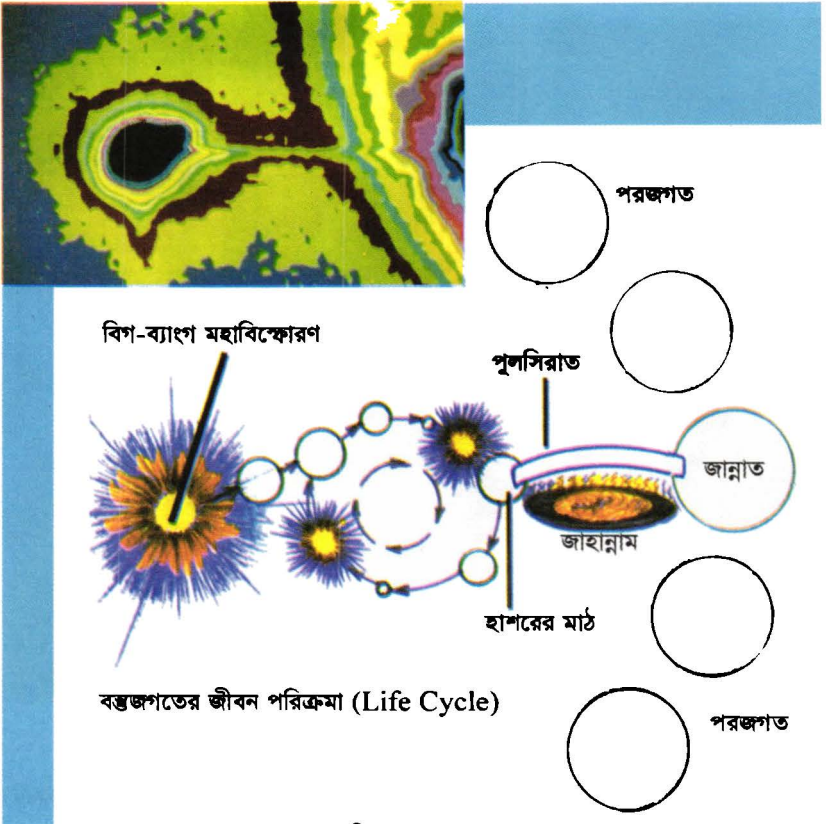
চিত্র-২৬ (খ)

–বিজ্ঞানের অবদানে আমরা সবাই জানি যে, সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি ও তার ভেতরের সকল মহাজাগতিক বস্তুও ভাসমান ও পরিভ্রমণে রত। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল সবই ভাসমান মহাশূন্যে। এটা আল্লাহর এক মহাকীর্তি বিশেষ। প্রায় ১৪০০ বছর থেকেই মানব জাতি কুরআনের মাধ্যমে অবহিত হয়েছে যে, পরকালে পুলসিরাত-এর এক প্রান্ত থাকবে বিচারের মাঠের সাথে আর অপর প্রান্ত থাকবে জান্নাতের সাথে। যাতে করে জান্নাতিরা দ্রুত পুলসিরাত ব্যবহার করে জান্নাতে পৌছুতে পারে। পুলসিরাত-এর নিচে থাকবে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড 'জাহান্নাম'। ঠিক এ ব্যবস্থার নিদর্শনই বর্তমান বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে– কোয়াসারের মাধ্যমে।

সমাজের জ্ঞানীদের সম্মুখে উপস্থাপন করে চলছে তা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন গড়ারই তাকিদ হচ্ছে– বর্তমান সময়ের দাবি। বিজ্ঞানী সমাজ নিজ স্বার্থেই এগিয়ে আসবেন কী?

'মহাভয়ঙ্কর অগ্নি লেলিহান শিখা (Flare)'

আল-কুরআন

"তুমি কি জান ওটা কি, যা টুকরো টুকরো করে দেবে? তা হচ্ছে আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদুর্গ (জাহান্নাম), যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। নিশ্চয়ই আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে (যা তাদেরকে ঢেকে রাখবে)।" (১০৪ ঃ ৫-৯)

আল-কুরআনের উল্লিখিত বক্তব্যের সঠিক মর্মকথা বিজ্ঞান তার পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশের পূর্বে মানব সম্প্রদায় এত জ্ঞানপূর্ণভাবে আর কখনও অবহিত হতে পারেনি। মানুষ ভেবে ভেবে বোধগম্যের সীমানায় জাহান্নামের এই লেলিহান শিখাকে কখনও যথাযথভাবে পৌঁছাতে পারেনি। যদিও বুঝতে সক্ষম হচ্ছিল যে তার প্রচণ্ডতা এতো ব্যাপক যা কলিজা পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাই ভস্ম করে দেবে। চলুন! বিজ্ঞান কি বলে দেখা যাক।

বিজ্ঞান

বর্তমান বিজ্ঞান নিখুঁত এবং বাস্তবভাবে সেই আয়াতের বক্তব্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। বিজ্ঞান তার সর্বশেষ পর্যবেক্ষণে প্রকাশ করেছে যে, প্রায় প্রতিটি নক্ষত্র (সূর্য) দেহ থেকে অসংখ্য লেলিহান শিখা (Flare) সৃষ্টি হয়ে থাকে। উক্ত লেলিহান শিখা গড়ে প্রায় ৪০০,০০০ (চার লক্ষ) কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা এবং প্রায় ৮,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে। এ লেলিহান শিখার তাপীয় অবস্থা হচ্ছে প্রায় ১০,০০০°c থেকে

"তুমি কি জানো ওটা কী? ওটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদুর্গ (জাহান্নাম), যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। নিশ্চয়ই আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে (যা তাদেরকে ঢেকে দেবে)।" (১০৪ : ৫-৯)

চিত্র-২৭

–'আল-কুরআন' থেকে প্রথমে আমরা জানতে পেরেছিলাম পরকালে অপরাধের শাস্তির জন্য যে জাহান্নাম অগ্নিদুর্গরূপে আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করে রেখেছেন, তার আগুনের লেলিহান শিখা এত বিশাল হবে যে, কোটি কোটি মানুষকে পরিবেষ্টন করে আগুনের জ্বলন্ত শাস্তি দেয়ার জন্য একটি লেলিহান শিখাই যথেষ্ট। কিন্তু সমাজের অনেকেই তখন এ তথ্যটি মেনে নিতে পারেনি। অথচ এখন চরম বাস্তবতার আলোকে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, শুধুমাত্র একটি নক্ষত্রের একটি লেলিহান শিখাই লম্বায় প্রায় চার লক্ষ মাইল ও চওড়ায় প্রায় আট হাজার মাইল অর্থাৎ কি না মানুষ তো পরের কথা, আমাদের এ পৃথিবীটাও সম্পূর্ণরূপে ঐ লেলিহান শিখার মধ্যে হারিয়ে যাবে। কত ভয়ানক এক ব্যাপার, ভেবেছেন কী? আর কোটি কোটি নক্ষত্র দিয়ে পূর্ণ জাহান্নামের অবস্থা ব্যাখ্যা না করাই শ্রেয়।

১০০০,০০০°c (এক মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) পর্যন্ত। যার ভয়াবহ ধ্বংস সাধন ক্ষমতা মানুষের কল্পনারও বাইরে।

আপনি হয়তো জানেন, আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮০০০ মাইল। তাই মানুষ তো পরের কথা আমাদের এই বিরাট পৃথিবীর প্রায় সম্পূর্ণটাই নক্ষত্রের (সূর্যের) লেলিহান শিখার মধ্যে ডুবে থাকবে, ঐ লেলিহান শিখার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। একটি মাত্র নক্ষত্রের একটি লেলিহান শিখাই যেখানে আমাদের গোটা পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত অবস্থায় ঢেকে রাখতে যথেষ্ট, সেখানে লক্ষ কোটি নক্ষত্রের অগ্নিকুণ্ডে (জাহান্নামে) অপরাধীদেরকে আগুনের সৃষ্ট লেলিহান শিখা দিয়ে পরিবেষ্টন করে রাখা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে কোন ব্যাপারই নয়। বর্তমান বিজ্ঞানই তো সেই বাস্তবতার সনদ জ্ঞানীদের চোখে আঙ্গুল রেখে দেখিয়ে দিচ্ছে!

তাই প্রশ্ন জাগে 'কুরআন'-এ বর্ণিত অগ্নিদুর্গকে (জাহান্নামকে) যারা এমনটি হতে পারে না, এ ধরনের অগ্নিদুর্গের সৃষ্টি অসম্ভব-অবাস্তব, এ এক উদ্ভট মস্তিষ্কের কল্প-কাহিনী, পূর্ব থেকে চলে আসা গল্পের ধারাবাহিকতা মাত্র ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল, তারা কি এখনও মহাসত্যের দিকে ধাবিত হবে না?

জাহান্নামের নমুনা ও নিদর্শনমূলক আবিষ্কৃত এই 'কোয়াসার' (Quasar) সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনাকে নিছক ধর্মীয় আলোচনা বলে এড়িয়ে যাওয়া আর উচিত হবে না।

'জাহান্নাম-এর জ্বালানী হচ্ছে পাথর ইউরেনিয়াম'

আল-কুরআন

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর (মহাবিশ্বের) সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (২১ ঃ ৪)

"তারা বলে, সে তার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাদের নিকট কোনো নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? (২০ ঃ ১৩৩)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা সমস্তই প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু ঐসব বিষয়ের প্রতি তারা উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

"সে আগুনকে ভয় করো, 'মানুষ' এবং 'পাথর' হবে যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।" (২ ঃ ২৪)

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

"এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

"এগুলোই প্রমাণ যে 'আল্লাহ্' সত্য। (৩১ ঃ ৩০)

"তারা কি সূক্ষ্ম সতর্কতার সাথে কুরআনকে অনুধাবন করে না?" (৪ ঃ ৮২)

"আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো।" (২০ ঃ ১২৪)

"সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম?" (২০ ঃ ১২৫)

"তিনি বলবেন, এরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে।" (২০ ঃ ১২৬)

"এভাবেই আমি প্রতিফল দিই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।" (২০ ঃ ১২৭)

"বলো, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা করো, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ অবলম্বন করেছে? (২০ ঃ ১৩৫)

'কুরআনের' উত্থাপিত আয়াতসমূহের মূল কথা হলো– সকল কিছুর স্রষ্টা, মালিক, প্রভু একমাত্র 'আল্লাহ্ তা'আলা'। তাঁর ব্যাপক, বিশাল, সীমা পরিসীমাহীন শক্তি-ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানের কারণে মহাবিশ্বের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কণিকা হতে বৃহৎ থেকে বৃহৎ সকল কিছুর সমস্ত কথা, সমস্ত গোপন রহস্য ও পরিণতি সবই তিনি অবগত আছেন। তিনি একই সাথে সকল কিছুকে দর্শন করেন এবং সকল বিষয়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সাথে তাঁর সামনে বর্তমান, সমস্ত কিছুই তাঁর নখ-দর্পণে সমুপস্থিত।

এমন একজন অকল্পনীয় মহান সত্তার উপস্থিতির বাস্তব প্রমাণের পরও অবিশ্বাসী সম্প্রদায় দাবি তুলছে– কেন নতুন করে তাদের সামনে এক ও একক স্রষ্টার নিদর্শন পেশ করা হচ্ছে না? অথচ তারা যদি সত্যিই, 'সত্যের' সৈনিক হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ব থেকে চলে আসা অসংখ্য নিদর্শন দেখেও কেন উদাসীনতা প্রদর্শন করছে? পূর্বের নিদর্শনগুলোকে যারা মর্যাদা দিতে জানে না, তারা পরবর্তী নতুন-নতুন নিদর্শনগুলোকে কেন গুরুত্ব দিতে যাবে? নিষ্ঠাবান জ্ঞানীদের জন্য পূর্ব থেকে চলে আসা নিদর্শনসমূহই 'বিশ্বাসী' হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

যারা মূলতই অপরাধী এবং নিরপেক্ষ জ্ঞানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সত্যের পক্ষ অবলম্বন করতে পারে না, তাদের সেই 'অগ্নিকুণ্ডকে' (জাহান্নামকে) ভয় করা দরকার, যার জ্বালানী হবে 'পাথর' (মাটির ঢেলা বা Solid fuel) এবং যার অভ্যন্তরে প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা (highest energetic radiation or Gamma-ray) সম্পন্ন দাউ দাউ করা অগ্নিতে জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী দাম্ভিক সম্প্রদায়ের সেই মানুষগুলোকে। ইতোমধ্যেই সেই অপ্রত্যাশিত ভয়ঙ্কর 'চুল্লী' (Reactor) সৃষ্টি করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মোটকথা মাটির 'ঢেলা' বা 'পাথর খণ্ড' নামক প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন পদার্থ হবে জাহান্নামের জ্বালানী আর অপরাধী মানুষগুলো তাতে জ্বলবে পরকালে। এখন পৃথিবী পৃষ্ঠে মজুদকৃত কঠিন অথচ সবচেয়ে বেশি তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন জ্বালানী সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মাপকাঠিতে আমরা পরখ করার চেষ্টা করবো 'আল-কুরআন' সত্য ও সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের ধারক ও বাহক কি না? চলুন তাহলে!

বিজ্ঞান

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে ক্রান্তিলগ্নে ২০শে জানুয়ারি ১৮৯৬ সালে Professor Henri Becquerel - 'Uranium compond' থেকে 'X-ray' নির্গত হওয়ার তথ্য আবিষ্কার করেন। এ ঘটনার দু'বছর পরই ১৮৯৮ সালে 'Curies Pierre Curie' এবং 'Marie Sklodowska' বিজ্ঞানী দম্পতি 'Polonium ও Radium' নামক ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন পদার্থ আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

উক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ, ইউরেনিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। 'ইউরেনিয়াম-২৩৮' এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১১২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে 'ভারী বস্তু' যা পূর্বে ব্যবহার অযোগ্য বিবেচনা করা হতো, কিন্তু Henri Becquerel কর্তৃক 'ইউরেনিয়াম' পদার্থ থেকে 'X-ray' নির্গত হওয়ার তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে গোটা বিশ্বব্যাপী 'ইউরেনিয়াম-২৩৮'-র প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয় ক্ষমতার খবর ছড়িয়ে পড়ায় বর্তমানে তার মূল্য অন্যান্য সকল প্রকার পদার্থের মূল্যকে হার মানিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীতে সর্বত্র প্রমাণিত হয় যে আবিষ্কৃত সকল প্রকার পদার্থ যেমন; গ্যাসীয় এবং কঠিন জ্বালানীসমূহের মধ্যে একমাত্র কঠিন 'ইউরেনিয়াম-২৩৮' কঠিন জ্বালানী যা সবচেয়ে বেশি তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন। বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করে দেখেছেন যে, এক টন কঠিন ইউরেনিয়ামের উৎপন্ন তেজস্ক্রিয়তা প্রায় ২৫,০০০ টন কাঠ পোড়ানোর তেজস্ক্রিয়তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। আবিষ্কৃত এই নতুন তথ্য সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজকে অনুপ্রাণিত করে তোলে যে এ 'ইউরেনিয়াম'কে কিভাবে বাস্তব কাজে লাগানো যায়।

ফলে ১৯৫৬ সালে ব্রিটেন সর্বপ্রথম এ কঠিন তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন 'ইউরেনিয়াম' (Solid uranium 238) কে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করে বিরাট অগ্রগতি সাধন করে এবং দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। বর্তমানে সর্বমোট প্রায় ২০০টি আনবিক

"মহাবিশ্বে অনেক নিদর্শন রয়েছে যা তারা সমস্তই প্রত্যক্ষ করে কিন্তু ঐসব বিষয়ের প্রতি তারা উদাসীন (মনোনিবেশ করে না) ।" (১২ : ১০৫)

চিত্র-২৮

–Professor Henri Becquerel ১৮৯৬ সালের ২০ জানুয়ারি ইউরেনিয়াম কম্পাউণ্ড থেকে 'X-ray' নির্গত হওয়ার তথ্য আবিষ্কার করেন। পরে এ বিষয়ে তিনি নোবেল' পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর এই আবিষ্কারে বিশ্বব্যাপী বর্তমানে 'ইউরেনিয়াম ২৩৮'-র মূল্য সকল প্রকার পদার্থের মূল্যকে ছাড়িয়ে গেছে। সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী ইউরেনিয়াম-এর ব্যবহার অনেক অনেক গুণ বেড়ে গেছে। স্বীকার করতেই হয় এ আবিষ্কার বিশ্বকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীকে প্রমাণিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী তাপ সৃষ্টিকারী দাহ্য বস্তু হচ্ছে– ইউরেনিয়াম-২৩৮। আল্লাহ জাহান্নামের জ্বালানী হিসেবে তাই ইউরেনিয়ামকে বাছাই করেছেন।

"তিনিই মানুষকে জ্ঞাত করেছেন, ইতোপূর্বে মানুষ যা জানতো না।" (৯৬ : ৫)

চিত্র-২৯

–ফ্রান্সের বিজ্ঞানী দম্পতি 'Curies Pierre Curie ও Marie Sklodowska ১৮৯৮ সালে ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) সম্পন্ন পদার্থ 'Polonium' ও 'Radium' আবিষ্কার করেন। উক্ত পদার্থ দু'টি ইউরেনিয়াম-এর সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ইউরেনিয়াম, পলেনিয়াম ও রেডিয়াম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত ভয়ঙ্কর ও ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয়তা নির্গত হতে থাকে। যে কারণে পারমানবিক বোমায় ও অন্যান্য পারমানবিক মারণাস্ত্রে এদের ব্যবহার বেশি হচ্ছে। উক্ত আবিষ্কার কুরী দম্পতিকেও নোবেল পুরস্কার এনে দেয়।

আল্লাহ তাই ইউরেনিয়ামকেই জাহান্নামের জ্বালানী হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন।

"মানুষের জন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত (আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে) প্রকাশ করে থাকি, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বুঝতে পারে।" (২৯ : ৪৩)

চিত্র-৩০

–'Marie Skalodowska' তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং পৃথিবীকে পারমানবিক শক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সভ্যতাকে বহুগুণে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে ল্যাবরেটরিতে প্রতিদিন কাজ করতে গিয়ে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে তারই আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) থেকে তিনি নিজকে রক্ষা করতে পারেননি। 'লিউকেমিয়া' নামক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। আনবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ লোক আজও আর্তনাদ করে ফিরছে। প্রমাণ হয়েছে তেজস্ক্রিয় শক্তি এক ভয়াবহ বিপদ মানব জাতির জন্য। এর হাত থেকে সবাই রক্ষা পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে (কোন কিছুকে অবজ্ঞা না করে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র কৃতিত্ব দর্শনের আশায়) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো দেখবে এক ও একক মহান স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল তুলনাবিহীন শত বিস্ময়ের বিস্ময়ে পরিপূর্ণ) ।" (১০ : ১০১)
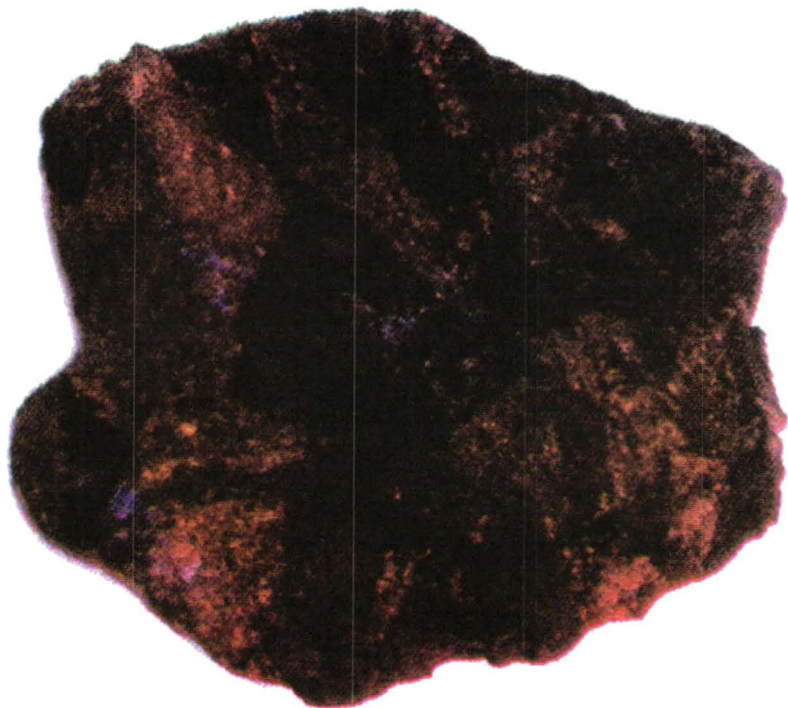
চিত্র-৩১

–মাত্র এক শতাব্দি আগেও সবচেয়ে ভারী 'পাথর খণ্ড' হিসেবে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতো যত্রতত্র 'ইউরেনিয়াম' । মানুষ অত ভারী বস্তু ব্যবহারের কোন প্রয়োজন আছে বলেও মনে করত না। কিন্তু ১৯০৩ সালে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ফ্রান্সের'পিরি-কুরী দম্পতি'-র মাধ্যমে এর গোপন থাকা তেজস্ক্রিয়তা নির্গমনের রহস্য উদ্‌ঘাটন হওয়ায় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায় । রাতারাতি এর মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে সর্বত্র তাক লাগিয়ে দেয় । স্রষ্টা হিসেবে এর সম্পূর্ণ কৃতিত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহর ।

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) লুকায়িত বস্তুকে (বস্তুর ধর্ম, মান, গুণাগুণ ও কার্যকারিতাকে) বা অদৃশ্য বস্তুকে (বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে) প্রকাশ করে থাকেন।" (২৭ : ২৫)
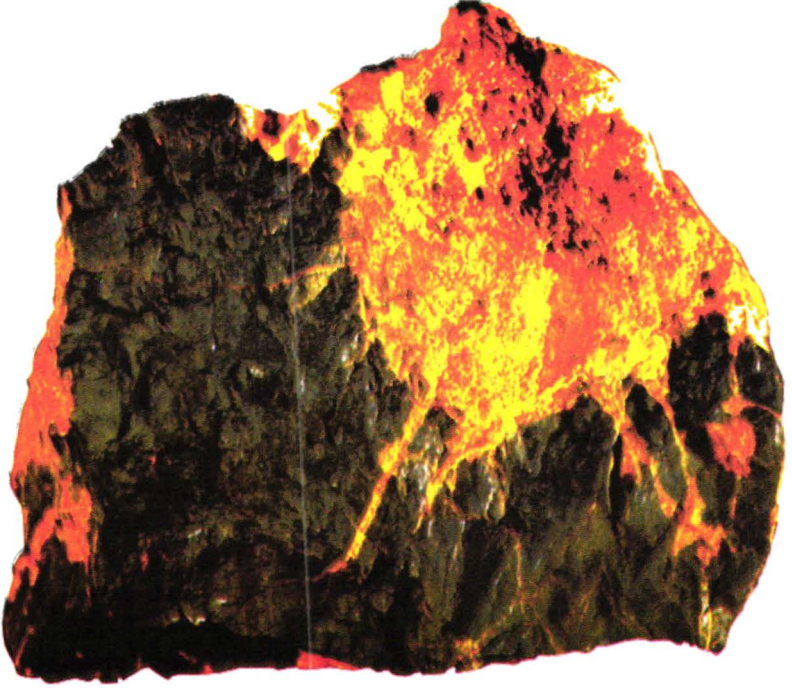
চিত্র-৩২

– দীর্ঘদিন পৃথিবীর যত্রতত্র 'ইউরেনিয়াম' পাথর খণ্ডরূপে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়ে থাকলেও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হওয়ায় মানুষ-এর পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে লুকায়িত ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা নির্গমনের কথা মোটেও জানতে পারেনি। আল্লাহর ইচ্ছায় যে মাত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে মানুষ এ বিস্ময়কর তথ্য অবহিত হলো, অমনি বিশ্বব্যাপী এর প্রচণ্ড ও ভয়ানক শক্তিকে ব্যবহারের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। পরবর্তীতে প্রমাণ হলো যে, বিশ্বে একমাত্র সর্বোচ্চ দাহ্য শক্তিসম্পন্ন পদার্থ হলো 'ইউরেনিয়াম'।

চুল্লী (Nuclear reactor) একা আমেরিকাতে চালু আছে, যা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী চালু 'Nuclear power' এর প্রায় 29.5%-এর সমান। আজকের দিনে শুধু বৃটেন কিংবা আমেরিকাতেই নয় বরং বিশ্বব্যাপী গড়ে উঠেছে প্রায় ৫০০টির মত Nuclear power station, যেখানে কঠিন 'ইউরেনিয়াম' (Solid Uranium) জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে তুলনামূলকভাবে অনেক অনেক কম খরচে বেশি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে এবং সভ্যতার ব্যাপক চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে।

শুধু বিদ্যুৎ খাতেই নয়, 'ইউরেনিয়াম'-এর এই বিস্ময়কর তেজস্ক্রিয় রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পর বর্তমানে বিদ্যুতের উন্নয়নের পাশাপাশি ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে পারমানবিক বোমায়, মিশাইলে ও Nuclear Submarine-এ এবং সৌরজগতের বাইরে প্রেরিত 'Space probe'-এ তা ব্যবহৃত হচ্ছে। 'লেসার বীম' (lesser beem) দিয়ে Medical science তার বর্তমানে চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল ব্যাপারেই আরো অগ্রগতি ঘটবে, তা অবস্থাদৃষ্টে অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

'কঠিন ইউরেনিয়াম' যা দেখতে একটি মাটির ঢেলা বা পাথর খণ্ড ছাড়া কিছু নয়, অথচ সকল প্রকার জ্বালানীর মধ্যে কল্পনাতীত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ব্যাপক পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা ধারণকারী বিস্ময়কর পদার্থ হিসেবে ইউরেনিয়াম প্রমাণিত হয়েছে এবং গোটা বিশ্বব্যাপী রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ এক বাস্তবভাবে প্রমাণিত সত্য ঘটনা। যা আজ আর অস্বীকার করা যাবে না।

বর্তমান বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ আবিষ্কার 'ইউরেনিয়াম' নামক একটি মাটির ঢেলা (পাথর) কে, যে পরিচয়ে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে এবং মানব সমাজও 'ইউরেনিয়াম'কে যে পরিচয়ে জানতে পেরেছে, তাতে কি একথা প্রমাণিত হয় না যে বিশ্বব্যাপী সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন জ্বালানী হচ্ছে– কঠিন 'ইউরেনিয়াম'? যদি তাই হয়,

"যিনি সৃষ্টি করেছেন (ইউরেনিয়াম-এর গঠন, শক্তি-ক্ষমতা, ভালো-মন্দ, ও কার্যকারিতা) তিনিই কি জানেন না? (আসলে তো একমাত্র তিনিই সব জানেন। তিনি জানেন বলেই তো নিজ থেকে Delayed Neutron-এর ব্যবস্থা এঁটে দিলেন তেজস্ক্রিয় মৌলের ভেতর, যাতে এবার মানুষ প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করে একে মানব কল্যাণে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে পারে, বস্তুত তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।" (৬৭ : ১৪)
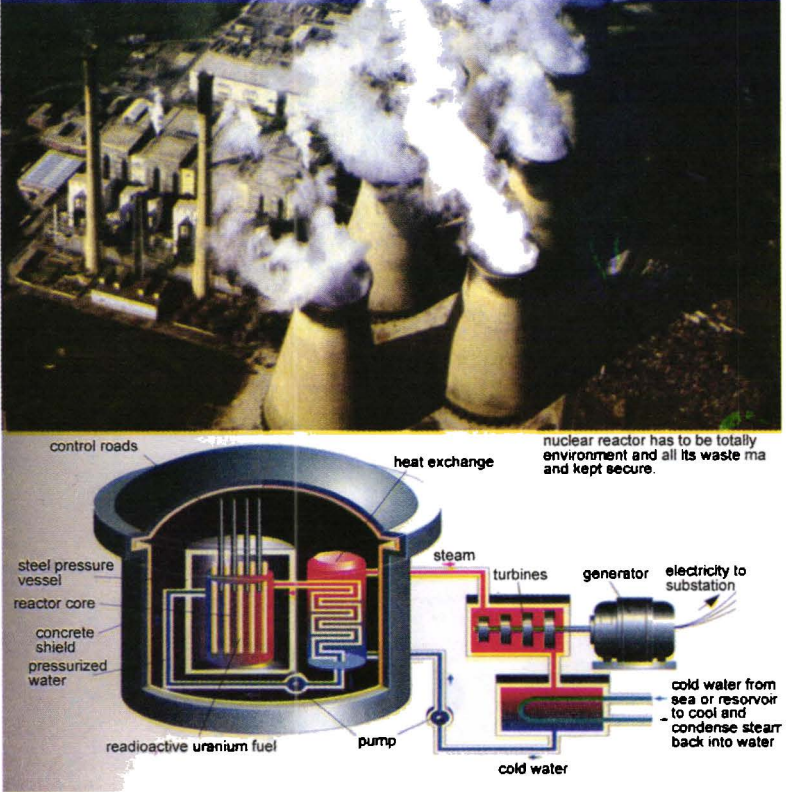
চিত্র-৩৩

—বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রায় পাঁচশত (৫০০) 'Atomic power plant উল্লিখিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার প্রভূত কল্যাণে অবদান রেখে চলছে। আগামী দিনে বিশ্ব সভ্যতা পরিপূর্ণভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই শক্তির উপরই নির্ভরশীল হতে চলেছে। কারণ প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এমন কোন উৎস আর যে নেই।

তাই আল্লাহও তাঁর শত্রুদের 'জাহান্নাম'-এ প্রচণ্ড অগ্নির শাস্তি দেয়ার জন্য জ্বালানী হিসেবে বাছাই করেছেন ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন ইউরেনিয়াম পাথর খণ্ড, যাতে করে সর্বোচ্চ তাপে অপরাধী মানুষগুলো জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হতে পারে। এর পরও কি এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা নত করা হবে না?

"আল্লাহ্ পরাক্রমশালী,মহাজ্ঞানী।" (৮ : ৪৯)
"তিনি সমস্ত কিছু (শক্তি ও বস্তু) সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথার্থ করেছেন নির্দিষ্ট অনুপাতে।" (২৫ : ২)

চিত্র-৩৪

–পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনই করা হচ্ছে না। বর্তমানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে পারমানবিক বোমায়, মিশাইলে ও সাবমেরিনেও ব্যবহৃত হচ্ছে। দেখা গেছে তুলনামূলক অনেক অনেক কম খরচে বেশি বেশি ফল লাভ করা যাচ্ছে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সমগ্র পৃথিবী এখন প্রতিযোগিতামূলকভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করে রাতারাতি উপরে উঠে যেতে চাচ্ছে। প্রমাণ হয়েছে এ মহাবিশ্বে তেজস্ক্রিয় পাথর খণ্ড সর্বোচ্চ শক্তি ধারণকারী পদার্থ।

"তিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর এদের পথ (ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, সীমা ও ধর্মরীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।" (২০ : ২৫)
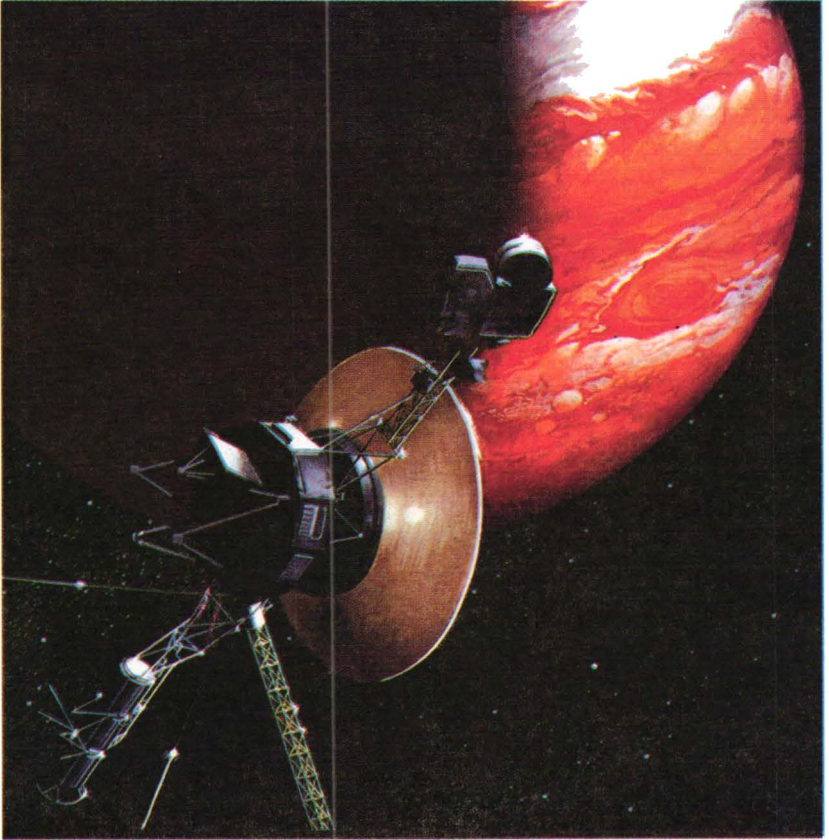
চিত্র-৩৫

–বিজ্ঞানের অবদানে মানব জাতি এখন মহাকাশে আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের আশায় একের পর এক দু:সাহসিক অভিযান পরিচালনা করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মহাকাশে 'Space probe' স্বল্প দূরত্বে পাঠানো হত। বর্তমানে সৌরজগতের বাইরে 'Space probe' পাঠানো হচ্ছে– পারমানবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে, কারণ এ শক্তি মূলতই প্রচণ্ড ও নির্ভরযোগ্য।

সুতরাং বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে আজ যে, তেজস্ক্রিয়তা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম-ই সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন পদার্থ, আর তাই আল্লাহ্ ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড 'জাহান্নাম'-এ ইউরেনিয়ামকেই জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করছেন।

"নিশ্চয় আমার প্রতিপালক (আল্লাহ্) সকল বস্তুর রক্ষণা-বেক্ষণ করেন।" (১১ : ৫৭)
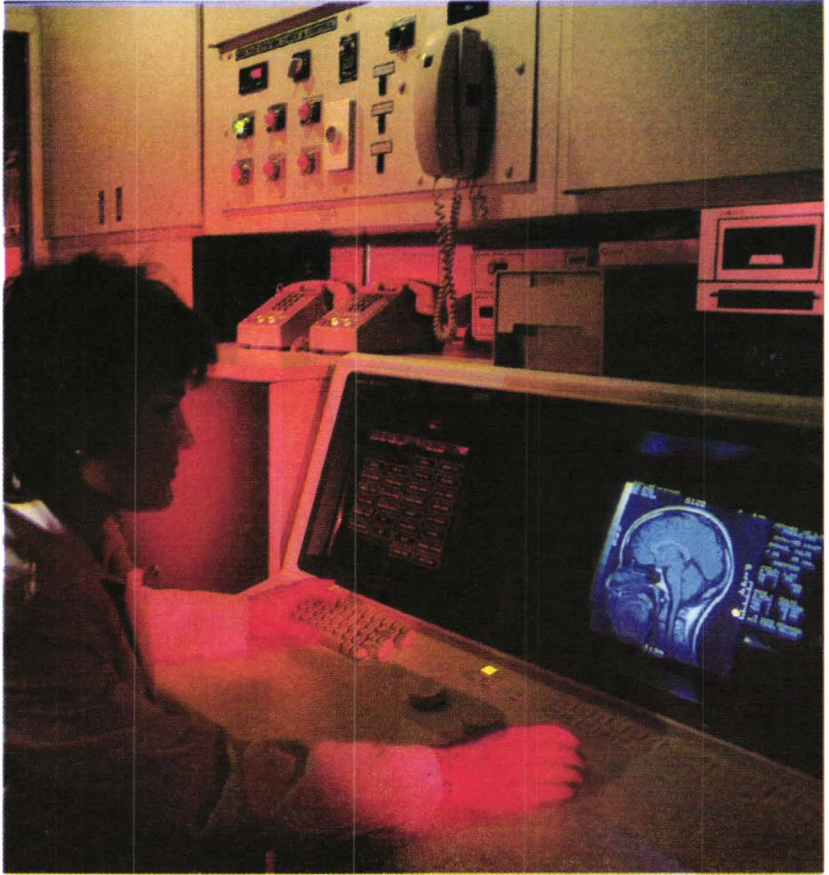
চিত্র-৩৬

–প্রতিদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে উদঘাটিত বিষয়গুলোও বহুমাত্রিক কর্ম-কাণ্ডে প্রতিনিয়ত সংশ্লিষ্ট হচ্ছে। এতে প্রভূতভাবে উপকৃত হচ্ছে মানব সভ্যতা। পূর্বে একশ' বছরেও যে উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব হতো না, তা এখন মাত্র এক বছরেই সম্ভব হচ্ছে। আনবিক শক্তির রহস্য উন্মোচনের পর এখন তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের সাথে সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও ব্যবহৃত হয়ে মানব কল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখছে। এর জন্য মূল কৃতিত্ব আল্লাহর, কেননা তিনিই তো বস্তু ও শক্তির একমাত্র স্রষ্টা।

তাহলে বিজ্ঞানের ১৪০০ বছর পূর্বে 'কুরআন' জাহান্নাম নামক অগ্নিকুণ্ডের জ্বালানী হিসেবে ঐ মাটির ঢেলা বা পাথর (ইউনিয়াম) ব্যবহার করার যে তথ্য পেশ করেছে, তা একশত ভাগ যুক্তিযুক্ত ও সত্য-সঠিক এবং বাস্তবসম্মত নয় কী? 'কুরআন' এবং বিজ্ঞানের বক্তব্যের মাঝে কোন ব্যবধান, বৈপরিত্য বা ভিন্নতা আছে কী?

এবার চলুন সমগ্র অধ্যায়টি এক নজরে দেখে নেই।

এক নজরে

আল-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
১. *"বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" (১০ : ১০১)* *"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা সমস্তই প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু ঐসব বিষয়ের প্রতি তারা উদাসীন।" (১২ : ১০৫)*	১. বর্তমান বিজ্ঞান তার চূড়ান্ত অগ্রগতির মাধ্যমে মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য মহাজাগতিক বিস্ময়কর বস্তুর সন্ধান লাভ করেছে। কোন কোন বস্তু আবিষ্কারের পূর্বে দেখা গেছে বিজ্ঞান সে সম্পর্কে পূর্বে কোন প্রকার জ্ঞান-ই রাখতো না। হঠাৎ করে বিজ্ঞানকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়ে কোন কোন বিষয় বিজ্ঞানের সামনে নিজের আবরণ উন্মুক্ত করেছে। এভাবে একটি দু'টি নয়, বরং শত শত মহাজাগতিক বিস্ময়কর বস্তুর আবিষ্কার দিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানবিশ্ব ধন্য ও গর্বিত।

২. "তিনি এমন আরো বহু সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা অবগত নও।" (১৬ ঃ ৮)

২. বর্তমান সময় পর্যন্ত বিজ্ঞান তার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে যে ব্যাপক সংখ্যায় মহাজাগতিক অদৃশ্য বস্তু আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞান আশাবাদ ব্যক্ত করছে যে, আগামীতে আরও বহু সংখ্যক অদৃশ্য গোপনীয় বস্তু বিজ্ঞানের হাতে প্রকাশিত হতে পারে। মহাবিশ্বটি মানুষের জ্ঞানের অবোধগম্য বৈচিত্রময় সৃষ্টি নৈপুণ্যতায় পরিপূর্ণ মহাসম্মিলন স্থান, যার পরতে পরতে শুধু বৈচিত্রের বহু সমারোহ বিরাজ করছে।

৩. "তিনিই মানুষকে অবহিত করেছেন ইতোপূর্বে সে যা জানতো না।" (৯৬ ঃ ৫)

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশেরই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।" (৬ ঃ ৬৭)

৩. সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে পরবর্তী সময়ে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ সাধনের সাথে সাথেই মানুষ ভাবতে, চিন্তা করতে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা করতে মোটেই কৃপণতা করেনি। ফলে সময়ের ব্যবধানে এক এক করে অসংখ্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান আজকের গৌরবময় অবস্থায় পৌঁছতে পেরেছে। অবশ্য প্রতিটি আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞান তার অনেক কিছুই জানতো না। এমনকি কখন কোন্ জিনিস আবিষ্কার হবে তাও সে জানে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতো বিপুল উন্নতি ঘটার পরও যেন বিষয়টি বিজ্ঞানের হাতে নেই বরং অন্য কোথাও হবে, বড় অদ্ভুত বৈ কি!

৪. "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ড।" (৭২ ঃ ২৩)

"তার স্থান হবে হাবীয়া, তা তুমি লউ জানো? ওটা ভীষণ উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ড।" (১০১ ঃ ৯-১১)

"এই অগ্নিকুণ্ড (জাহান্নাম) ভয়াবহ বিপদের মধ্যে অন্যতম।" (৭৪ ঃ ৩৫)

"এটাই সেই অগ্নিকুণ্ড যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে, (এখন বলো), এটা কি যাদু? নাকি তোমরা দেখছ না?" (৫২ ঃ ১৪-১৫)

৪. বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান জগত মহাকাশ বিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি মহাকাশে মহাজাগতিক অসংখ্য অদৃশ্য বস্তুর রহস্য উন্মোচন করেও মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে।

১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম 'Martin Schmidt' নামে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশে 'কোয়াসার' নামক বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কার করেন।

শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও বস্তুত কোয়াসারের আয়তন একটি বা দু'টি সৌরজগতের সমান মাত্র।

অথচ একটি 'কোয়াসার' থেকে নির্গত Highest esergetie radiation (তেজস্ক্রিয়) ক্ষমতা ১০,০০০ গ্যালাক্সির গড় তেজস্ক্রিয়তা নির্গমনের সমান এবং উজ্জ্বলতা প্রায় ১০০টি গড় গ্যালাক্সির নির্গত Light energy-র সমান।

এর কারণ একটি বা দু'টি সৌরজগতের আয়তনের সমান এ একটি 'কোয়াসার'-এর ভেতর মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র (সূর্য)কে ঠাসা-ঠাসিভাবে (জ্যাম করে) প্যাক্ট করা হয়েছে মহাজাগতিক অদৃশ্য কোনো এক কারণে। বিজ্ঞান এখনও সে রহস্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি।

অধিকাংশ কোয়াসারের সাথে লম্বা জেট (Jet) পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি কোয়াসারের কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস বর্তমান আছে।

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার প্রতি লক্ষ্য করো, নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।"
(১০ ঃ ১০১)

বর্তমান বিজ্ঞান কর্তৃক মহাকাশে আবিষ্কৃত উত্তপ্ত অগ্নিময় বস্তুসমূহের মধ্যে একমাত্র 'কোয়াসার'-ই সবচেয়ে বেশি তুলনাহীন অগ্নিময় ও ভয়ঙ্কর 'গামা- রে' (Gamma-ray) নামক তেজস্ক্রিয় নির্গতকারী অগ্নিকুণ্ড। যার প্রচণ্ডতা, তীব্রতা, ভয়াবহতা এবং ধ্বংস সাধন ক্ষমতা তুলনা করার মতো দ্বিতীয় কোনো নজির এখনো মানব জ্ঞানে ধরা পড়েনি।

"বিদ্রোহীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।"
(৬৭ ঃ ৫)

এ মহাবিশ্বে বিস্ময়ের-বিস্ময়, প্রচণ্ড অগ্নিময় দুর্গ-আবিষ্কৃত এ 'কোয়াসার', যা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি এতো ভয়াবহতা।

৫. "তুমি কি জানো ওটা কী? ওটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদুর্গ (জাহান্নাম)। যা হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। নিশ্চয় বিরাট বিরাট লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।"
(১০৪ ঃ ৫-৯)

৫. যে মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্রের সমষ্টিতে 'কোয়াসার' সৃষ্টি হয়েছে, তার একটি মাত্র নক্ষত্র থেকেই নির্গত লেলিহান শিখা লম্বায় প্রায় ৪০০,০০০ (চার লক্ষ) মাইল, ৫০,০০০ মাইল উঁচু এবং ৮,০০০ মাইল চওড়া হয়।

অতএব কোয়াসারের ভয়াবহতা যে মিলিয়ন মিলিয়ন গুণ বেশি হবে এবং কোনো বস্তুকে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশেই নিশ্চিহ্ন করে দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ তো দূরের কথা প্রায় ৮,০০০ মাইল ব্যাসের

পৃথিবীও ঐ বিরাট অগ্নিশিখার ভেতর হারিয়ে যাবে এবং মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. "ওটা উৎক্ষেপণ করবে বিরাট বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ 'কসর' (QSRS) অট্টালিকা সমতুল্য।" (৭৭ ঃ ৩২)

৬. 'কোয়াসার' থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রচণ্ড অগ্নি লেলিহান শিখাগুলোই মূলত Radio source, যার উপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীগণ মূল শব্দ হিসেবে 'QSRS' ব্যবহার করেছেন। কুরআনেও 'কসর' বলা হয়েছে।

QSRS অর্থ 'Quasi Stellar Radio Source.'

৭. "যারা আমার বাণীকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি আগুনে দগ্ধ করবোই। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই ওর স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো। যাতে তারা শাস্তি আর শাস্তি ভোগ করতে থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (৪ ঃ ৫৬)

৭. মহাকাশে অগ্নিগোলক নক্ষত্রের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর Proton-proton chain reaction-এ 'Electron' এবং 'Positron' ক্ষুদ্র কণিকাদ্বয়ের মধ্যে Annihilation (সংঘর্ষ) পদ্ধতিতে উভয়ের ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে যে তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) উৎপন্ন হয়, তার পুরোটাই হচ্ছে ধ্বংসাত্মক 'Gamma-ray' (highest eneregter radiation)। এই প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন 'গামা-রে' দিয়ে নক্ষত্রের অভ্যন্ত র ভাগ পরিপূর্ণ থাকে। যখন 'গামা-রে' নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশ ত্যাগ করে সৌরজগতের দিকে অগ্রসর হয়, তখন X-ray, Ultra-violet ray, Infrared ray, Visible light, Radio wave ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হতে থাকে।

এ Gamma-ray-র সংস্পর্শে কোনো জীব বা প্রাণীর দেহ কোষ নিমিষেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং চামড়া-গোশত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ঝরে পড়তে থাকে। সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর এ 'গামা-রে'।

৮. বিজ্ঞান বিশ্ব ক্রমান্বয়েপুন সৃষ্টি সম্পর্কীয় ধারণায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রমাণভিত্তিক মজবুত অবস্থানে অবস্থান নিতে সমর্থ হয়েছে (আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-২-এর পরকাল অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। আবিষ্কৃত 'কোয়াসার' মহাকাশে অন্যান্য জ্যোতিষ্কের ন্যায় পরিভ্রমণরত আছে। মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র দিয়ে (অগ্নিগোলক দিয়ে) প্যাক্ট (packed) বিধায় প্রতিনিয়ত বর্ণনাতীত radiation নির্গত করে নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ন রেখে চলেছে।

'কোয়াসার'-এর মূল নিউক্লিয়াসের (কেন্দ্রের) সাথে বর্ধিত জেট (Jet) হাজার হাজার আলোকবর্ষ থেকে কখনো কখনো লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত লম্বা এবং প্রায় ১০,০০০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে।

'কোয়াসার' তার জেট (Jet) দিয়ে মহাকাশে অপর যে কোনো জ্যোতিষ্কের সাথেই অনায়াসে সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে, যার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে ৮০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ লম্বা জেট দিয়ে প্রতিবেশী

৮. "সেদিন জমিনকে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ জমিনে পরিণত করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে ঐ আকাশকেও।" (১৪ ঃ ৪৮)

"ঐ দিন জাহান্নামকে নিকটে আনা হবে।" (৮১ ঃ ২৩)

"জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপ্ত করা হবে।" (৮১ ঃ ২২)

"এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে।" (৮১ ঃ ১৩)

"তোমাদের প্রত্যেকেই পুলসিরাত অতিক্রমক্ষকরবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (১৯ ঃ ৭১)

"আর যারা স্বীয় রবকে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে (হাশরের মাঠ থেকে জাহান্নাম ও পুলসিরাতের উপর দিয়ে তৈরী) বেহেশতের দিকে চালিত করা হবে।" (৩৯ ঃ ৭৩)

"অবিশ্বাসীদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে (পুলসিরাতের উপর দিয়ে) তাড়ানো হবে।" (৩৯ ঃ ৭১)

"আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" (৫৭ ঃ ১৭)

৯. "সে আগুনকে ভয় করো। যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।" (২ ঃ ২৪)

"বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (২১ ঃ ২৪)

"তিনিই মানুষকে অবহিত করেছেন, ইতোপূর্বে সে যা জানত না।" (৯৬ ঃ ৫)

গ্যালাক্সি NGC-4319-এর সাথে সেতুবন্ধন রচনা করে বিজ্ঞান বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং মহাকাশে একাধিক জ্যোতিষ্কের সাথে 'কোয়াসার' যে সেতুবন্ধন রচনা করে আবার যার যার অস্তিত্বও যথাযথভাবে বজায় রাখতে সক্ষম বিজ্ঞান তা অস্বীকার করে না, যেহেতু ইতিমধ্যেই সেই নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়ে আমাদের সম্মুখ টেবিলে সমুপস্থিত।

৯. স্বনামধন্য বিজ্ঞান অসংখ্য-অগণিত আবিষ্কারের মধ্যে এ যাবৎ যে কয়টি বিষয়ে আশ্চর্য ও হতবাক করার মতো অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মহাবিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বোচ্চ প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন 'ইউরেনিয়াম' পাথরের আবিষ্কার। দীর্ঘদিন ভারী এবং অকেজো পদার্থ হিসেবে বিবেচিত থেকে এই ইউরেনিয়াম যে গোটা সভ্যতাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে তার 'Radioactivity' দিয়ে। সেই গোপন 'Radioactivity' সর্বপ্রথম ১৮৭৯ সালে (X-ray) আবিষ্কার করেন ফ্রান্সের বিজ্ঞানী 'Henri Becquerel', পরে ১৮৯৮ সালে 'Curies Pierre Curie' এবং 'Marie Sklodowska' দম্পতি 'ইউরেনিয়াম' থেকে ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা (Radiation)

"তোমরা তোমাদের প্রভুর এই বাস্তব নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করে কি অস্বীকার করতে পারো?" (৫৫ ঃ ৩৪)

"নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ ঃ ৭৫)

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। তাঁর বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়ে অবগত রয়েছেন।" (৬ ঃ ১১৫)

"এগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

"এগুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

"সুতরাং তারা 'কুরআনের' পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?" (৭৭ ঃ ৫০)

সম্পন্ন 'Polonium' ও 'Radium' আবিষ্কার করেন। বড় ধরনের কৃতিত্বস্বরূপ ১৯০৩ সালে তারা সবাই যৌথভাবে 'Nobel prize' লাভ করেন। বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের আগে বস্তুর উদ্ঘাটিত বিষয় সম্পর্কে অগ্রিম কোনো জ্ঞান রাখে না এবং দাবিও করে না। মহাবিশ্বে যা সত্য ও বাস্তব, বিজ্ঞান তা বিনা-দ্বিধায় স্বীকার করে এবং মেনে নেয়। কোনো বিষয়ে সত্য ঘোষণা বিলম্বের জন্য পরিবেশ পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ই মূলত দায়ী।

বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার-ই জ্ঞান বিজ্ঞানে মোড়ানো যা জ্ঞানবানদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের পূর্বেই যদি কোনো উৎস নির্দিষ্ট বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে এবং বিজ্ঞান তার আবিষ্কার দিয়ে পূর্বে বর্ণিত হুবহু চিত্র-ই প্রকাশ করে, তাহলে উল্লিখিত 'উৎস'টি সকল প্রকার বিবেচনায় 'সত্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে বাধ্য। যুক্তি-তর্ক-জ্ঞান কোনো কিছু দিয়েই আর তার বিরোধিতা করা যাবে না।

অতএব কোয়াসারের দীর্ঘ আলোচনায় সমাপ্তি রেখা টানার পূর্বে কি অধ্যায়টির পূর্ণতা বিধানকারী পবিত্র সেই আল্লাহর বাণীর গুরু-গম্ভীর আহ্বান শুনাবো না, যা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে সমগ্র সৃষ্টিজগতকে ক্রমান্বয়েসত্যের পথে আহ্বান জানাচ্ছে?

"সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত এবং মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" (১৭ ঃ ৮১)

সুতরাং পূর্বে কুরআন বর্ণিত অগ্নিদুর্গ জাহান্নাম, তার বিরাট-বিশাল লম্বা-লম্বা লেলিহান শিখার (Flare) সৃষ্টি হওয়া, ঐ আগুনের সংস্পর্শে মানুষের গায়ের চামড়া-গোশত জ্বলে গিয়ে ঝরে পড়া, জাহান্নাম নামক অগ্নিকুণ্ডের লম্বা জেটের উপর 'পুলসিরাত' তৈরী হওয়া এবং বর্ণনাতীত শাস্তির স্থান জাহান্নাম নামক অগ্নিকুণ্ডের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কঠিন জ্বালানী হিসেবে 'পাথর খণ্ড' (solid fuel) ব্যবহার করার সাথে বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'কোয়াসার', 'কসর' বা সোলার ফ্লেয়ার (Solar flare), ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তা বা 'গামা-রে' (Gamma-ray) ও সলিড ফুয়েল পাথর খণ্ড 'ইউরেনিয়াম' (Uranium-238) এক ও অভিন্ন নয় কী? তাই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ ভয়ঙ্কর জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করা-ই হোক আমাদের সবার একমাত্র কাম্য।

আল্-কুরআন-এ 'বিগ-ব্যাংগ'

আল্-কুরআন

"বলো, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করো এবং অনুসন্ধান করো, আল্লাহ্ কেমন করে প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (১৯ ঃ২০)

"তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) ছয়টি সময়কালে সৃষ্টি করেছেন।" (৫৭ ঃ ৪)

"তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হয়েছ, তবে কেন তোমরা (পরবর্তী সৃষ্টি সম্পর্কে) অনুধাবন করো না?" (৫৬ ঃ ২২)

"যিনি আদিতে (প্রথম) সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন।" (২৭ ঃ ৬৪)

"ওরা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন। অতঃপর পুনরাবৃত্তি ঘটান। এ কাজ তো আল্লাহ্র জন্য সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবো-ই।" (২১ ঃ ১০৪)

"এতো কেবল একটি মহাবিস্ফোরণ। তখনই (সৃষ্ট নতুন) ময়দানে তাদের আবির্ভাব ঘটবে।" (৭৯ ঃ ১৩-১৪)

"অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে (মহানাদ ঘটানো হবে), তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে (নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে) তাকাতে থাকবে।" (৩৯ ঃ ৬৮)

"একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ (মহাবিস্ফোরণ) হবে, আর সকলকেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।" (৩৬ ঃ ৫৩)

বক্ষমান অধ্যায়টি আমাদের ধর্মীয় জ্ঞানী সমাজ ও বিজ্ঞানপ্রিয় উভয় দলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা উভয় দলই পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে 'বিগ-ব্যাংগ' ও 'কুরআন'-এর মাঝে সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখী হয়ে থাকেন। তাদের সবাইর নিকটই একটি বড় প্রশ্ন মাথা উঁচু করে বার বার জানতে চায় কুরআন কি 'বিগ-ব্যাংগ' (Big Bang) কে সাপোর্ট করে?' কিংবা বিগ-ব্যাংগ কি কুরআনের অনুকুলে? এখানে উল্লিখিত বিষয়টির যুক্তিপূর্ণ ও সহজ সমাধান পেশ করার লক্ষ্যেই বক্ষমান অধ্যায়ে আমরা প্রয়াস পাবো ইন্‌শাল্লাহ্।

প্রথমেই আমরা উদ্ধৃত আল্-কুরআনের অমীয় বাণীসমূহের মর্মকথা উদ্ধার করার চেষ্টা করবো এবং পরক্ষণে তারই আলোকে বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কৃত বক্তব্যকেও পরখ করে দেখবো যে, উভয়ের মাঝে সত্যিকার অর্থেই মিল কতখানি বিদ্যমান আছে!

উপরোক্ত ১৯ ঃ ২০ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার রাসূল (সা) কে বলেছেন যে, তিনি যেন পৃথিবীর মানবমণ্ডলীকে বলে দেন, তারা যেন নিজেদের জ্ঞানের চোখ দিয়ে পৃথিবীর পরতে-পরতে, আনাচে-কানাচে ও চতুর্দিকে ভালো করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালিয়ে দেখে যে, কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে মহান আল্লাহ্ এ মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করেছেন। তারা এগিয়ে গেলে অবশ্যই বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হবে এবং তারা সঠিকভাবে ব্যাপারটি বুঝতে পারবে। আর বিষয়টি যখন উদ্‌ঘাটিত হয়ে প্রমাণিত হবে, তখন তারা শত সহস্র বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারবে না। তারা ভাবতে থাকবে এও কি সম্ভব? 'তখন বলে দাও হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষেই কেবলমাত্র সম্ভব'। যেহেতু তিনি মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর উপর নিরঙ্কুশভাবে পূর্ণ ক্ষমতাবান, পূর্ণ কর্তৃত্বধারী। তাই কোন ব্যাপার-ই তাঁর নিকট অসম্ভব নয়। তিনি সর্বশক্তিমান।

৫৭ ঃ ৪ আয়াতে তিনি জানিয়ে দিলেন– আমাদের এ মহাবিশ্বটি শুরু থেকে সর্বমোট ৬টি সৃষ্টি পর্যায় বা সময়কাল অক্রিমকরে বর্তমান দৃশ্যযোগ্য আকৃতি লাভ করেছে।

৫৬ ঃ ২২ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এ বলে যে, যখন মানব সম্প্রদায় বিজ্ঞানের অবদানে মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে, তখন পরকালের দ্বিতীয় পর্যায়ের সৃষ্টি সম্পর্কে কেন তারা সন্দিহান হচ্ছে, কেন তা তাদের বোধগম্য হচ্ছে না?

২৭ ঃ ৬৪ আয়াতে স্পষ্ট করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে শূন্য থেকেই প্রথমে যিনি মহাবিশ্বসহ সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনিই পরকালে আবার একই নিয়ম ও একই পদ্ধতিতে সেই সৃষ্টি কার্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন। এতে হতবাক হওয়ার বা বিস্ময়ের কিছুই নেই।

২৯ ঃ ১৯ আয়াতটিও একই বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তবে একটু বাড়তি যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছে, তা হলো মহাবিশ্বের সৃষ্টিকার্য মানব জ্ঞানে যত বড় বিস্ময়কর ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত হোক না কেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র নিকট সমগ্র বিষয়টি খুবই নগণ্য ও সহজ ব্যাপার, কঠিন কোন ব্যাপার-ই নয়।

২১ ঃ ১০৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করে বলেছেন যে, তিনি অবশ্যই মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রথম পদ্ধতির অনুকরণে ও অনুসরণে পরকালের নতুন সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন। মানব সমাজ তাদের মানবীয় সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটিকে যতই অসম্ভব মনে করুক না কেন।

অতঃপর ৭৯ ঃ ১৩ আয়াতে পরকাল সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির পদ্ধতিটি সরাসরি ব্যক্ত করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ পদ্ধতিটি হবে একটি মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে, যেখানে বিস্ফোরণ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই পরক্ষণে পদ্ধতিগতভাবে পরজগতৎ (হাশরের মাঠ বা বিচারের মাঠ) সৃষ্টি হবে এবং সেথায় মৃত সকল মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে খোলা মাঠে উপস্থিত হবে।

"যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য রকম (খোলা ময়দানরূপে) পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও; এবং মানুষ এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হবে।" (১৪ ঃ ৪৮)

৩৯ ঃ ৬৮ ও ৩৬ ঃ ৫৩ আয়াত দু'টিও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। যেখানে পরকালের এক মহাবিস্ফোরণ দিয়েই পরকালের

সৃষ্টির সূচনা ঘটানো হবে বলে জানানো হয়েছে এবং সমস্ত মানুষ সৃষ্ট নতুন জগতে আবার জীবন্ত হয়ে মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাজির হবে।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টির কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে সরাসরি স্পষ্ট করে মহাবিস্ফোরণের কথা না বলে মানব সমাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানময় গবেষণার পথকে খুলে দিয়েছেন, কিন্তু পরকালের বিচার অনুষ্ঠানের নিমিত্তে নতুন করে সৃষ্ট জগতের সৃষ্টি পদ্ধতি খুবই সংক্ষিপ্তাকারে হলেও ৭৯ ঃ ১৩ আয়াতে 'মহাবিস্ফোরণ' শব্দটি উপস্থাপন করে জ্ঞানপূর্ণ ইশারায় ব্যক্ত করার মাধ্যমে জ্ঞানীদের জ্ঞানরাজ্যে প্রকৃত সত্য তথ্যের সমাহার মালার মতো গেঁথে দিয়েছেন। ফলে একই প্রকার সৃষ্টি কার্যের পুনরাবৃত্তির কারণে আমাদের বুঝে নিতে আর কষ্ট হচ্ছে না যে, মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টিকার্য পদ্ধতিটিও অবশ্যই প্রচণ্ড এক 'মহাবিস্ফোরণ' (Big Bang)-এর মাধ্যমেই ঘটে থাকবে। আরও সহজভাবে বললে বলা যায়, মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন এ মহাবিশ্বকে নিজ থেকেই একা সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব পরিকল্পনায়। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে প্রথম যাত্রার সূচনা ঘটিয়েছেন তা একেবারে স্পষ্ট করে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেননি, শুধু ২১ ঃ ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, "অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা কি গবেষণা করে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্বটি) মিশে ছিলো (বিন্দুতে বা Singularity-তে) ওতোপ্রোতভাবে! অতপর আমি তাদের স্ববেগে পৃথক করে দিলাম।"

অর্থাৎ পূর্ব থেকে একটি বিন্দুতে একত্রিত মহাবিশ্ব সৃষ্টির উপাদানসমূহকে স্ববেগে পৃথক করে দিয়েছেন। এখানে যা প্রকারান্তরে চতুর্মুখী মহাসম্প্রসারণকেই প্রকাশ করছে। এ পর্যায়ে যদি মহাসম্প্রসারণ শুরুর ঠিক পূর্বের অবস্থায় যাওয়া যায়, তাহলে অনুভব করা যায় এক 'মহাবিস্ফোরণ' ঘটার কারণেই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শক্তির আঁধার নামক বিন্দুটি চতুর্মুখী বিক্ষিপ্ত হয়ে মহাসম্প্রসারণ ঘটিয়ে দুর্বার গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে পাচ্ছে। এক 'মহাবিস্ফোরণ' ছাড়া বিগত প্রায় ১৫০০ কোটি বছর ধরে মহাবিশ্বটি দুর্বার গতিতে প্রতিনিয়ত সর্বদিকে কল্পনাতীতভাবে বর্ধিত হওয়া কখনই সম্ভবপর ছিলো না।

অতএব, নির্দ্বিধায় বলা যায় Big Bang বা 'মহাবিস্ফোরণ' এর মাধ্যমেই মহাবিশ্বটি সৃষ্টি হয়ে বর্তমান রূপ ও আকৃতি লাভ করেছে।

আবার অন্যভাবে দেখলে দেখা যায় ২১ ঃ ১০৪ নং আয়াতে প্রথম সৃষ্টি কার্যটির অনুকরণে পরবর্তী সৃষ্টি কার্যের কৌশলের পুনরাবৃত্তি ঘটানো হবে বলে দাবি পেশ করায় এবং পরবর্তী সৃষ্টিকার্যে ৭৯ ঃ ১৩ আয়াতে এক 'মহ-াবিস্ফোরণ' ঘটবে বলে উল্লিখিত হওয়ায় প্রমাণিত হচ্ছে– এ মহাবিশ্বের বর্তমান অস্তিত্ব ধারণের পেছনে এক 'মহাবিস্ফোরণ' সক্রিয়ভাবে কর্মরত ছিলো, যে 'মহাবিস্ফোরণ' পরবর্তী অবস্থা থেকে ৬টি পর্যায় বা পদ্ধতি সময়কাল অতিক্রম করে মহাবিশ্বটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপনীত হয়েছে।

সুতরাং Big Bang বা 'মহাবিস্ফোরণ'-এর মাধ্যমেই এ মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে এবং পরকালে পুনরুত্থান দিবসে সৃষ্টিকার্যও 'মহানাদ' বা মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমেই ঘটবে, আল্-কুরআনের বক্তব্যে সে তথ্যই দৃঢ়ভাবে মানব জাতির নিকট মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রভু মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে।

এখন আমরা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সর্বশেষ তথ্যের মাধ্যমে বিষয়টি সঠিকভাবে পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে পরখ করে দেখার চেষ্টা করবো উল্লিখিত কুরআনিক বক্তব্যের সাথে বৈজ্ঞানিক তথ্যের কতটুকু মিল বা অভিন্নতা রয়েছে।

বিজ্ঞান

আমাদের এ মহাবিশ্বের 'মূলতত্ত্ব' ও 'সৃষ্টিতত্ত্ব' বিষয়ক গবেষণা, অনুসন্ধান ও অর্জনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আমাদেরকে অবহিত করেছে যে, পূর্বে মানব সমাজে মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে ব্যাপকভাবে মুখরোচক ও কাল্পনিক ধারণা-প্রস্তাব দীর্ঘদিন প্রভাব বিস্তার করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দিতে এসে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতায় বলীয়ান বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের তোড়ে ঐ সকল কাল্পনিক মিথ্যা ধারণা ও অসত্যের প্রাসাদ বিপর্যস্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারেনি।

"অবিশ্বাসীরা কি গবেষণা করে দেখে না যে, শুরুতে মহাবিশ্ব মিশে ছিল ওতোপ্রোতভাবে (একটি বিন্দুতে), অতঃপর আমি সকলকে পৃথক করে দিলাম স্ববেগে এবং প্রাণবান সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি ওরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" (২১ : ৩০)
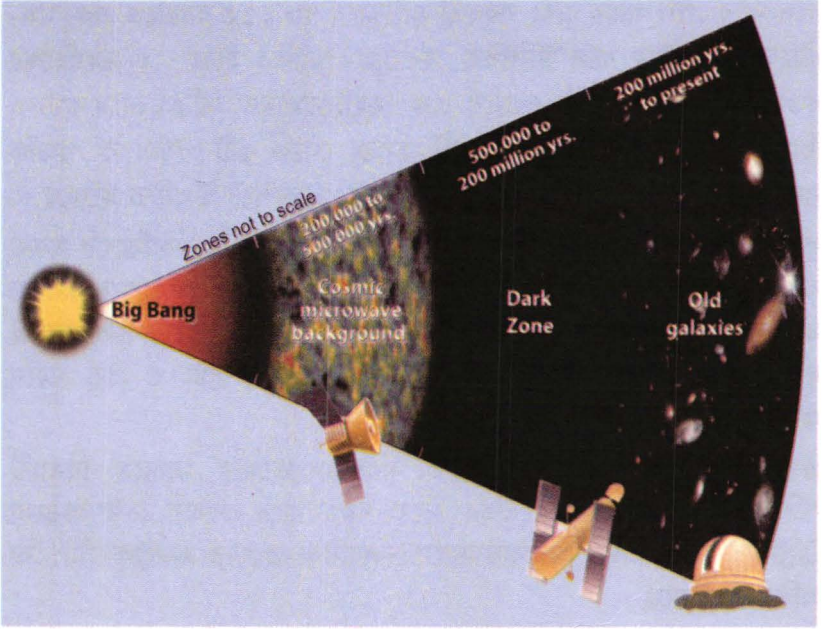
চিত্র-৩৭

—মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে আল-কুরআন মানব জাতিকে যে তথ্য সরবরাহ করেছে, তাতে বুঝা যাচ্ছে সমগ্র মহাবিশ্বের মাঝে যত প্রকার শক্তি ও বস্তু রয়েছে বর্তমানে তার সমস্ত কিছুই প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে কল্পনাতীত চাপে সঙ্কুচিত হয়ে একটি মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে জমানো ছিল। সেই অবস্থা থেকে এক সময় আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলেন তিনি বিন্দুটিকে মহাবিশ্বে রূপ দেবেন; ফলে বিন্দুর মধ্যে ঘটালেন এক মহাবিস্ফোরণ, সাথে সাথে বিন্দুটি অগ্নিগোলকের রূপ ধারণ করে মহাসম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে। এ সময় সকল প্রকার শক্তি ও বস্তু কণিকা পৃথকভাবে অস্তিত্ব ধারণ করে মহাবিশ্বের বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে।

১৯৩৩ সালে বেলজিয়াম পদার্থ বিজ্ঞানী 'মিঃ লি, মেইতার' Big Bang নামক মহাবিশ্ব সৃষ্টি বিষয়ক থিউরি পেশ করেন। ১৯৪৬ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী 'মিঃ গামো' Big Bang বা 'মহাবিস্ফোরণ' থিউরিকে সমর্থন করে গাণিতিকভাবে ঐ বিগ-ব্যাংগ মহাবিস্ফোরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপমাত্রা (Back ground radiation) 3k. এখনও মহাবিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান আছে বলে দাবি করেন এবং বলেন ভবিষ্যতে যথাযথভাবে অনুসন্ধান চালানো গেলে তা আবিষ্কারও হতে পারে।

পরে ১৯৬৪ সালে আমেরিকার দু'বিজ্ঞানী 'মিঃ আরনো পেনজিয়াস' ও 'মিঃ রবার্ট উইলসন' বেল টেলিফোন কোম্পানীতে চাকুরীরত অবস্থায় নিজেদের প্রয়োজনে তৈরী এন্টেনাতে (Antena) কাজ করার সময় হঠাৎ করেই তারা উল্লিখিত তাপমাত্রা 2.73k (২.৭৩ কেলভীন) আবিষ্কার করে বিশ্বব্যাপী তাক লাগিয়ে দেন। বিজ্ঞান বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর এ তাপমাত্রা ২.৭৩ কেলভীন আবিষ্কৃত হওয়ায় 'Big Bang' তত্ত্বকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বিজ্ঞানীদ্বয়কে ১৯৬৫ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে।

সৃষ্টিতত্ত্ব ঃ Big Bang তত্ত্বের মূল বক্তব্য হচ্ছে মানবীয় কল্পনা বহির্ভূত অদৃশ্য এক বিশাল শক্তির উৎস হতে বিপুল পরিমাণ আলোকশক্তির প্রচণ্ড ঘনায়নের মাধ্যমে এক পর্যায়ে অবিশ্বাস্য এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে ($১০^{-৩২}$ সেঃ মিঃ প্রায়) শক্তি ঘনীভূত হয়ে পড়ে। তখন বিন্দুটিতে সর্বোচ্চ বক্রতা, সর্বোচ্চ চাপ ও সর্বোচ্চ তাপের (প্রায় ১০,০০০ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ডিগ্রি কেলভীন) কারণে বিন্দুটি আর নিজকে ধরে রাখতে না পেরে $১০^{-৪৩}$ সেকেণ্ড-এর এক মহাসূক্ষ্ম সময়ে 'মহাবিস্ফোরণ' ঘটিয়ে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা ঘটায়। এ প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জমানো আলোকশক্তি মুক্ত হয়ে চতুর্দিকে মহাসম্প্রসারণ ঘটিয়ে বিরামহীনভাবে ছুটতে থাকে, ফলে আজকের এ সময় পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ আয়তনের বিস্তৃতিতে মহাবিশ্বকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপরও মহাসম্প্রসারণ এখনও দুর্বার গতিতেই কেবল এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লিখিত মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) পর থেকে মহাবিশ্বের বর্তমান বস্তুজগৎ

"ওরা কি লক্ষ্য করে না (গবেষণা করে না) দেখে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেছেন?" (২৯ : ১৯)

চিত্র-৩৮

–আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মি.এডুইন হাবেল পাওয়েল' সর্বপ্রথম ১৯২০ সালে টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখতে পান মহাকাশে অসংখ্য গ্যালাক্সি পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে এবং সকল গ্যালাক্সি মহাকাশের কোন একটি কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে চতুর্দিকে কেবলই দূরে চলে যাচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় পূর্বে কোন এক সময় সমস্ত গ্যালাক্সির বস্তুভর (mass) একটি বিন্দুতে জমানো ছিল।

উল্লিখিত তথ্যের সহযোগিতায় ১৯৩৩ সালে বিজ্ঞানী 'লি. মেই-তার' মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) থিউরী সৃষ্টিতত্ত্ব হিসেবে পেশ করেন।

"পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং অনুসন্ধান কর, দেখ আল্লাহ্ কেমন করে প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (১৯ : ২০)
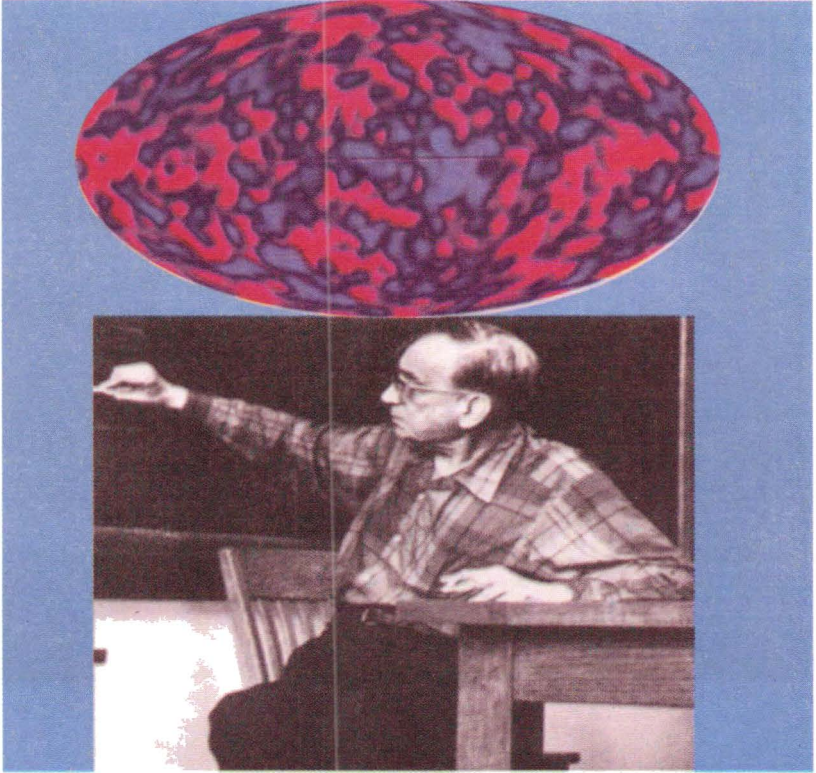
চিত্র-৩৯

–বিজ্ঞানী 'মি. লি. মেইতার'-এর 'মহাবিস্ফোরণ' তথ্যকে ১৯৪৬ সালে সমর্থন করেন আমেরিকান বিজ্ঞানী 'মি. গামো'। তিনি এ বিষয়ের উপর অঙ্ক কষে দেখান যে, এ মহাবিস্ফোরণের অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপমাত্রা (Back ground radiation) এখন মহাবিশ্বে প্রায় 3k. (৩ কেলভীন) বিরাজমান আছে। যথাযথভাবে অনুসন্ধান করা গেলে তা আবিষ্কৃত হতে পারে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এভাবে 'মহাবিস্ফোরণ' তত্ত্বটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে ক্রমান্বয়ে গ্রহণযোগ্যতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পাশা-পাশি অন্যান্য প্রস্তাবও চলতে থাকে, তবে কোনটাই প্রমাণিত হতে পারেনি মজবুত দলীলের অভাবে।

"তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হয়েছো, তবে কেন তোমরা অনুধাবন করো না? (৫৬ : ২২)

চিত্র-৪০

–১৯৬৪ সালে আমেরিকান দু'বিজ্ঞানী 'মি. আরনো পেনজিয়াস ও মি. রবার্ট উইলসন' বেল টেলিফোন কোম্পানীতে চাকুরীরত অবস্থায় নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি এন্টেনাতে কাজ করার সময় হঠাৎ করেই তারা আবিষ্কার করেন ২.৭৩ k. (কেলভীন) তাপমাত্রা। এতে সমগ্র বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে প্রমাণিত হয় যে, সৃষ্টতত্ত্ব মহাবিস্ফোরণ-এর অবশিষ্ট থেকে যাওয়া তাপমাত্রা (Background Radiation, যা বিজ্ঞানী মি. গামো ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন) মহাবিশ্বব্যাপী এখনও বিরাজমান আছে এবং এর পরিমাণ প্রায় ৩ কেলভীন (3k)।

বিজ্ঞানবিশ্ব প্রমাণ সাপেক্ষে বিষয়টি অনুমোদন করে এবং ১৯৬৫ সালে বিজ্ঞানীদ্বয়কে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে।

"ওরা কি লক্ষ্য (গবেষণা) করে না, কিভাবে আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন?" (২৯ : ১৯)
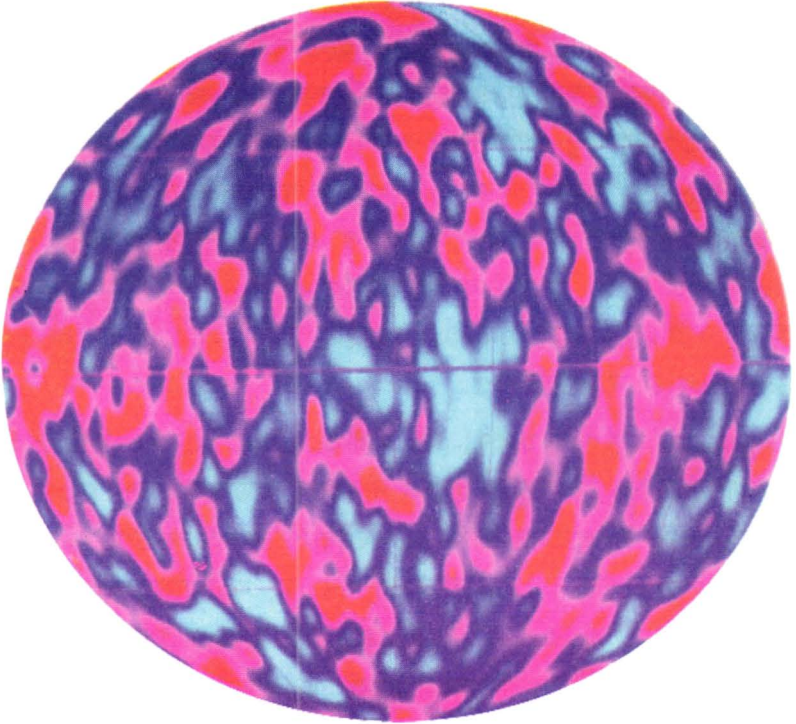
NASA

চিত্র-৪১

–বিজ্ঞানবিশ্ব বিষয়টি আরো মজবুতভাবে প্রমাণের জন্য মহাশূন্যে 'Cobe Setellite' পাঠিয়ে মহাবিশ্বের মহাশূন্য থেকে অসংখ্য ছবি ধারণ করে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চালায়। এতে Background Radiation-এর পক্ষে আবারও একই সিদ্ধান্ত আসে এবং ধারণকৃত ছবিতেও মহাবিশ্বে বিরাজমান তাপমাত্রার পার্থক্যও ভেসে উঠে।

সুতরাং এক সময় যে মহাবিশ্বটি এক 'মহাবিস্ফোরণ'-এর ভেতর দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তা সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

আলোকশক্তি থেকে তার রূপ ধারণ করতে সর্বমোট ৬টি সময়কাল অতিক্রম করেছে।

১৯৬৪ সালে প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত 'Standard model of the Big Bang' হতে বিজ্ঞানীগণ ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে মহাবিশ্বের অসংখ্য ব্যাপারে অগণিত তথ্য উদ্ধার করতে সমর্থ হন। যা অন্য কোনো তত্ত্ব থেকে সম্ভব হয়নি। মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক থিউরি 'Big Bang' বা 'মহাবিস্ফোরণ' তত্ত্ব বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান বিশ্বে প্রমাণিত, সত্যায়িত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক অতুলনীয় সৃষ্টিতত্ত্ব। পূর্বে অনেক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে নাক ছিটকালেও বর্তমানে কিন্তু চরম বাস্তবতার কারণে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'মহাবিস্ফোরণ' বা 'Big Bang' কে মেনে নিয়েছে।

'Big Bang' (মহাবিস্ফোরণ)-এর সত্যতা ১৯২০ সালেও আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী 'মি. ইডুইন হাবেল পাওয়েল' মাউন্ট উইলসন টেলিস্কোপ ব্যবহার করে সর্বপ্রথমবারের মতো বিশ্ববাসীকে প্রত্যক্ষভাবে আকাশের কাল্পনিক পর্দা সরিয়ে দেখাতে সমর্থ হন যে, মহাবিশ্বের মূল সংগঠন বিশাল-বিশাল গ্যালক্সিগুলো সবাই ভাসমান অবস্থায় পরিক্রমণ করতে করতে কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ক্রমান্বয়ে মহাকাশের মহাসমুদ্রে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে– পূর্বে কোনো এক সময় সকল গ্যালাক্সিগুলোর উপাদানসমূহ একটি বিন্দুতে অবশ্যই জমানো ছিলো। পরবর্তীতে কোনো এক সময় অনিবার্য কারণে বিন্দুটি নিজেকে মহাসূক্ষ্মতায় ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়, পরিণতিতে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটে বিন্দুটি চতুর্দিকে দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফলে জমানো আলোকশক্তি বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ধাক্কায় মহাসম্প্রসারণ সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন পদার্থ কণিকা সৃষ্টি করে গ্যালাক্সির জন্ম দিতে থাকে, যে গ্যালাক্সিগুলো বর্তমানে দৃশ্যযোগ্য বস্তুরূপে আমাদের ব্যবহৃত টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর যে

"আমি (আল্লাহ্) আমার শক্তি-ক্ষমতা বলে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি এবং আমি এর মহাসম্প্রসারণ ঘটাচ্ছি।" (৫১ : ৪৭)
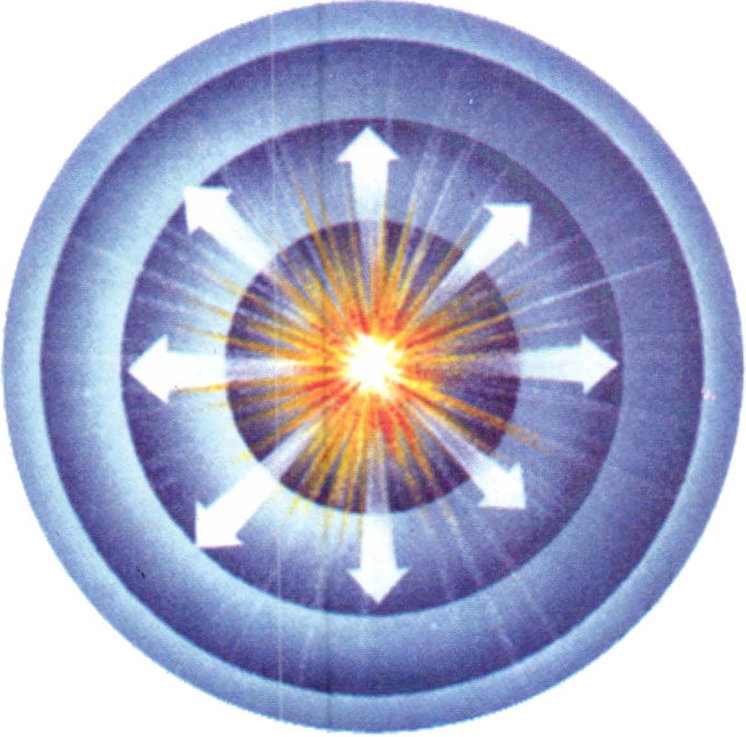
চিত্র-৪২

–আজ থেকে প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে মহাসূক্ষ্ম প্রায় ১০$^{-৩৩}$ সে.মি. বিন্দুতে সমগ্র মহাবিশ্বটি আবদ্ধ অবস্থায় জমানো ছিল। এতে প্রচণ্ড চাপ ও তাপে স্থির থাকতে না পেরে বিন্দুটি এক পর্যায়ে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে চতুর্দিকে মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। সেই সময় থেকে অদ্যাবদি কেবলই সম্প্রসারিত হয়ে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পান যে এখনও মহাবিশ্বটি দুর্বার গতিতে কেবলই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, নিকট ভবিষ্যতে সেই সম্প্রসারণ থেমে যাওয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে 'কুরআন' দাবী করেছে– আল্লাহ্ নিজ শক্তিবলে সম্প্রসারণ ঘটিয়ে চলছেন। তিনি সেখানে 'বর্তমানকাল' ব্যবহার করেছেন। তাই মহাসম্প্রসারণ কেবল ঘটে চলছে।

"মহাবিশ্বের মধ্যস্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"
(২ : ১৬৪)

"মহাবিশ্বের এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই।" (২৭ : ২৫)

চিত্র-৪৩

–আমাদের এ মহাবিশ্বটি মূলতই এক মহাজ্ঞানের আধার। এর পরতে পরতে, ধাপে ধাপে শুধু জ্ঞান আর জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে আছে। সমাজে যারা জ্ঞানী তারা সত্যিকার অর্থেই এখানে তাদের সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান। আল্লাহ্ তাদের জন্য সে ব্যবস্থা নিজ থেকেই সাজিয়ে রেখেছেন। মানুষ শুধু আগ্রহ সৃষ্টি করে এগিয়ে গেলেই এক পর্যায়ে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাচ্ছে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানব জাতির প্রতি একটি বড় ধরনের করুণা বলা যায়। আর সে কারণেই আজকে বিজ্ঞানবিশ্ব 'আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন' দিয়ে অনেক সমৃদ্ধ হতে পেরেছে।

কোনো স্থান থেকেই টেলিস্কোপের মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ উল্লিখিত গ্যালাক্সিদের প্রস্থান দৃশ 'Red shift'-এর মাধ্যমে নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছেন এবং বিপুল আলোকশক্তির সঙ্কুচিত বিন্দুতে 'মহাবিস্ফোরণ' তথা 'Big Bang' ঘটে যে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, সে তথ্যের স্বীকৃতি প্রদান করছেন।

সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে– সৃষ্টিতত্ত্ব : 'Big Bang' সত্য ঘটনা।

'আল্-কুরআনে বিগ-ব্যাংগ' নামক এ অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দিব্যি দেখতে পাচ্ছি– প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে মানব জাতিকে অবহিত করতে গিয়ে মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টির সূচনা পর্বে মহাসূক্ষ্ম বিন্দু থেকে শক্তির মিশ্রণকে চতুর্দিকে স্ববেগে ছড়িয়ে দেয়া (২১ ঃ ৩০) এবং পরকালে আবার নতুনভাবে সৃষ্টির সূচনা 'মহাবিস্ফোরণ' দিয়ে (৭৯ ঃ ১৩ আয়াত) শুরু করার কথায় এবং এ দ্বিতীয় সৃষ্টিকার্যটি যে হুবহু প্রথম সৃষ্টি কার্যেরই অনুকরণে আল্লাহ্ নিজেই ঘটাবেন (২১ ঃ ১০৪ আয়াত, ২৭ ঃ ৬৪ আয়াত ইত্যাদি) বলে তথ্য প্রকাশ করেছেন, এতে মানব সমাজে যাঁরা প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানী তাঁদের নিকট 'মহ-াবিস্ফোরণ' বা 'Big Bang' নামক 'সৃষ্টিতত্ত্ব' দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। অর্থাৎ তাঁদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্-কুরআনের সরবরাহকৃত তথ্য মতে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা এবং পরকালের সৃষ্টির সূচনা একটি পদ্ধতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আর তা হচ্ছে– 'Big Bang' বা 'মহাবিস্ফোরণ'।

স্বনামধন্য বর্তমান বিজ্ঞানবিশ্বও প্রযুক্তিগত সর্বশেষ উৎকর্ষতা দিয়েও মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে নিরঙ্কুশভাবে ১৯৩৩ সালে সেই বেলজিয়াম পদার্থ বিজ্ঞানী 'মি. লি মেইতার'-এর সৃষ্টিতত্ত্ব মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বকে প্রমাণ সাপেক্ষে আবিষ্কার করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাথে সাথে এই তত্ত্বের বিপরীতে আর কোন তত্ত্ব যুক্তিপূর্ণভাবে দাঁড়াতে না পেরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

"তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ : ৮১)

চিত্র-৪৪

–১৯২০ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানী 'মি. ইডুইন হাবেল পাওয়েল' মাউন্ট ইউলসন টেলিস্কোপ ব্যবহার করেই আকাশ রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অবলোকন করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে জাগ্রত করে দেন। ইতোপূর্বে মানব জাতি সে সম্পর্কে কোন কিছুই জানতে পারেনি।

এ টেলিস্কোপের সাহায্যেই মি. হাবেল ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত একটানা দীর্ঘসময় আকাশ পর্যবেক্ষণ করে দৃশ্যমান গ্যালাক্সিসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটালগ তৈরী করেন, যা পরবর্তীতে বিজ্ঞান বিশ্বের অনেক উপকারে লাগে। বিজ্ঞান বিশ্ব মি. হাবেল-এর কাছে বাস্তবতার নিরীখে অনেক ঋণী।

“আমি (আল্লাহ্) আকাশে গ্যালাক্সিসমূহ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের সুশোভিত করেছি সত্যিকার দর্শকদের জন্য।” (১৫ ঃ ১৬)
“সেদিন আমি (আল্লাহ্) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে লিখিত দফতর গুটানো হয়।” (২১ ঃ ১০৪)
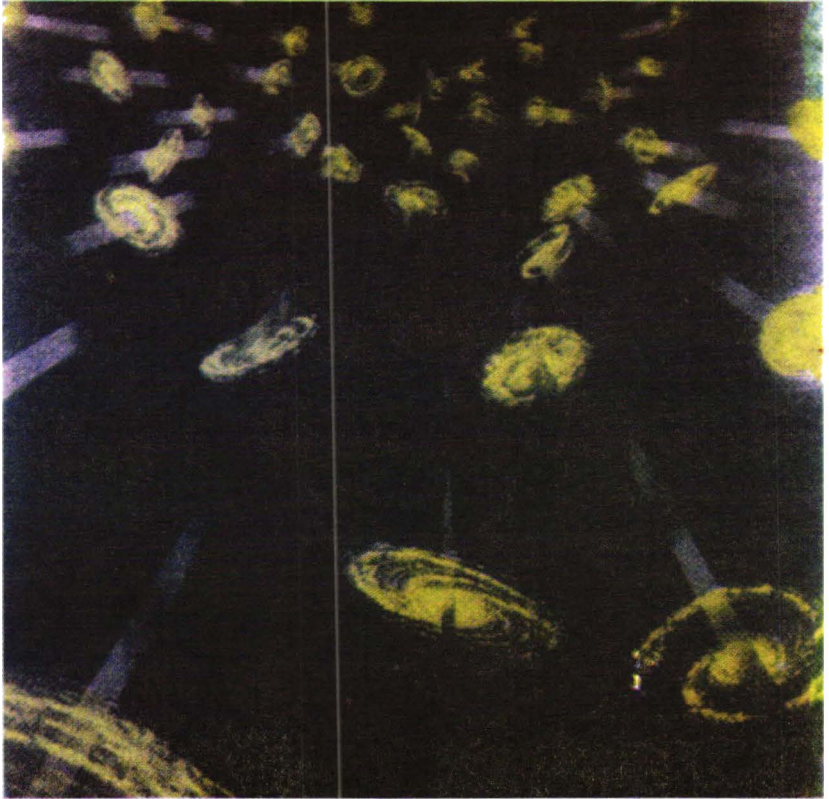
চিত্র-৪৫

–আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী ‘মি. হাবেল’ মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে দেখিয়েছিলেন যে সকল গ্যালাক্সি-ই দ্রুত গতিতে মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানার দিকে ছুটে যাচ্ছে, আবার প্রস্থান করার সময় গ্যালাক্সিগুলো নিজেদের মধ্যেও পরস্পর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে– একদিকে এ মহাবিশ্ব ‘Big Bang’ নামক মহাবিস্ফোরণের ভেতর দিয়েই সৃষ্টি হয়ে বিন্দু থেকে আজকের বিশাল রূপ ধারণ করছে। আবার অপরদিকে মহাবিশ্বটি সৃষ্টি মুহূর্ত থেকেই অনবরত মহাসম্প্রসারণ ঘটিয়ে কেবল চতুর্দিকে বর্ধিত হয়ে চলছে।

"আমি (আল্লাহ্) শপথ করছি ঐ সকল গ্যালাক্সির যারা ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৫৩ : ১)
"শপথ গ্যালাক্সির যারা পশ্চাদপসারণে নিরত ও যারা ভেসে বেড়ায় ও অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৮১ : ১৫, ১৬)

চিত্র-৪৬

–ছবিতে দৃশ্যমান গ্যালাক্সিগুলো এক এক করে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করতে করতে একপর্যায়ে ছুটে চলার বিপরীতমুখী চাপে সঙ্কুচিত হয়ে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে প্রবেশ করবে। এ প্রক্রিয়া চলার সময় গ্যালাক্সির ভেতরকার সকল প্রকার বস্তুই ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে বালু কণায় রূপান্তরিত হবে। অতঃপর মহাকাশীয় কঠিন সংকোচনে পড়ে বিন্দুবৎ পর্যায়ে গিয়ে চাপ ও তাপ সামাল দিতে না পেরে আবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টির লাইনে এগিয়ে যাবে। সেটাই হলো পরকাল।

এখন এ অবস্থায় কুরআনের মজবুত দলীল থাকার পরও যদি কেউ ধর্মের নামে মিথ্যা ও অযৌক্তিক আবেগতাড়িত হয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব 'Big Bang' কে অস্বীকার করেন, তাহলে তাদেরকে কি আমরা কুরআনের প্রকৃত অনুসারী বলতে পারবো? পারবো না। কারণ এ বিষয়ে যে তাঁদের বাস্তবিকই অজ্ঞতা রয়েছে তা একশত ভাগই সত্য এবং তা জ্ঞানীদের জ্ঞানের চোখে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ছে। তাঁদের এ 'Big Bang' কে অস্বীকার করা মূলতই কুরআনের বক্তব্যের সরাসরি বিপক্ষে যাচ্ছে।

আবার বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোতে অতি উচ্চমানের জ্ঞানে সমৃদ্ধ আল্-কুরআনের অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ যে এক মহাসত্যতার মোড়ক পরিবেষ্টিত হয়ে অবতীর্ণ তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরও অতি বিজ্ঞানপ্রিয় স্থূল আবেগতাড়িত কারও পক্ষ থেকে আল্লাহ্, রাসূল (সা) ও কুরআনকে কটাক্ষ করার কি কোন প্রকার সুযোগ আছে? কুরআন বর্বর যুগের, ভেড়ার যুগের, উটের যুগের ইত্যাদি ব্যঙ্গবানে ধর্মকে হেয় করার ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে কি তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করছেন না? অবশ্যই। তাঁদের এ জাতীয় আচরণ মূর্খ-পণ্ডিতেরই আচরণ বই আর কিছুই নয়। জ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি ঘটার কারণে এটা অবশ্যই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। মহাসত্যকে ঢাকনা দিয়ে স্থায়ীভাবে ঢেকে রাখা যায় না। এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে।

তাই আসুন! সত্য-সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে অজ্ঞতা ও কৃত্রিম অন্ধত্ব পরিহার করে আমরা জ্ঞানবান সমাজের মানুষগুলো প্রকৃত কল্যাণের পথে, আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কথায় ও কাজে যথার্থতা প্রদর্শন করি। তবেই আমাদের পার্থিব ও পরকালীন জীবন হবে সুন্দর ও সফল।

এ মহাবিশ্বে মহাজ্ঞানের সঠিক তথ্যগুলো যথাযথভাবে উপলব্ধির পথে আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন ॥

এবার আমরা 'আল-কুরআনে বিগ-ব্যাংগ' নামক আলোচিত অধ্যায়টি এক নজরে সাজিয়ে দেখে নিই।

"তারা কি গবেষণা করে দেখে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান? এটাতো আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ কাজ। (২৯ : ১৯)
"এতো এক মহাবিস্ফোরণ কেবল তখনই (সৃষ্ট ময়দানে) ওদের আবির্ভাব ঘটবে।" (৭৯ ঃ ১৩, ১৪)
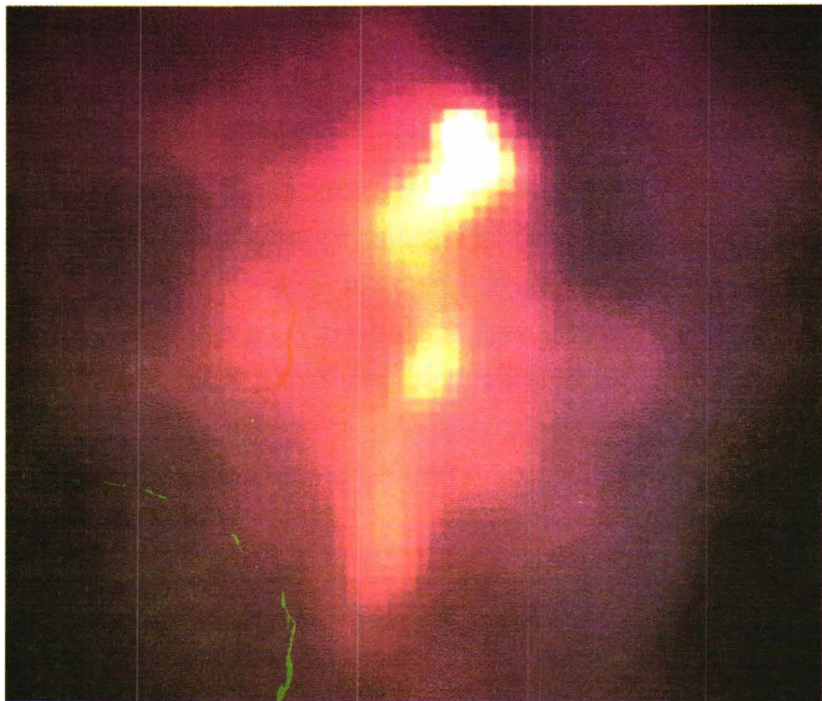
চিত্র-৪৭

–অতি সম্প্রতি বিজ্ঞান পরকালীন জগৎ ও ব্যবস্থা সম্পর্কীয় এমন অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে যে, পরকাল আর অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

উপরের ছবিতে আবিষ্কৃত 'Able 1975 Cluster' বিস্ফোরণ পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে নতুন নতুন গুচ্ছজগৎ সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে। যা প্রমাণ করছে গ্যালাক্সিগুলো একবার সৃষ্টি আবার ধ্বংস, আবার সৃষ্টি, আবার ধ্বংস এভাবে পুনঃপৌণিক (Oscillating) প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে।

সুতরাং এতে প্রমাণ হচ্ছে– আল কুরআন 'Big Bang' সৃষ্টিতত্ত্ব সমর্থিত এবং পরকালেও একইভাবে 'মহাবিস্ফোরণ'-এর মাধ্যমেই নতুন জগৎ সৃষ্টি হবে, যা বিজ্ঞানও হাতে কলমে প্রমাণ করে দিয়েছে।

"তুমি দেখনা যে, আল্লাহর গোলামী করছে যা কিছু আছে মহাবিশ্বে- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে।" (২২ ঃ ১৮)
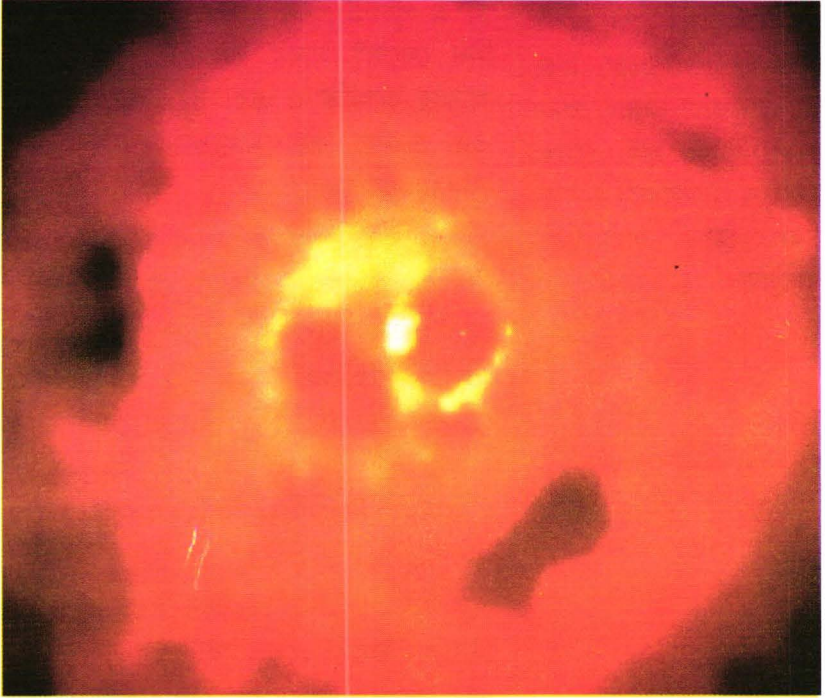
চিত্র-৪৮

–আমাদের এ মহাবিশ্বের এক ও একক স্রষ্টা হচ্ছেন মহান আল্লাহ। আবার সবার প্রতিপালনকারীও হচ্ছেন একমাত্র তিনি। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবাইকে আবার তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হচ্ছে। তাই সমগ্র মহাবিশ্ব এমনকি গাছ-পালা, তরু-লতা, বন-বনানীসহ সমস্ত উদ্ভিদকুলও একমাত্র তাঁরই গোলামী করছে তাঁরই নির্দেশমত ধাবিত হয়ে প্রয়োজন মত ছায়া ও ফুল-ফল প্রদান করার মাধ্যমে। এছাড়াও এগুলো কাঠ ও জ্বালানী এবং জরুরী ঔষধি সেবা প্রদান করে থাকে। এজন্য কৃতিত্ব একমাত্র আল্লাহরই কেননা তিনিই উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন।

এক নজরে

আল-কুরআন

১. *"বলো, পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করো এবং অনুসন্ধান করো, আল্লাহ্ কেমন করে প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।"* (১৯ ঃ ২০)

বর্তমান বিজ্ঞান

১. এ পৃথিবী পৃষ্ঠে মানব ইতিহাসের প্রথম দিন থেকেই মানব সমাজ এ মহাবিশ্বের আকার আকৃতি ও এর সৃষ্টি বিষয়ক সকল তথ্য জানার জন্য নানাভাবে চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে এসেছে।

একাজ করতে গিয়ে মানব জ্ঞানে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে যে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হলেও তাদের পক্ষে অন্তত মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা কখনই সম্ভবপর নয় এবং মানব জাতি সে বিষয়ে জ্ঞান বা যোগ্যতা ও ক্ষমতা কোনটাই বহন করে না। তারা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, কোনো এক সর্বময় অদৃশ্য শক্তির প্রচণ্ড ক্ষমতার বিশাল উৎস হতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়ে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। আবার ঐ শক্তিটি প্রতিনিয়ত মহাবিশ্বকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেও চলেছে। ফলে কোটি কোটি বছর ধরে একই নিয়মে মহাবিশ্বটি তার 'লাইফ সাইকেল' (Life cycle) নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে এবং অপ্রত্যাশিত বা অযাচিত কোনো প্রকার বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ঘটার বা মহাবিশ্বকে অচল করার কোনো প্রকার প্রশ্নই উঠছে না।

২. *"তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্বটি) ছয়টি সময়কালে সৃষ্টি করেছেন।" (৫৭ ঃ ৪)*

২. পূর্বে মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞান বিশ্বে একাধিক প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও বিংশ শতাব্দীতে 'Big Bang' তত্ত্বটি প্রমাণিত হয়ে বিজ্ঞান বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পরবর্তীতে 'Big Bang'-এর উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা পরিচালিত হওয়ার ফলে বিজ্ঞানী সমাজ একটি বিষয়ে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রকাশ করেন যে- মহাবিস্ফোরণ মুহূর্ত থেকে আজ অবধি মহাবিশ্বটি মূলত আলোকশক্তি হতে সর্বমোট ৬টি সময়কালে ক্রমরূপান্তর ঘটিয়ে বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উক্ত ৬টি সময়কাল হচ্ছে–

ক. Plank Time বা Time Zero.

খ. Inflation period.

গ. Annihilation period.

ঘ. Proton and Neutron period.

ঙ. Atomic nuclei period.

চ. Stable atom period.

৩. *"তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। তবে কেন তোমরা (পরকালের নতুন জগৎ ও মানুষ সৃষ্টিকে) অনুধাবন করছো না?" (৫৬ ঃ ২২)*

৩. বর্তমান বিজ্ঞানও বিশ্বাস করে পূর্বে একসময় এ মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার কোনো প্রকার বস্তুর অস্তিত্বই ছিলো না। প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে এক বিশাল শক্তির আধার হতে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির সূচনার পরমুহূর্ত হতে মহাবিশ্বটি মহাসম্প্রসারণের মাধ্যমে মহাশূন্যে চারিদিকে একযোগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ অবস্থায় তাপমাত্রাও ক্রমান্বয়ে

কমতে থাকায় এক এক পর্যায়ে তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে এক এক ধরনের পদার্থ কণিকা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। প্রায় ১০,০০০ কোটি কোটি কোটি কোটি ডিগ্রি থেকে তাপমাত্রা যখন প্রায় তিন ৩. কেলভীন-এ (2.73k) আগমন করে, কেবল তখনি পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণী জগৎ বসবাসের উপযোগী সার্বিক পরিবেশ তৈরী হওয়ায় সাগরের পানিতে সৃষ্টি হয়ে প্রাণীকুল প্রথম বারের মতো পৃথিবীর দৃশ্যমান এই সবুজ শ্যামলিমায় মেতে উঠে।

তাই বিজ্ঞানও বিশ্বাস করে একবার যখন শূন্য প্রায় অবস্থা থেকেই একটি পদ্ধতিতে মহাবিশ্বটি সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে প্রাণেরও আবির্ভাব ঘটেছে, তাই পূর্বের একই নিয়মে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বিষয়টিতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই। বরং অস্বীকার করাই হবে মূর্খতার পরিচায়ক। জ্ঞানী সমাজের জন্য যা কাম্য হতে পারে না।

৪. "যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি ঘটান।"

(২৭ ঃ ৬৪)

৪. পূর্বে মানব সমাজে খুবই নগণ্য পর্যায়ে জ্ঞানের সীমিত বিকাশ ঘটায় তারা মহাবিশ্বের অনেক বিষয়ই যথাযথভাবে বুঝতে পারেনি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটায় বর্তমান বিজ্ঞানী সমাজ নিত্য নতুন আবিষ্কৃত উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাবিশ্বের পূর্ণাঙ্গ 'লাইফ সাইকেল' (Life cycle) বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন। ফলে তারা মহাবিশ্বের ভেতর গ্যালাক্সিদের

"তারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটান। এটা তো আল্লাহ্‌র জন্য খুবই সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)

একবার সৃষ্টি আবার ধ্বংসের, আবার সৃষ্টি আবার ধ্বংসের পুনঃপৌণিক (Oscillating) ধারা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্ববাসীকে তা যথাযথভাবে অবহিত করেছেন।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় 'আশ্চর্যজনক দলিল' হলো– মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমার দিকে প্রতিদিন গড়ে ১টি বা ২টি করে 'গামা-রে বার্স্ট' (GRBS)-এর 'আলোর ঝলক' (Flash of light) সৃষ্টি হচ্ছে। যা মহাকাশকে তুলনাহীনভাবে আলোকিত করে তোলে। তার ছবি ও ফ্লাশ (Flash) বিজ্ঞানীগণ সনাক্ত করতে ও ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং হচ্ছেন। এ ফ্লাশগুলো মূলতই গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) প্রবেশের পর পরক্ষণে প্রচণ্ড চাপ ও তাপে বেসামাল হয়ে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে, তারই আলোর ঝলক। অন্য কিছু নয়।

অতএব সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ঘটনা আল্-কুরআনের ন্যায় আজকের বিজ্ঞানও প্রমাণ ভিত্তিক দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করছে।

৫. "অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা কি ভেবে (গবেষণা ও অনুসন্ধান করে) দেখে না যে, আদিতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (মহাবিশ্ব) একত্রে মিশে ছিল বিন্দুতে ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি সবাইকে (মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) স্ববেগে পৃথক করে দিলাম।" (২১ ঃ ৩০)

৫. ১৯২০ সালে মার্কিন আকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েল' প্রথমবারের মতো যখন আকাশ রাজ্যের পর্দা উন্মোচন করে টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাশূন্যে চতুর্দিকে ভেসে উড়ে চলা গ্যালাক্সিদের তথ্য বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন, তখন মহাশূন্যে গ্যালাক্সিদের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে চতুর্দিকে ছুটে যাওয়াকে কেন্দ্র করে গবেষণা করতে গিয়েই বেলজিয়াম পদার্থ বিজ্ঞানবিদ

'মিঃ লি মেইতার' ১৯৩৩ সালে সর্বপ্রথম মহাবিশ্বের 'সৃষ্টিতত্ত্ব' 'Big Bang' বা 'মহাবিস্ফোরণ' তত্ত্ব উত্থাপন করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, এক সময় সমগ্র মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুভর (Mass) একটি মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে সর্বোচ্চ চাপ এবং তাপে আবদ্ধ ছিলো। পরে যখন কোনো এক সময় বিন্দুটি প্রচণ্ড চাপ আর তাপে নিজকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় ঠিক তখনই ঘটে যায় এক 'মহাবিস্ফোরণ' (Big Bang)। পরক্ষণে ঐ বিস্ফোরণের ধাক্কায় শক্তির আঁধার নামক 'সঙ্কুচিত বিন্দুটি' ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মহাশূন্যে অস্বাভাবিক হারে বর্ধিত হয়ে মহাসম্প্রসারণ ঘটিয়ে চতুর্দিকে ছুটতে থাকে। এ অবস্থায় শক্তির আধারের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় তাপমাত্রাও দ্রুত কমতে থাকে এবং এক এক পর্যায়ে শক্তি থেকে এক এক ধরনের বস্তু কণিকা সৃষ্টি হয়ে পরে গ্যালাক্সিতে রূপ নিতে থাকে। ঐ গ্যালাক্সিগুলোই এখনও ভেসে ভেসে মহাশূন্যে উড়ে যাচ্ছে। এ যাওয়ার পথে ক্রমান্বয়ে গতির বৃদ্ধি ঘটায় যখন আলোর গতি লাভ করছে তখন পুরো গ্যালাক্সিটি গতিমুখের বিপরীতে চাপের কারণে সঙ্কুচিত হয়ে আবার এক পর্যায়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে জমে যাচ্ছে। ফলে বিন্দুটি এক পর্যায়ে সঙ্কুচিত পদার্থের চাপ এবং তাপ সামাল দিতে না পেরে পুনরায় 'Big Bang'-এর অনুকরণে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়ে নতুনভাবে

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় (পরকাল) সৃষ্টি করবো। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবোই।"
(২১ ঃ ১০৪)

জগৎ (পরকাল) সৃষ্টি করছে। বর্তমানে যা 'গামা-রে বার্স্ট' (GRBS) নামে বিজ্ঞান বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে।

সুতরাং বিজ্ঞানও স্বীকার করছে যে, এক মহাশক্তির আধার সঙ্কুচিত-এ বিন্দুবত অবস্থা থেকেই মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বটি সৃষ্টি হয়েছে। আবার গ্যালাক্সিগুলো মহাবিস্ফোরণ থেকে প্রাপ্ত ধাক্কায় মহাবিশ্বে ছুটে যাওয়ার পথে গতিমুখের বিপরীত চাপে সঙ্কুচিত হয়ে একবার ধ্বংস হয়ে আবার সৃষ্টি হচ্ছে। এ কাজটি প্রতিনিয়তই পুনঃ পুনঃ (Oscillating) সংঘটিত হচ্ছে।

৬. "এতো এক মহাবিস্ফোরণ (Big Bang) কেবল, তখনই (সৃষ্ট নতুন) ময়দানে ওদের আবির্ভাব ঘটবে।"
(৭৯ ঃ ১৩-১৪)

"অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার (প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে) দেয়া হবে, ফলে তখনই ওরা (সৃষ্ট নতুন ভূমিতে) দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (৩৯ ঃ ৬৮)

"একটি মাত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে (পরকালে নতুন সৃষ্টির বেলায়) আর অমনি সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করে দেয়া হবে।" (৩৬ ঃ ৫৩)

৬. বর্তমান উন্নতর স্যাটেলাইট ও টেলিস্কোপের সাহায্যে বিজ্ঞানবিশ্ব প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি মহাকাশে পর্যবেক্ষণের সরাসরি সুযোগ পাচ্ছে। 'Big Bang'-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে গ্যালাক্সিগুলো মহাশূন্যে চতুর্দিকে কেবল ছুটে যাচ্ছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে এক সময় গ্যালাক্সিগুলোর উপাদান একটি মাত্র বিন্দুতে একত্রিত অবস্থায় মিশে ছিলো। আর তাই যদি হয় তাহলে সেই একত্রিত অবস্থা থেকে আজকের চতুর্দিকে ছুটে চলা অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যে গতিশক্তির প্রয়োজন ছিলো, তা নিশ্চয়ই এক মহাবিস্ফোরণের কারণেই লাভ করেছে। তা না হলে গ্যালাক্সিগুলো মহাশূন্যে চতুর্দিকে দুর্দান্ত গতিতে একইভাবে ছুটে যাবে কেন?

অতএব প্রমাণিত হচ্ছে– মহাবিশ্বটির প্রথম যখন সৃষ্টির সূচনা ঘটেছিল তখন অবশ্যই এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমেই তা ঘটেছিল। এতে সাথে সাথে এ বিষয়টিও প্রকাশ পাচ্ছে যে, পরবর্তীতে উল্লিখিত সৃষ্টির অনুকরণে যখনই কোনো নতুন নতুন জগৎ তৈরীর প্রয়োজন হবে তখন ঐ মহাবিস্ফোরণও জরুরী হয়ে পড়বে। তা না হলে মহাশূন্যে ভাসমান ও চলমান জগৎ তৈরী হবে না।

সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে– ইহজগৎ সৃষ্টিতে যেমনি 'বিগ-ব্যাংগ' সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে ঠিক তেমনি পরজগতেও প্রচণ্ড শব্দে 'মহাবিস্ফোরণ' ঘটিয়ে নতুন জগৎ তৈরী হবে। যে জগতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সমস্ত মানুষ আবার উত্থিত হবে তাদের এ পৃথিবীর জীবনের হিসাব প্রদানের জন্য ফলে 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞান' একযোগে ঘোষণা করছে যে, 'Big Bang' বা 'মহাবিস্ফোরণ' এ মহাবিশ্বে এক অনন্য সত্য ঘটনা। উভয়ের সরবরাহকৃত তথ্যে কোনো প্রকার ভিন্নতা নেই। তাই প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত উক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের আর কোনো প্রকার বিরোধিতা করা যাবে না। মহাসত্য সর্বদাই স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে

‘একই নিয়মে গোলামী’

আল্-কুরআন

“তারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) ব্যবস্থার দিকে তাকায় না এবং তাদের প্রতি যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন?” (৭ ঃ ১৮৫)

“তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আকাশে ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বের পরতে পরতে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে) তাকায় না? আল্লাহ্ অভিমুখী প্রতিটি গোলামের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।” (৩৪ ঃ ৯)

“(আল্লাহ্) তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র মহাবিশ্বের সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।” (৩২ ঃ ৫)

“তিনি আকাশমণ্ডলী (সমগ্র মহাবিশ্ব) নির্মাণ করেছেন কোনো প্রকার স্তম্ভ (খুঁটি) ব্যতীত (ভাসমান ও চলমান কায়দায় সবই ব্যবস্থিত) তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ।” (৩১ ঃ ১০)

“আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে (সমগ্র মহাবিশ্বটাকে) সংরক্ষণ করেন। যাতে তারা (ভাসমান ও চলমান থাকাবস্থায়) স্থানচ্যুত না হয়। তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে?” (৩৫ ঃ ৪১)

“শপথ নক্ষত্রপুঞ্জের (গ্যালাক্সির) যা ভাসমান অবস্থায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।” (৫৩ ঃ ১)

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং এর মধ্যবর্তী কোনো কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।" (১৮ ঃ ৮৫)

"কতো মহান তিনি, যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন গ্যালাক্সি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র!" (২৫ ঃ ৬১)

"তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অধীনে চলেছে।" (১৪ ঃ ৩৩)

"তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মের অধীন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।" (৩১ ঃ ২৯)

"এ ব্যবস্থা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে আরোপিত (যা একাধারে বিস্ময়কর ও অলঙ্ঘনীয়)।" (৩৬ ঃ ২৯)

"সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে (গোলামী করে) নির্ধারিত কক্ষ পথে।" (৫৫ ঃ ৫)

"(মহাশূন্যে) ভাসমান অবস্থায় সবাই নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে পরিভ্রমণে ব্যস্ত।" (৩৬ ঃ ৩৮)

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে, এদের সাথে আবার নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই (পক্ষ থেকে নির্ধারিত) বিধানে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে (গভীর জ্ঞানসম্পন্ন) নিদর্শন।" (১৬ ঃ ১২)

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে (তাঁরই নির্ধারিত বিধান মানার ভেতর দিয়ে) এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর উচ্চ প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" (১৭ ঃ ৪৪)

"তিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তাদের চলার পথ (গোলামীর নমুনা, কার্যক্রম, সীমা, ধর্মনীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।" (২০ ঃ ৫০)

"এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ ঃ ৭৫)

"তোমরা আল্লাহ্‌র (মহাজাগতিক একই বিধানের অধীনে গোলামীর) উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরাহ পূর্ণ করো।" (২ ঃ ১৯৬)

"নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়) যা বরকতময় ও বিশ্বজগতের (আল্লাহমুখী সার্বিক গোলামীর) দিশারী। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইব্রাহিম। আর যে কেউ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ (চারদিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে ৭ বার প্রদক্ষিণ) করা তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের কারও মুখাপেক্ষী নন (ফলে প্রত্যাখ্যানকারী এক কঠিন শাস্তি গ্রহণে বাধ্য হবে)।" (৩ ঃ ৯৬-৯৭)

"তারা কি চায় আল্লাহর বিধান (গোলামী) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো বিধান মানতে? অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে, সমস্তই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ্‌র বিধান (গোলামী) মেনে নিয়েছে।" (৩ ঃ ৮৩)

"যদি কেউ ইসলাম (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া গোলামী) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো বিধান মেনে চলে তাহলে তার কাছ থেকে ঐ বিধান (গোলামী) গ্রহণ করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (৩ ঃ ৮৫)

"আল্লাহ্‌র বিধানে (গোলামীতে) পরিবর্তন দেখতে পাবে না।" (৪৮ ঃ ২৩)

"যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করুক।" (৭৮ ঃ ৩৯)

সুধী পাঠক! উপরে উল্লিখিত মহাগ্রন্থ আল-কুর্‌আনের পবিত্র বাণীসমূহের মর্মকথা উপস্থাপনের আগে আমাদের জানা প্রয়োজন আল্লাহর গোলামী বা তাঁর 'ইবাদত' অথবা তাঁর 'বিধান মেনে চলা' বলতে কী বুঝায়।

প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী এক আল্লাহ্‌র গোলামী বা ইবাদত করা বলতে বুঝায়– তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিটি মুহূর্তের অগ্রগতি, উন্নতি, জীবন ধারণ, কর্মতৎপরতা, কাজের সীমা, পরিণতি ও আনুগত্য প্রকাশ করাসহ ইত্যাদি বিষয়কে যে, সুষ্ঠু পদ্ধতি ও সুশৃঙ্খলভাবে তিনি বেধে দিয়েছেন, হুবহু সেই একই নিয়মে যথাযথভাবে সৃষ্টির পক্ষ থেকে তা সম্পাদন করা। যেমন– আল্লাহ্ মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় মহাজাগতিক বস্তুগুলোর মধ্যে যাকে যে আকৃতি, গতি, চলার কক্ষপথ ও সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তারা হুবহু সেভাবে উক্ত বিষয়গুলোর সম্পাদন করাই হচ্ছে– মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র গোলামী করা বা ইবাদত করা অথবা তাঁকে সিজদা বা সম্মান প্রদর্শন করা।

আবার পৃথিবী পৃষ্ঠে গাছ-পালা, তরু-লতাসহ সকল প্রকার উদ্ভিদ জগতের প্রত্যেকের যাকে যে আকৃতি, রং, বৈচিত্রতা, উচ্চতা ও ফুল-ফলসহ ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তা সম্পাদন করে শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে– মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, গোলামী করা কিংবা তাঁকে সিজ্‌দা ও সম্মান করা।

মানব সম্প্রদায়ের বেলায় আবার মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকে আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, শিক্ষা-দীক্ষা, কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, বিয়ে-শাদী, আনন্দ-উৎসব পালন, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও প্রতিদিনের স্রষ্টার নির্ধারিত গোলামী প্রকাশের বিষয়সহ অন্যান্য সকল বিষয়ের জন্য আল্লাহ্ যে সকল নিয়ম পদ্ধতি ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই উল্লিখিত বিষয়গুলো সুচারুরূপে সম্পাদন করাই হচ্ছে– এক আল্লাহ্‌র গোলামী করা বা ইবাদত করা।

এভাবে অবস্থা কাল ও পাত্র ভেদে প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিছু কিছু ব্যাপারে ইবাদত বা গোলামীর একই পদ্ধতি আবার কিছু কিছু ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা সৃষ্টির জন্য বাধ্যতামূলক।

লক্ষ্য করুন কুরআনে–

"তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ্‌কে সিজদা করে (তাঁর গোলামী করে) যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে), সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে?"

(২২ ঃ ১৮)

'ইবাদত' বা 'গোলামী' সম্পর্কে এতটুকুন ন্যূনতমপক্ষে অবহিত হয়ে এবার চলুন কুরআনের বাণীসম্ভারের মর্মকথা উপলব্ধির জন্য সম্মুখপানে এগিয়ে যাই।

সম্মানিত পাঠক, উপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহের মর্মকথা হচ্ছে– আমাদের এ পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসরত মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও যারা মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তা মহান আল্লাহর সম্মুখে নিজ মস্তক অবনত করে ধন্য হতে পারেনি, তারা কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বিক ব্যবস্থাপনার দিকে তাকায় না? আল্লাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টিই এমনভাবে সৃষ্ট যে, এর কোন একটি বিষয়ের দিকে তাকালেই তারা দেখতে পাবে সবাই যেন নীরবে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া গোলামীর নজরানা একাগ্রচিত্তে পেশ করে চলেছে, কোথাও যেন কোন বিরোধিতা নেই, প্রতিবাদ নেই, বিশৃঙ্খলা নেই, নেই কোন অনিয়ম। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবাই যেন হাসিমুখে ও সন্তুষ্টচিত্তেই তাদের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্‌র গোলামী করে চলেছে। আনুগত্য ও গোলামীর মনে হবে যেন এটাই চূড়ান্তরূপ।

মহাকাশে বড় বড় বস্তু ও নিকটবর্তী সূর্যসহ সৌরপরিবারের সবাই প্রতিদিন একই নিয়মে উদয় অস্তের মাধ্যমে নির্ধারিত আবর্তন সম্পন্ন করার ভেতর দিয়ে যেন বিশ্ব প্রভুর বিধান মেনে গোলামী করে চলেছে। অপরদিকে পৃথিবী পৃষ্ঠে গাছ-পালা, তরুলতা থেকে শুরু করে এমনকি ক্ষুদ্র বালিকণাও তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তনে মুখরিত হয়ে আছে। প্রভুর পক্ষ থেকে প্রত্যেকেই গোলামীর যে বিধান লাভ করেছে– তাতেই তারা

পরিপূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আল্লাহ্‌র গোলামীর প্রাপ্ত বিধান ছাড়া যেন তারা আর কিছুই বুঝে না। আল্লাহ্‌র গোলামী তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে যেন নির্দিষ্ট এক অলঙ্ঘনীয় আইনে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ করেও তাদের সামান্যতম পরিবর্তন করা যাবে না। একমাত্র মানব সমাজ ও জীন জাতি ছাড়া সৃষ্টির সবাই প্রভুর পক্ষ থেকে প্রত্যেকের প্রতি নির্দিষ্ট করে দেয়া অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় এই গোলামীতে সদা-সর্বদা নিয়োজিত থেকে নিজেদের বিলীন করে দিচ্ছে। মানুষ এবং জীন জাতিকে এ ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, পুরস্কার এবং শাস্তির এক অবশ্যম্ভাবী কঠিন ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে। এদের মধ্যে যে বা যারা আকাশে দৃশ্যমান সূর্য, চন্দ্র, তারকাসহ পৃথিবীর গাছ-পালা, তরু-লতা এমনকি ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র বালিকণা পর্যন্ত যে বিধানের গোলামী করছে, সেই একই বিধান ও নির্দেশে সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র গোলামী মেনে নিয়ে প্রমাণ করে দেখাবে, তাদের গোলামী তিনি তাদের থেকে গ্রহণ করবেন এবং তাদেরকে অকল্পনীয় পুরস্কারে ভূষিত করবেন, তাই মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণেই এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন বিরাজমান।

৩২ ঃ ৫ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে অবহিত করেছেন যে, সমগ্র মহাবিশ্বটি তিনি একাই পরিচালনা করছেন। আকাশ জগতে যা যা আছে ও মানব সম্প্রদায় বসবাসরত এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুই তিনি সৃষ্টি করে এদের সার্বিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ একাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করে চলেছেন। প্রতিটি মুহূর্তে তার সার্বিক তত্ত্বাবধান এত নিখুঁত ও সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হচ্ছে যে মহাবিশ্বের অগণিত সৃষ্টি তাদের যে কোন প্রয়োজন পূরণে ফরিয়াদ পেশ করার পূর্বেই স্রষ্টার পক্ষ থেকে আপনাতেই পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সৃষ্টির পক্ষ থেকেই কোন অভিযোগ নেই, অভিমান নেই, নেই কোন প্রতিবাদ, এমন বিস্ময়কর ও তুলনাহীন স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

৩১ ঃ ১০ আয়াতে তিনি জানিয়েছেন– দৃশ্য-অদৃশ্য মিলে যে বিশাল মহাবিশ্ব তিনি সৃষ্টি করেছেন এর কোথাও কোন প্রকার খুঁটি বা স্তম্ভ রাখা হয়নি। খুঁটিবিহীনই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করে ভারসাম্য দান করা হয়েছে। মানব সমাজ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতেই এর সত্যতা দেখতে পাচ্ছে, মানব ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কেউ এ কথা দাবী করতে পারেনি যে, মহাবিশ্বের কোথাও কোন মহাজাগতিক বস্তুতে তারা খুঁটি দেখতে পেয়েছে, যে খুঁটির মাধ্যমে তাকে মহাশূন্যে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এমন কথা মানব সমাজ কখনো ঘুণাক্ষরেও শুনতে পায়নি এবং ভবিষ্যতেও এমনটি শুনার কোন সম্ভাবনাও নেই। মহান স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী সত্তা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামিনের এটি একটি বড় ধরনের কৃতিত্ব, যে কৃতিত্বের দাবীদার আর কেউ হতে পারে না এবং কারও পক্ষে এ কাজ কখনো করা সম্ভবও নয়। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে খুঁটিবিহীন মহাবিশ্বটি নিজে এবং এর ভেতরকার সমস্ত বস্তু সম্ভার কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে ভারসাম্য সৃষ্টি করে শূন্যের মধ্যে টিকে আছে?

৩৫ ঃ ৪১ আয়াতে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে সমগ্র মহাবিশ্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তাঁর মহাজ্ঞান ও মহাক্ষমতাবলে সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে একটি ইউনিট হিসেবে ভারসাম্যতা প্রদান করে টিকিয়ে রেখেছেন। ফলে স্থানচ্যুত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এগুলো যাতে স্থানচ্যুত না হয় সেজন্য তিনি সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সকল মহাজাগতিক বস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে বা রুটে পরিভ্রমণরত (গতিশীল) অবস্থায় রেখেছেন। এ ব্যাপারে ৩৬ ঃ ৪০ আয়াতে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, "প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে (Orbit) পরিভ্রমণরত"। অর্থাৎ সমগ্র মহাবিশ্বটি এবং এর ভেতরকার কোন বস্তুই স্থির নেই, সবাই গতিশীল। ফলে মহাবিশ্বটি যে তার নিজ অক্ষের উপর ভর করে প্রতিটি মুহূর্তে ঘূর্ণনরত অবস্থায় ভারসাম্য

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অধীনে চলেছে।" (১৪ ঃ ৩৩)
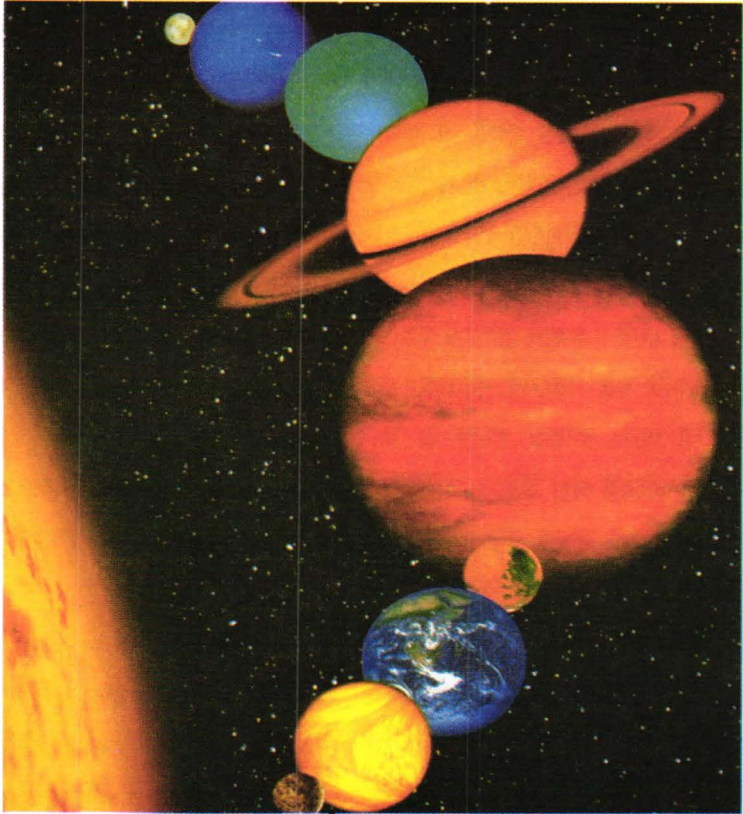
চিত্র-৪৯

–মহাকাশীয় বস্তু হিসেবে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহকেই আমরা আমাদের তুলনামূলক নিকটবর্তী দেখতে পাই। এই সুবাদে আমরা এদের উদয়-অস্ত ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকি। ফলে দৃশ্যমান উল্লেখিত মহাজাগতিক বস্তুগুলো যে প্রতিনিয়ত একই নিয়ম ও বিধানের অধীনে এক আল্লাহ্‌র নির্দেশমত পরিচালিত হয়ে পৃথিবীর মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করে চলেছে। তা আমরা আমাদের উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে পারছি এবং বিষয়টি অস্বীকার করছি না।

এখানে উল্লিখিত মহাকাশীয় বস্তুসমূহের নিজ নিজ কক্ষপথে একই নিয়মে, যা আল্লাহ শুরুতে তাদের নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে অনুযায়ী পরিভ্রমণ করাটাই হচ্ছে– আল্লাহর গোলামী করা।

"মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর উচ্চ প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" (১৭ : ৪৪)

চিত্র-৫০

–আমাদের সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটাই একক ইউনিট হিসেবে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার মধ্যে ভাসমান ও অক্ষের উপর ঘূর্ণায়মান। তাই মহাবিশ্বে বিরাজমান মহাজাগতিক সর্বপ্রকার বস্তু-ই ভাসমান ও চলমান। মূলত আল্লাহ্‌র নির্দেশমত তথা প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি মুহূর্তে আল্লাহ্ তাদেরকে যে গতি ও কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঠিক সেই গতি ও কক্ষপথে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে থেকে পরিচালিত হওয়া-ই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার গোলামী করা বা তাকে মান্য করে চলা এ গোলামী থেকে মহাসূক্ষ্ম বস্তু কণিকা এবং বিশাল বিশাল গ্যালাক্সিও বাদ পড়েনি। মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে সবাই একই গোলামীতে বাধ্য। এখানেই আল্লাহ্‌র কৃতিত্ব ভেসে উঠে।

সৃষ্টি করে টিকে আছে তা প্রকাশ পাচ্ছে। এটা আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও পক্ষেই এ কাজ এভাবে সম্পন্ন করা কখনই সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে ঘূর্ণনরত অবস্থায় গতিশীলতার মাধ্যমে টিকে থাকার যে বিধান দেয়া হয়েছে, এটা যথাযথভাবে মেনে চলে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখাই হচ্ছে– মহাবিশ্বটির একটি পূর্ণাঙ্গ ইউনিট হিসেবে আল্লাহ্‌র গোলামী করা বা আনুগত্য করা। আর এ গোলামী মহাবিশ্বটি প্রতিনিয়তই একাগ্রচিত্তে সম্পাদন করে চলেছে।

৫৩ ঃ ১ আয়াতে মহাবিশ্বের ভেতরকার সর্ববৃহৎ সংগঠন গ্যালাক্সি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গ্যালাক্সিগুলো মহাশূন্যে ভাসমান ও ঘূর্ণনরত অবস্থায় গতিশীল থেকে ভারসাম্য স্থাপন করে টিকে আছে, ধ্বংস হচ্ছে না এটাই হচ্ছে গ্যালাক্সিদের গোলামী, একমাত্র আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মতো মহাশূন্যে ভাসমান ও গতিশীল থেকেই গ্যালাক্সিগুলো– আল্লাহ্‌র আনুগত্য বা গোলামী পেশ করে এক পর্যায়ে শেষ পরিণতি হিসেবে ধ্বংস আর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে। এই একই বক্তব্য পাওয়া যায় ৮১ ঃ ১৫-১৬ আয়াত দু'টিতেও। "শপথ গ্যালাক্সিসমূহের, যারা গতিশীল অবস্থায় পশ্চাদগমনে রত এবং ভেসে বেড়ায় ও (এক পর্যায়ে) অদৃশ্য হয়ে যায়।" এতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে– মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় গ্যালাক্সিগুলো ভাসমান ও ঘূর্ণনরত অবস্থায় গতিশীল থেকে ভারসাম্য সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে তারই গোলামী তথা আনুগত্য করছে।

তারপর ১৫ ঃ ৮৫ আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সমগ্র মহাবিশ্ব এবং এর ভেতর যত প্রকার দৃশ্য বস্তু কিংবা অদৃশ্য বস্তু ও শক্তি রয়েছে এর কোন একটিও বিনা প্রয়োজনে অথবা অযথা সৃষ্টি করা হয়নি। প্রত্যেকটি সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টা হিসেবে তাঁর রয়েছে বিস্ময়কর

"তারা কি চায় আল্লাহ্‌র বিধান (গোলামী) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন বিধান মানতে? অথচ মহাবিশ্বব্যাপী যা কিছু আছে সমস্তই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ্‌র বিধান (গোলামী) মেনে নিয়েছে।" (৩ ঃ ৮৩)

চিত্র-৫১

-অতি সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব নিয়ে বিভিন্ন প্রকার গবেষণা করে। অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন যে আমাদের সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি একটি একক ইউনিট হিসেবে এখনও বিরাজমান আছে এবং সমগ্র কাঠামোটি নিজ অক্ষের উপর ভর করে Anti clockwise motion-এ ঘুরপাক খাচ্ছে। বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর। বর্তমান বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে আমাদের মহাবিশ্বের এখন ব্যাস প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। সুবহানাল্লাহ-আমরা কল্পনা করতেও দিশা হারিয়ে ফেলছি, এত বড় মহাবিশ্বের মূল কাঠামোও গোলামীতে বাধ্য হয়ে নিরবে নজরানা পেশ করে চলেছে। 'আল্লাহু আকবার'।

বহুমাত্রিক নিখুঁত পরিকল্পনা। ফলে একদিকে যেমন বস্তুগত চাহিদা পূরণ হচ্ছে, তেমনি অপরদিকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়মে কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে স্রষ্টার গোলামী ও আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা তারা প্রদর্শন করছে, যা অন্য সৃষ্টির জন্যও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উৎসাহ যোগাচ্ছে। তাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির এই মহাসমারোহের স্রোতধারায় একটি নগণ্য সৃষ্টিও অযথা বা অকারণে সৃষ্টি যে হয়নি তা বোধগম্য হওয়া এবং এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একমাত্র ব্যক্তি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মানব জাতি ও জীন জাতি তাদের পরকালীন জীবনে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সকল বাধা উৎরিয়ে যাওয়ার নিমিত্তে মহাবিশ্বে অন্যান্য সৃষ্টি কিভাবে একাগ্রচিত্তে শত সহস্র বছর থেকে এক আল্লাহ্‌র বিধান মেনে বিনা বাক্যে নিয়মিতভাবে গোলামী সম্পাদন করে যাচ্ছে, তা অনুকরণ করে নিজেদের ধন্য করে তোলাই হবে মানব জাতি ও জীন জাতির জীবনে সবচেয়ে বড় সফলতা অর্জন।

২৫ ঃ ৬১ আয়াতে আল্লাহ্ মানব জাতিকে অবহিত করছেন যে, তিনি মহাবিশ্বে বড় সংগঠন গ্যালাক্সিতেই স্থাপন করেছেন বস্তুজগতকে তথা আমাদের সৌরজগতকে; আলোকিত করার বাতি হিসেবে সূর্য ও আলো প্রতিফলনকারী হিসেবে চন্দ্র। যেহেতু প্রতিটি গ্যালাক্সিতেই আছে অসংখ্য জীবনময় গ্রহ, তাই তাদের আলোর প্রয়োজনেও বহু সংখ্যক নক্ষত্র ও উপগ্রহ (চন্দ্র) সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছামত তাদের গতি ও কক্ষপথ পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে স্থাপন করেছেন। ফলে তারা আল্লাহর বিধান মতো পরিচালিত হয়ে জীবনময় জগতগুলোর বিভিন্ন প্রকার চাহিদা প্রতিনিয়ত যথাযথভাবে পূরণ করে যাচ্ছে। তারপর ৩১ ঃ ২৯, ৩৬ ঃ ৩৮, ৫৫ ঃ ৫, ৩৬ ঃ ৪০, ১৬ ঃ ১২ ও ১৪ ঃ ৩৩ আয়াতগুলোতে সূর্য ও চন্দ্রের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক জানিয়েছেন যে, মানব জাতির প্রয়োজনে তিনি এদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা হিসেবে যে গতি ও কক্ষপথ এবং গতির দিক প্রথম দিন থেকেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই

গতি, দিক ও কক্ষপথ (Orbit) ঠিক রেখে এরা দীর্ঘকাল অবধি একইভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে পৃথিবীবাসীর সেবা করে যাচ্ছে। এরা কখনো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া এ বিধানের খেলাফ করছে না বা বিরোধিতা করছে না। যাকে যেভাবে স্থাপন করেছেন, সেভাবে তারা অহরহ একই নিয়মে স্রষ্টার গোলামী করে যাচ্ছে। নিয়মে কোনো রকম পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না।

উল্লিখিত সূর্য ও চন্দ্র ছাড়াও এ গ্যালাক্সিতে আছে আরো প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র ও তাদের সৌর পরিবার। ওরাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাকে যেভাবে যে গতি ও দিক এবং কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তারা সবাই সন্তুষ্টচিত্তে হুবহু তা মেনে নিয়ে গ্যালাক্সির ভেতর পরিভ্রমণে রত আছে। এক আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট করে দেয়া বিধান বা আইনের অধীনে নক্ষত্রগুলো তাদের জীবন পরিক্রমা (life cycle) সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার কারণেই গ্যালাক্সির ভারসাম্য সৃষ্টি হয়ে স্রষ্টার এক বিচিত্র সৃষ্টিরূপ ধারণ করে মহাবিশ্বের মহাশূন্যে বিস্ময়কর জ্ঞানের মোড়কে মানব সমাজের জ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। প্রকৃত জ্ঞানীরাও মহান স্রষ্টার এ সকল জ্ঞানময় নিদর্শন দেখে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে বার বার তাঁর গুণগান প্রকাশ করছে অবনত মস্তকে।

১৭ ঃ ৪৪ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, এ মহাবিশ্বের ভেতর ছোট-বড়, জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুই এক আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় নির্ধারিত নিয়মে সবাই স্রষ্টার বিধান মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর গুণগান প্রকাশ করছে। ওদের ঐ ইবাদত মানব সমাজ তেমন একটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে বলে এতে আবার স্রষ্টার প্রয়োজন কি? মহাজাগতিক বস্তুসমূহ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়ে আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই তো পরিচালিত হচ্ছে। স্রষ্টার উপস্থিতি ও তার প্রশংসা এখানে প্রয়োজন নেই। এভাবে মানব সমাজ-এর কিয়দাংশ বুঝতে না পেরে এক মহাসত্যের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। বস্তুতপক্ষে এটা তাদের জ্ঞানেরই স্বল্পতার স্বাক্ষর ছাড়া আর কি বা হতে পারে!

২০ ঃ ৫০ আয়াতে উপরে উল্লিখিত মূর্খ পণ্ডিতদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এ মহাবিশ্বে একমাত্র তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করে তাদের যথাযথ আকৃতি প্রদান করেছেন, অতঃপর তাদের জীবন নির্বাহের জন্য পথ, পদ্ধতি, সীমা, কার্যক্রম, সময়, গোলামীসহ শেষ পরিণতি ইত্যাদি সকল বিষয় তিনি নিজ থেকেই পরিকল্পনা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন সৃষ্ট বস্তু এগুলো নিজ থেকে নিজে নিজেই ইচ্ছা করে বাস্তবায়ন করার কোন প্রকার ক্ষমতা বা যোগ্যতা রাখে না। যারা মনে করে এরূপ, তারা মূলতই বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

১৫ ঃ ৭৫ আয়াতে আল্লাহ্ আরও বলেছেন যে, মূলত এসব বিষয় এমনই উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন যে, যাদের গবেষণা করে কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করার যোগ্যতা আছে, কেবল তারাই মূল রহস্য বুঝতে পারে। নতুবা মোটা মাথা ও স্থূল বুদ্ধির কারণে মানব সমাজের একাংশ জ্ঞানপূর্ণ উক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান না করেই ব্যাঙ্গোক্তির মাধ্যমে গুরুত্বহীন করে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, যা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয়। মানব সমাজের এ জাতীয় আচরণ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র সাথে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণেরই শামিল।

এরপর ২ ঃ ১৯৬ আয়াতে আল্লাহ্ সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মানুষেরা যেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত তাঁর পবিত্র ঘর 'বায়তুল্লাহ্'-র 'হজ্জ ও ওমরাহ' সম্পাদন করে। এ কাজটি তিনি মানব জাতির জন্য 'ফর্য' বা অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষের জন্য একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা এবং তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান মতে জীবনের সব কাজগুলো সম্পাদন করা, যত প্রকার ইবাদতের বর্ণনা এসেছে তার সবগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করা এবং জীবনে একবার হলেও সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে আল্লাহ্র ঘরের চারদিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) ৭ বার 'তোয়াফ' তথা প্রদক্ষিণ

'তোমরা আল্লাহর (মহাবিশ্বব্যাপী মহাজাগতিক একই বিধানের অধীনে গোলামীর) উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণ কর।" (২ ঃ ১৯৬)
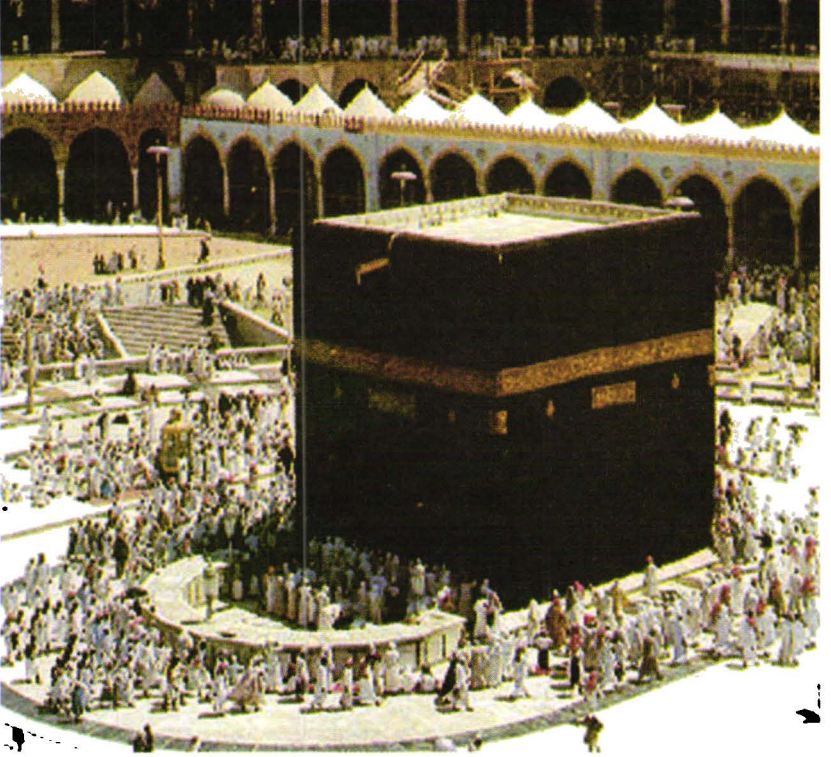
চিত্র-৫২

–আমাদের জানা মতে মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর সময়কাল থেকেই 'বায়তুল্লাহ'-র নির্মাণ শুরু হয়ে পবিত্র 'হজ্জ ও ওমরাহ্' নামক মানব জাতির জন্য সর্বোচ্চ ইবাদত পালিত হয়ে আসছে। আর যেদিন থেকে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম (আ) উক্ত গোলামী শুরু করলেন সেদিন থেকেই আজ পর্যন্ত একই নিয়মে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ইবাদত বা গোলামী প্রদর্শন করে চলেছে। এই ইবাদত আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ফরয' বা অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন। কারণ সৃষ্টির সেরা মানুষ যেন মহাবিশ্বের সবার সাথে শ্রেষ্ঠ কাজটি করে (Anti clockwise motion-এ আবর্তন করে) শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটিও লাভ করতে সক্ষম হতে পারে।

করার মাধ্যমে ইবাদতে সর্বোচ্চ গোলামীর নজরানা পেশের কাজটি 'বাধ্যতামূলক' হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র ঘর 'বায়তুল্লাহ্‌'-র চারদিকে কেন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) ৭ বার ঘুরপাক সম্পন্ন করতে হবে তার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে। ৩ ঃ ৯৬ ও ৯৭ আয়াত ২টিতে আল্লাহ্‌ মানব জাতিকে সংক্ষিপ্তাকারে অবহিত করেছেন যে, মক্কায় 'বায়তুল্লাহ্‌' নামক আল্লাহ্‌র ঘরটি এ পৃথিবী পৃষ্ঠে মানব জাতির জন্য তৈরী প্রথম ঘর। এ ঘরটিকে ঘিরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রহমত ও বরকত সবসময় অবতীর্ণ হচ্ছে। মানব জাতির জন্য এ ঘরটি একাধারে কল্যাণের প্রতীক হিসেবেই সর্বদা বিবেচিত হয়ে আসছে এবং মানব জাতিকে ঘরটি প্রতিনিয়ত সত্য ও ন্যায়ের পথই প্রদর্শন করে চলেছে। আবার অন্যদিকে অসংখ্য বিশ্ব নিয়ে যে মহাবিশ্ব সেই মহাবিশ্বে মহাসূক্ষ্ম কণিকা থেকে শুরু করে বড় বড় অনেক মহাজাগতিক বস্তুসমূহ আল্লাহ্‌র গোলামীর যে ধারা তারা প্রতিটি মুহূর্তে প্রদর্শন করছে, তারই হুবহু বাস্তব নমুনা এখানেও প্রদর্শিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত ঘরটিকে প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ঘরটি মানব সমাজের জন্য শুধু কল্যাণ আর বরকতময় এবং এ ঘরের চারদিকে তারা যে ৭ বার ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) আবর্তন করছে বা ঘুরপাক খাচ্ছে– ঠিক একই নিয়মে এ মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার বস্তু ও বিশ্বসমূহের অনেকেই মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে। আবার মহাসূক্ষ্ম কণিকার ভেতরের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় সেই একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র গোলামী প্রদর্শন করছে। যে কারণে ঘরটি বিশ্বজগতসমূহের জন্য আল্লাহ্‌র গোলামীর দিশারী হয়ে কাজ করছে। বস্তুত যে সঠিক দিশা দেয় বা সঠিকভাবে পথ দেখায় কিংবা সঠিক নিয়মটি দেখায়ে দেয়, তাকেই 'দিশারী' বলা হয়। সৃষ্টির সেরা মানব সম্প্রদায় অধ্যুষিত জীবনময় গ্রহ এ পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর 'বায়তুল্লাহ্‌'র চতুর্দিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের প্রদক্ষিণ

"মানুষের মধ্যে যার 'বায়তুল্লাহ' যাওয়ার সামর্থ্য আছে। আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ (চারদিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে অর্থাৎ Anti clockwise motion ৭ বার প্রদক্ষিণ) করা তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বিশ্বজগতের কারো মুখাপেক্ষী নন (ফলে প্রত্যাখ্যানকারী অবশ্যই এক কঠিন শাস্তি গ্রহণে বাধ্য হবে)।" (৩ ঃ ৯৬)
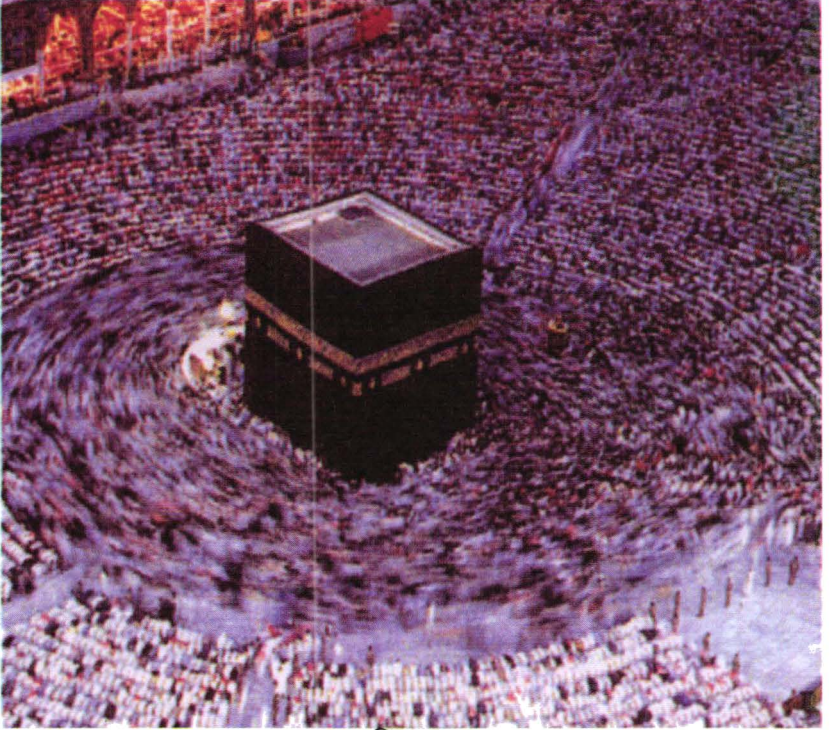
চিত্র-৫৩

–এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যখন কেউ বাইরে থেকে 'বায়তুল্লাহ'তে প্রবেশ করেন, তখন সর্বপ্রথম তাকে যে কাজটি করতে হয় তাহলো বায়তুল্লাহর চারদিকে ৭ বার Anti clockwise motion-এ ঘুরপাক খেতে হয় বা আবর্তন সম্পন্ন করতে হয়। এ কাজটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো যে, সমগ্র মহাবিশ্বে মহাসূক্ষ্ম কণিকা থেকে বৃহৎ গ্যালাক্সি পর্যন্ত সর্বত্রই আল্লাহ তাঁর গোলামীকে Anti clockwise motion-এ রূপ দিয়েছেন বিধায় আর তাই সবকিছু ফেলে রেখে সর্বপ্রথম এই আবর্তন সম্পন্ন করতে হয় মানুষকে। আশ্চর্য হবার মত নয় কী?

"যদি কেউ ইসলাম (আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া গোলামী) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন বিধান মেনে চলে তাহলে তার কাছ থেকে ঐ বিধান (গোলামী) গ্রহণ করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (৩ ঃ ৮৫)

"আল্লাহর বিধানে (গোলামীতে) পরিবর্তন দেখতে পাবে না।" (৪৮ ঃ ৮৫)
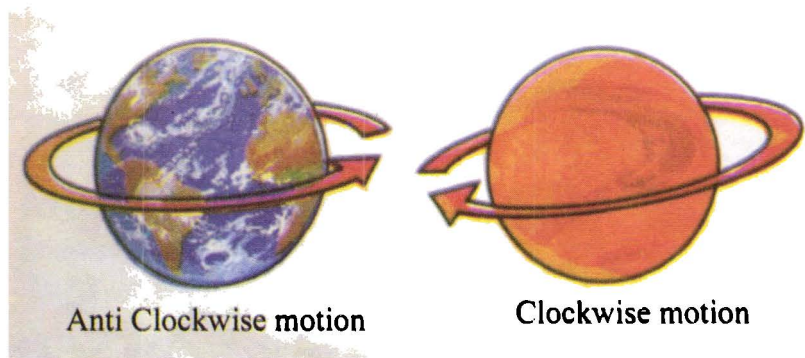
চিত্র-৫৪

–আমরা কালেমাতেও প্রথমে দেখতে পাই 'নেতিবাচক কথা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। যেমন– 'নেই কেউ' এরপর বলা হয়েছে– 'আল্লাহ ছাড়া 'ইলাহ'। ঠিক একইভাবে তাঁর খাঁটি গোলামীর ব্যাপারেও 'ইতিবাচক' Clockwise motion-কে গুরুত্ব না দিয়ে 'নেতিবাচক' Anti clockwise motion-কে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সম্ভবত এ সিদ্ধান্তের ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র এক ও একক সত্তাকে অতুলনীয় করে সর্বত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে রাখতে চেয়েছেন। সুবহানাল্লাহ।

পদ্ধতিটি আল্লাহ্‌র ইবাদত বা গোলামীর কিংবা আনুগত্যের সর্বোচ্চ নিদর্শন বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা মহাবিশ্বে বিরাজমান অন্যান্য বিশ্বে এবং বড় বড় মহাজাগতিক কাঠামোতে বা সংগঠনেও তা হুবহু ও যথাযথভাবে সম্পাদনে বাধ্য করেছেন। মানব সমাজে যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকেও জীবনে একবার হলেও মক্কায় গিয়ে স্বশরীরে 'বায়তুল্লাহ্'কে কেন্দ্র করে ৭ বার ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, এতে মহাবিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বড় বস্তু এবং বিষয়গুলো আল্লাহ্‌র গোলামী করার সাথে সৃষ্টির সেরা মানব সম্প্রদায়েরও আল্লাহ্‌র গোলামীর একটি বড় অনুষ্ঠান মিলে মিশে একাকার হয়ে একাত্মতা ঘোষণা করছে এবং আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সমগ্র মহাবিশ্বে একযোগে ঘোষিত হচ্ছে– আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ অতি পবিত্র সত্তা। সুবহানাল্লাহ্!

মহাজাগতিক বস্তুগুলোর সাথে মানব সম্প্রদায়ের অভিন্ন গোলামীর এই যে মিলন মেলা বা সমন্বয়, তা মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট অতি মর্যাদাপূর্ণ ও গর্বের বিষয় বিধায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উল্লিখিত 'Anti clockwise motion'কেই তাঁর গোলামীর একটি বড় বিধান হিসেবে তাঁর এ সৃষ্টিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং মহাসূক্ষ্ম থেকে বৃহৎ সকল পর্যায়ে অন্তত এই একটি অভিন্ন মৌলিক গোলামীর বেল্টে সবাইকে একযোগে বেঁধে ফেলেছেন। যার কোনো প্রকার পরিবর্তন আজ পর্যন্ত না আকাশ জগতে মহাজাগতিক বস্তুদের বেলায় ঘটেছে আর না মক্কায় অবস্থিত 'বায়তুল্লাহ্'র বেলায় ঘটেছে। এটা অসম্ভব, অকল্পনীয় ও অলঙ্ঘনীয় চিরসত্য (Universal truth) এক বাস্তবতা। মানব সমাজে যদি কেউ এই 'Universal truth'-কে অমান্য করে 'বায়তুল্লাহ্'র ৭ বার 'Anti clock-wise motion'-এর প্রদক্ষিণকে অস্বীকার করে, তাহলে তার জানা থাকা দরকার যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নগণ্য মানুষ হয়ে সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী তাঁর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী একটা প্রতিষ্ঠিত গোলামীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে

চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ও হঠকারিতামূলক আচরণ প্রদর্শন তাকে কখনই সাফল্য দান করবে না। এজন্য তাকে এক কঠিন শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। মহান আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তি থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। বরং সমগ্র মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার সমস্ত কিছুই একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। এ মহাসত্যটি যতদ্রুত মানব মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে, মানব সমাজ ততো দ্রুতই প্রকৃত কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবে।

এরপর ৩ ঃ ৮৩ আয়াতে আল্লাহ্‌ মানব জাতির সম্মুখে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এই বলে যে, মানুষ কি তাদের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্‌র সেই মহাসত্য বিধান ছেড়ে অন্য কারো বিধান মানতে চায়? যদি চায় তো কার বিধান মানতে চায়? অথচ এক আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান তো মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বস্তু ও বিষয়াবলীতে ঘুণাক্ষরেও মানা হয় না। একমাত্র মানুষ ও জীনদের কিয়দাংশ ছাড়া মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার বস্তু ও শক্তি সবাই তো একমাত্র আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান ও নিয়ম-কানুনকে নিজেদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মকভাবে মেনে নিয়ে তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। আর এজন্যই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে একযোগে চেষ্টা সাধনা করেও মহাজাগতিক কোনো একটি নিয়মেরও পরিবর্তন ঘটাবার ক্ষমতা তারা রাখে না। এটি অসম্ভব ও অবাস্তব একটি বিষয়। এ মহাবিশ্বের সবাই একযোগে আল্লাহ্‌র বিধান তথা তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশিত নিয়মকেই আঁকড়ে ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে একমাত্র তাঁরই গোলামী নিবেদন করে যাচ্ছে।

অতঃপর ৩ ঃ ৮৫ আয়াতে আল্লাহ্‌ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, মানব সম্প্রদায়ের মধ্য হতে যদি কেউ মহাবিশ্বে সর্বত্র দৃশ্যমান আল্লাহ্‌র বিধান যা কার্যত সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত, তা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো অবাঞ্ছিত বিধান বা নিয়ম মেনে চলে, তাহলে আল্লাহ্‌ তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করবেন না। ফলে সে অধঃপতিত অবস্থায় জাহান্নামের

অগ্নিময় কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। সকল প্রকার কল্যাণের পথ তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। বস্তুত সমগ্র মহাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্র এক অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর মহাগোলামীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে মানুষ কখনই কল্যাণের অধিকারী হতে পারে না।

৪৮ ঃ ২৩ আয়াতে তিনি নিশ্চিত করে বলেছেন যে, তাঁর ঘোষিত যে কোনো বিধানই অপরিবর্তনীয়। তাতে কখনও পরিবর্তন দেখা যাবে না। এটা চিরসত্য এক ঘোষণা।

সর্বশেষ উদ্ধৃত ৭৮ ঃ ৩৯ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মহাবিশ্বব্যাপী মহাজাগতিক বিশাল বিশাল বস্তুতে ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বালিকণা পর্যায়ে আল্লাহ্ যে বিধান ও গোলামী কার্যকর করেছেন, সেই একই নিয়ম মেনে নিয়ে মানব সম্প্রদায়ও এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে, প্রকৃত কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারে, আবার তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বিদ্রোহিতার পথে, অকল্যাণ ও ধ্বংসের পথেও পা বাড়াতে পারে। এটা তার ইচ্ছার স্বাধীনতা যা আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন। তবে বিদ্রোহিতা বা অস্বীকৃতির জন্য তাকেও অগ্নিময় কঠিন শাস্তি গ্রহণ করার জন্য তৈরী থাকতে হবে। যা থেকে কোনভাবেই তারা পরিত্রাণ পাবে না। এটা চূড়ান্ত ও শেষকথা।

উৎকর্ষিত জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান বিজ্ঞানের এতদসংক্রান্ত আবিষ্কার আর উদঘাটন পর্যালোচনার পূর্বে আমরা উপরের আলোচনায় যে মূল পয়েন্টটি লাভ করেছি তা সংক্ষিপ্তাকারে হলেও তুলে ধরতে চাই। এতে পাঠক সমাজ অবশ্যই লাভবান হবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মানব সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে আল-কুরআন জীবনে একবার হলেও মক্কায় আল্লাহ্র ঘর 'বায়তুল্লাহ'কে ৭ বার ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) প্রদক্ষিণ করার যে নির্দেশ প্রদান করেছে, তার পেছনে যে মহাসত্যটি লুকিয়ে রয়েছে তা হলো– আমাদের এ মহাবিশ্বটি সর্বমোট ৭টি স্তর বা ধাপ বা পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে অস্তিত্ব ধারণ করেছে। কুরআনের বহুস্থানে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন

(আমাদের পরবর্তী খণ্ডগুলোতে ৭টি আকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে, ইন্‌শাআল্লাহ্) । উক্ত ৭টি স্তরের প্রতিটিতে মহাজাগতিক বস্তুগুলো একমাত্র মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌র-ই বিধান ও নির্দেশিত নিয়ম মেনে নিজেদের লাইফ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে বিধায় তিনি সৃষ্টির সেরা মানব সম্প্রদায়কেও তাই মাত্র ৭ বার তাঁর ঘর প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে সপ্তাকাশের সম্মিলিত আবর্তন ও প্রদক্ষিণ নামক 'আল্লাহ্‌র গোলামীর' মর্যাদায় ভূষিত করতে চেয়েছেন । যাতে এককভাবে অন্য কেউ মানুষের সমমর্যাদায় অভিষিক্ত হতে না পারে । বরং সৃষ্টির সেরা মানুষই কেবল যেনো এককভাবে এক আল্লাহ্‌র গোলামীর ব্যাপারে মর্যাদায় সবার উপরে অবস্থান করতে পারে । আর কেবল তাহলেই তার জন্য সৃষ্টির সেরা পদবীটি ধরে রাখা সম্ভবপর হবে । এটা মানব জাতির প্রতি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক এক মহাঅনুগ্রহ, যার প্রতিদান সমগ্র মানব জাতি একযোগে চেষ্টা করেও কখনোই আদায় করতে সক্ষম হবে না ।

আর মানব জাতি যদি সমস্ত সৃষ্টিকুলকে সত্যিকার অর্থেই উল্লিখিত গোলামীর দিক থেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ছাড়িয়ে যেতে না পারে, তাহলে একমাত্র তারাই অফুরন্ত নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে যাবেই বা কেমন করে? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ সৃষ্টি এই মানব সম্প্রদায়কে তাই বিশেষ করুণা করেই গোলামীর প্রতিদানের শীর্ষ স্থানটি এককভাবে দান করার জন্যই মক্কায় 'বায়তুল্লাহ্'কে ৭ বার ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion এ) আবর্তন বা প্রদক্ষিণ করা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ।সুবহানাল্লাহ, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ ।

'একই নিয়মে গোলামী' অধ্যায়ে আল-কুরআন থেকে এতটুকু আলোচনার পর এবার আমরা একই বিষয়ে মহাবিশ্ব নিজে এবং মহাবিশ্বে মহাজাগতিক কণিকা ও বস্তুসমূহ প্রকৃতপক্ষে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) আবর্তন বা প্রদক্ষিণের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র গোলামী করছে কিনা, তা বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটিত ও আবিষ্কৃত তথ্য দ্বারা যাচাই করতে চাই । চলুন তাহলে!

বিজ্ঞান

সুধী পাঠক! মানব সমাজের মধ্যে আমরা যারা বর্তমান সময়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে জীবন নির্বাহ করে চলেছি, তারা প্রকৃত অর্থেই ভাগ্যবান। কেননা আমাদের পূর্বে যারা প্রস্থান করেছেন তারা আমাদের মতো মহাবিশ্ব সম্পর্কে এতো অধিক জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি। যদিও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমান প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীগণ অনুমান করছেন যে, 'Big Bang' বিন্দুতে মহাবিস্ফোরণের পর আমাদের এ মহাবিশ্বে প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের মূল কাঠামো তৈরী করে। গ্যালাক্সিগুলো সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে ভাসমান ও চলমান হয়ে অনবরত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গতিতে মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণের কারণে। এতে মহাবিশ্বটি একক পূর্ণাঙ্গ কাঠামো হিসেবে সম্প্রসারিত হয়ে যে গোলাকার আকৃতি লাভ করেছে বিজ্ঞানীগণ তার আনুমানিক হিসাব কষে জানিয়েছেন যে, তার ব্যাস হবে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ। অর্থাৎ মহাবিশ্বটি বর্তমানে মহাশূন্যে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাস ব্যাপী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। 'Big Bang' থিউরী প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর বিজ্ঞানবিশ্ব উল্লিখিত বিষয়ে মোটামুটিভাবে একমত পোষণ করছে।

অতি সম্প্রতি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীগণ এ মহাবিশ্বের আরো বিস্ময়কর তথ্য মানব সমাজকে উপহার দিয়েছেন, আর তা হলো– তাদের বেশ কিছু পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে অনুমিত হচ্ছে সমগ্র মহাবিশ্বটি একটি একক ইউনিট হিসেবে নিজ অক্ষের উপর প্রতিনিয়ত ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। যতদিন মহাবিশ্বটি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস না হবে ততদিন পর্যন্ত তার এই ঘূর্ণনও যে চলতে থাকবে তা এক প্রকার নিশ্চিত সত্য বিষয়।

দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য ও ছবির আলোকে দেখা যায় মহাবিশ্ব একক বিশাল কাঠামোর পরে মহাবিশ্বের ভেতরে বড় সংগঠন হচ্ছে গ্যালাক্সিসমূহ। বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি দিয়ে আমাদের মহাবিশ্বটি সাজানো। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আছে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র (Star) এবং তাদের পরিবার গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, নেবুলাসহ অগণিত পাথর খণ্ড। এক একটি গ্যালাক্সি মহাশূন্যে প্রায় ১০০,০০০ (এক লক্ষ) আলোকবর্ষ ব্যাপী জায়গা দখল করে বিস্তৃত হয়ে আছে। আমাদের মাতৃ-গ্যালাক্সির নাম 'মিলকি-ওয়ে' গ্যালাক্সি (Milky way-galaxy)। এতে আছে ঝাঁক বেঁধে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র। আমাদের সূর্যটি এদেরই একটি নক্ষত্র। বিজ্ঞানীদের উদ্‌ঘাটিত তথ্য অনুযায়ী আমাদের মিলকি-ওয়ে গ্যালাক্সিটি আজ থেকে প্রায় আট'শ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল। তখন এর আকৃতি এমনটি ছিলো না। মাঝ পথে বেশ কয়েকটি গ্যালাক্সির সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে নিজ আকৃতির কলেবর বৃদ্ধি করে বর্তমান আকৃতি ধারণ করে। সৃষ্টির পর থেকেই মহাজাগতিক নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে মহাকাশে ভাসমান ও ঘূর্ণনরত অবস্থায় আবার চলমান আমাদের এ গ্যালাক্সিটিও। বর্তমানে প্রতি সেকেণ্ডে গ্যালাক্সিটি প্রায় ৬০০ কিলোমিটার গতিতে আমাদের সবাইকে নিয়ে উড়ে অর্থাৎ প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র সমষ্টি বুকে ধারণ করে মহাবিশ্বের প্রান্তসীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্নভাবে বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, আমাদের এই 'মিলকি-ওয়ে' গ্যালাক্সিটি (Milky way galaxy) মহাকাশের মহাশূন্যতায় সম্পূর্ণ ভাসমান অবস্থায় ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clock-wise motion-এ) ঘুরপাক খেতে খেতে উড়ে যাচ্ছে। প্রথমদিন থেকে আজ পর্যন্ত গ্যালাক্সির এ আবর্তন বা প্রদক্ষিণে ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও কোনো প্রকার ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন ঘটার কোনো সম্ভাবনাও বিজ্ঞানীগণ দেখতে পাচ্ছেন না। সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের মতো আমাদের সংশ্লিষ্ট

"তারা কি সমগ্র মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনার দিকে তাকায় না এবং তাদের প্রতি যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন?" (৭ : ১৮৫)

"তিনি (আল্লাহ্) সমগ্র মহাবিশ্বের সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।" (৩২ : ৫)
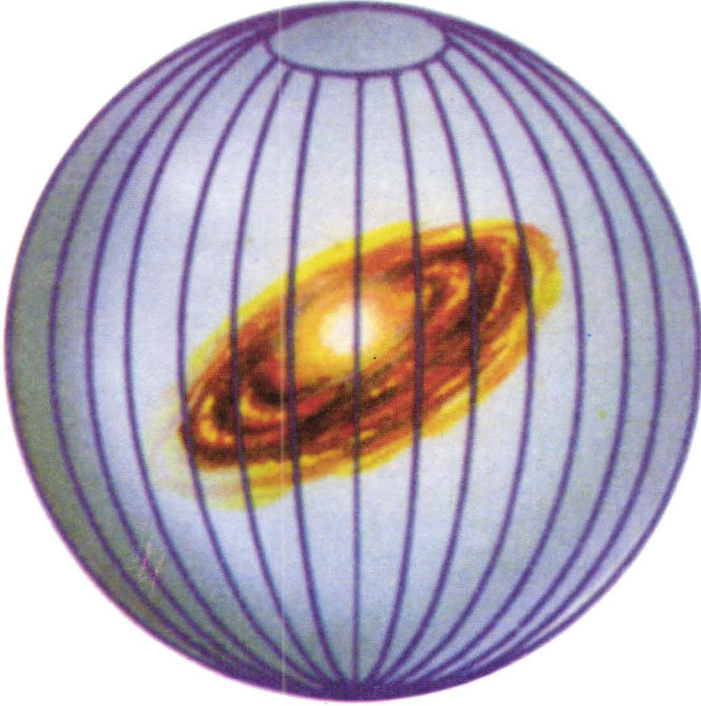
চিত্র-৫৫

প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া আমাদের এ মহাবিশ্বটি প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে নিজ অক্ষের উপর ভর করে মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তার মধ্যে প্রতিনিয়ত Anti clockwise motion-এ ঘুরপাক খাচ্ছে। বর্তমান বিজ্ঞান এ তথ্য সরবরাহ করছে। মহান আল্লাহ্ সকল সত্তার ধারক বিধায় সমগ্র মহাবিশ্বটি তিনি তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে সৃষ্টি করে তিনিই তা ধারণ করে আছেন। তাঁর আসনটি সমগ্র মহাবিশ্ব ছেয়ে আছে। সৃষ্ট সমগ্র মহাবিশ্বের একক কাঠামোকে তাঁর গোলামী করার জন্য তিনি Anti clockwise motion-কেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তাঁকে কোন প্রশ্ন করা যায় না। আল্লাহ্ মহান। আল্লাহ অতি পবিত্র সত্তা (সুবহানাল্লাহ)।

'আল্লাহ্ নিজে মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করেন, যাতে তা স্থানচ্যুত না হয়। 'মহ-াবিশ্ব স্থানচ্যুত হলে আল্লাহ্ ছাড়া কে তাকে সংরক্ষণ করবে?" (৩৫ : ৪১)
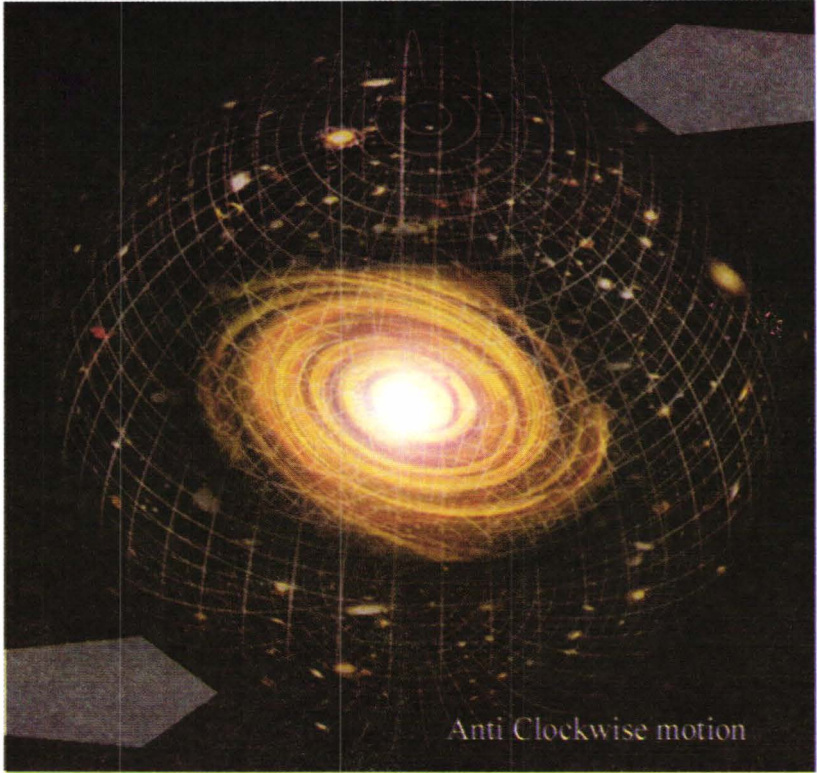
চিত্র-৫৬

—উপরের আয়াতটিতে (৩৫ : ৪১) আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি নিজে তাঁর সৃষ্ট এ বিশাল মহাবিশ্বকে বিশেষ ব্যবস্থায় একটি কাঠামো হিসেবে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে গতি দান করে টিকে থাকার ব্যবস্থা করেছেন, আর মহাবিশ্বটি ঠিক সেভাবেই ঘুরপাক খেয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহর নির্দেশমত তাঁরই গোলামী করছে। আল্লাহ্র সৃষ্টির ভেতর সর্ববৃহৎ কাঠামো মহাবিশ্বের আর সবচেয়ে ক্ষুদ্র কাঠামো পরমাণুর ভেতরও ইলেক্ট্রনকে Anti clockwise motion-এ ঘুরপাক খেয়ে তাঁর নির্দেশমত গোলামীর ব্যবস্থা করেছেন। এ সকল তথ্য আজ প্রমাণিত সত্য।

এই গ্যালাক্সির 'Anti clockwise motion' উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে মানব সমাজে কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে এক অবিশ্বাস্য আবেগে, যা আমরা আলোচনার শেষের দিকে বলার প্রয়াস পাবো ইন্‌শাআল্লাহ্ ।

তৃতীয়ত বর্তমান চরম অগ্রগতিসম্পন্ন বিজ্ঞানবিশ্ব আমাদের সূর্য কেন্দ্রিক এই সৌরজগত সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা হলো– প্রায় ৮৬ লক্ষ মাইল ব্যাসের সূর্যটি মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস (৭৫%) এবং হিলিয়াম (২৫%) দ্বারা পরিপূর্ণ একটি গ্যাসীয় পিণ্ড । 'সূর্য' নামক এ নক্ষত্রটি নিজ মেরুদণ্ডের উপর ভর করে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১০টি গ্রহ, প্রায় ৫০টি উপগ্রহ, অসংখ্য পাথর খণ্ড ও অগণিত ধুমকেতু (Comet) কে সাথে নিয়ে মহাশূন্যে পরিভ্রমণের মাধ্যমে তার 'লাইফ সাইকেল' (Life cycle) চালিয়ে যাচ্ছে । এ কাজটি করতে গিয়ে সূর্যকে একই সাথে দু'টি কাজ করতে হচ্ছে গতিশীল অবস্থায় । একটি কাজ হচ্ছে– নিজ অক্ষের উপর ভর করে প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খেতে হচ্ছে এবং অপরটি হচ্ছে গোটা সৌরপরিবারসহ ছুটে গিয়ে সম্পূর্ণ গ্যালাক্সির ভেতর পরিক্রমণ করতে হচ্ছে । এর একটিকে বলা হয় 'আহ্নিক গতি' এবং অপরটিকে বলা হয় 'বার্ষিক গতি' । মূলত উল্লিখিত গতি দু'টিই একদিকে সূর্যকে তার অস্তিত্বের উপর টিকিয়ে রেখেছে, আবার অপরদিকে সৌরপরিবারকেও তার সাথে টিকে থাকতে সাহায্য করছে । কখনো কোনো কারণে সূর্যের উল্লিখিত গতির মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সূর্য নিজে যেমন বিপর্যস্ত হবে তেমনি সমগ্র সৌরপরিবারও বর্তমান অবস্থা হারিয়ে ধ্বংসের মধ্যে তলিয়ে যাবে । বিগত প্রায় সাড়ে চারশ (৪৫০) কোটি বছর ধরে সূর্য এ একই নিয়মে তার আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির শৃঙ্খলাপূর্ণ ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে বিধায় সূর্য কিংবা সৌরপরিবারে তেমন কোন বিশৃঙ্খলা ঘটছে না । এতে প্রমাণ হচ্ছে সূর্যের আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি তার একটা মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।

"কত মহান তিনি, যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন গ্যালাক্সি এবং তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। (২৫ : ৬১)

চিত্র-৫৭

–আমাদের এ মহাবিশ্বে মহাবিশ্বের নিজের একক বিশাল কাঠামোর পর বড় সংগঠন বা কাঠামো হচ্ছে– গ্যালাক্সিদের, এক একটি গ্যালাক্সির ব্যাস গড়ে এক লক্ষ আলোকবর্ষ এবং প্রতিটি গ্যালাক্সিতে রয়েছে গড়ে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র সমষ্টি। এত বিশাল গ্যালাক্সিও মহান স্রষ্টা আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া গতি ও কক্ষপথ যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলছে।

আমাদের মাতৃ-গ্যালাক্সি 'মিলকি-ওয়ে' প্রায় ৬০০ কি:মি: গতিতে ছুটে চলার পথে আবার Anti clockwise motion-এ ঘুরপাক খেতে খেতে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে চলেছে। কি সুন্দর আল্লাহর গোলামীর নমুনা।

"সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে (নির্দিষ্ট করে দেয়া নিয়মে গোলামী করে) নির্ধারিত কক্ষপথে।" (৫৫ : ৫)
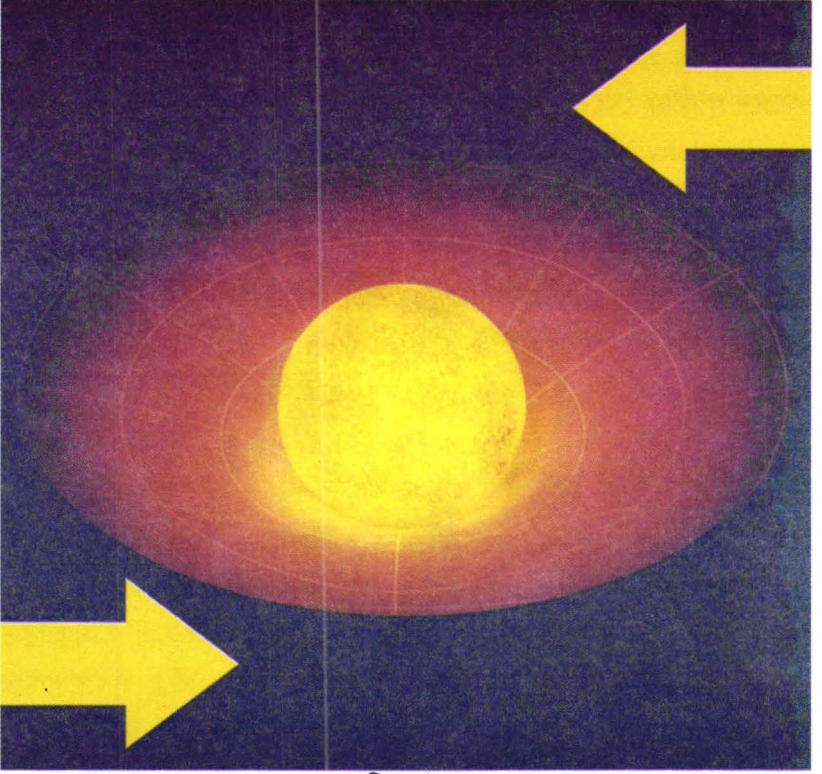
চিত্র-৫৮

–আমাদের সূর্যটি গ্যালাক্সির ভেতর ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি মধ্যম আকৃতির নক্ষত্র। এর ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৮৬ লক্ষ মাইল। এর ভেতর ৭৫% হাইড্রোজেন গ্যাস ও ২৫% হিলিয়াম গ্যাস মওজুদ রয়েছে। সূর্যটি নিজ মেরুদণ্ডের উপর ভর করে Anti clockwise motion-এ ঘুরপাক খেয়ে নিজ কক্ষপথের উপর নিজকে সামাল দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে, উফল্লখিত গতিকে সূর্যের আহ্নিক গতি বলে। আল্লাহ্ তা'আলা বিশাল গ্যালাক্সিকে যে ঘূর্ণন গতি দান করলেন সেই একই গতি 'Anti clockwise motion' এই প্রকাণ্ড সূর্যকেও দান করলেন।

প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী Anti clockwise motion কেই এ ক্ষেত্রে তাঁর গোলামীর জন্য বাছাই করেছেন, যা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

বর্তমান বিজ্ঞানী সমাজ পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দির থেকে টেলিস্কোপের সাহায্যে, আবার পৃথিবীর প্রায় ৬০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে স্থাপিত 'হাবল স্পেস টেলিস্কোপ' এবং একাধিক সূর্য কেন্দ্রিক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে– সূর্যটি তার আহ্নিক গতির কারণে ঘুরপাক খেতে গিয়ে প্রতিনিয়তই ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti colckwise motion-এ) ঘুরছে। সূর্য তার সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই ঐ একই নিয়ম মেনে চলছে, যার কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বিজ্ঞানীগণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আরও লক্ষ্য করেছেন যে, সূর্যটি তার সমগ্র সৌরপরিবারকে সাথে নিয়ে বার্ষিক গতির কারণে পরিভ্রমণ করতে গিয়ে 'মিলকি-ওয়ে গ্যালাক্সি'র ভেতর এ পর্যন্ত প্রায় ২৫ বার পরিক্রমণ সম্পন্ন করেছে এবং এ পরিক্রমণও ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti colckwise motion-এ) সম্পন্ন হচ্ছে। এ গতিরও আজ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

বিজ্ঞানীগণ মহাকাশে বস্তুদের ভাসমান ও চলমান ঐ সকল গতিসমূহের ব্যাপারে বলেছেন যে, যে আইনে তারা পরিচালিত হচ্ছে তাকে 'Universal law' বলা হয়, যা এক অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা, যে ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা দেখা যায়, প্রমাণ পাওয়া যায়, ধারণা লাভ করা যায়– কিন্তু ব্যবস্থাপককে কখনো দেখা যায় না। অথচ আইনটি নির্ভরযোগ্য এবং বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করে কখনও আইনটির পরিবর্তন ঘটানো যায় না।

অতএব, উপরের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে– আমাদের সৌরপরিবারের সর্ববৃহৎ সদস্য ও কেন্দ্র ঐ লাল সূর্যটি তার জন্মলগ্ন থেকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে একদিকে যেমন নিজ অক্ষের উপর ঘুরপাক খেতে গিয়ে 'ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিকে' (Anti clockwise motion কে) অনুসরণ করছে আবার তেমনি সমগ্র গ্যালাক্সিকে প্রদক্ষিণ করতে গিয়েও ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতির (Anti clockwise motion) নিয়ম মানছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে– আমাদের এ সৌরপবিবারের কেন্দ্র সূর্যটির উপর Anti colckwise motion এক কঠিন মহাকাশীয় মৌলিক আইনে পরিণত

"(মহাশূন্যে) ভাসমান অবস্থায় সবাই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণে ব্যস্ত।" (৩৬ : ৪০)
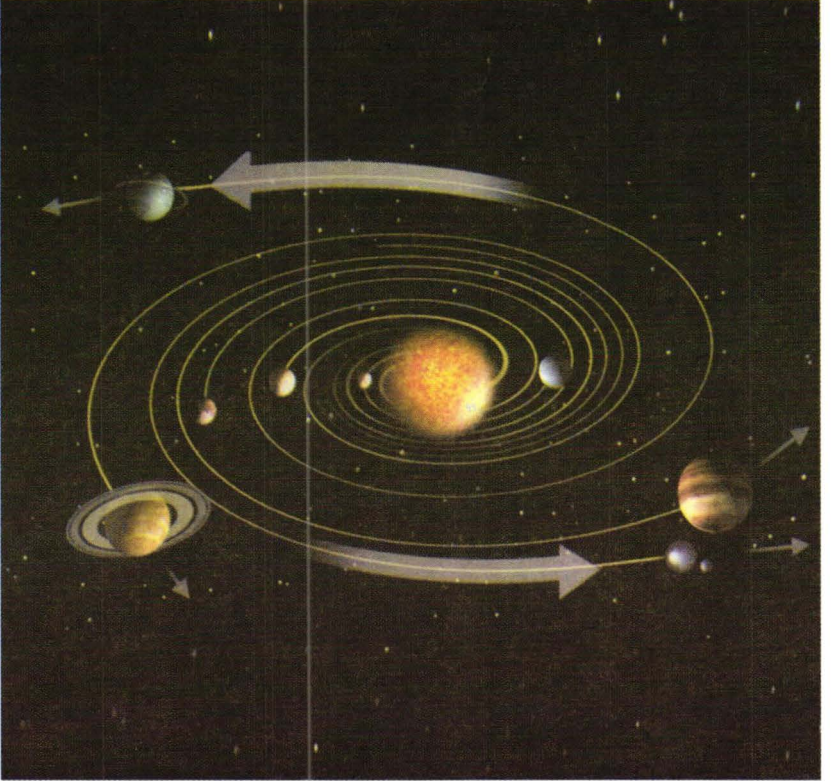
চিত্র-৫৯

– 'মিলকি-ওয়ে' গ্যালাক্সির ভেতর প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্রের মধ্যে অধিকাংশ নক্ষত্রেরই আছে গ্রহপরিবার। আমাদের সূর্যটি তাঁর পরিবারের প্রায় ১০টি গ্রহ ও ৫০টির মতো উপগ্রহ সবই অসংখ্য ধূমকেতু ও গ্রহাণু এবং নেবুলা নিয়ে গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে 'anti clockwise motion'-এ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২৫০ মাইল গতিতে পরিভ্রমণ করছে বলে বিজ্ঞান তার সর্বশেষ পর্যবেক্ষণে মানব জাতিকে অবহিত করেছে। এভাবে গ্যালাক্সির ভেতর পরিভ্রমণ করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত মোট প্রায় ২৫ বার পূর্ণ পরিভ্রমণ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

হয়েছে। যা সর্বদা একই নিয়ম মেনে চলতে সূর্য নামক এ নক্ষত্রটি বাধ্য হচ্ছে।

চতুর্থত বিজ্ঞানীগণ আমাদের সৌরপরিবারের সক্রিয় সদস্য গ্রহগুলোর ব্যাপার উদ্‌ঘাটন করতে গিয়েও 'Anti clockwise motion'-এর ব্যাখ্যা উন্মোচন করেছেন, তারা টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহগুলোকে নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, আবিষ্কৃত ১০টি গ্রহের প্রায় সব কয়টি গ্রহ-ই সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে আবর্তন করতে গিয়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) ছুটে চলেছে। এ সৌরজগতের সৃষ্টি হওয়ার প্রথম দিন থেকেই গ্রহগুলো এ গতি লাভ করে আজ অবধি একই নিয়ম মেনে চলেছে। কখনো তারা এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন ঘটায়নি। সবাই যেনো একই নিয়ম মেনে চলে এককভাবে নির্দিষ্ট কারো আনুগত্য প্রকাশ করে চলেছে।

আমাদের এ পৃথিবীটি উল্লিখিত আবিষ্কৃত ১০টি গ্রহের মধ্যে একমাত্র জীবনময় আবাস যোগ্যতায় ধন্য অসংখ্য প্রাণের সমারোহে পরিপূর্ণ। আমরা মানুষ জাতি ও জীন জাতি পার্থিব জীবনের ব্যাপারে জবাবদিহিতার জালে আবদ্ধ। আমাদের পদভারে এ পৃথিবী ধন্য। বিজ্ঞান উদ্‌ঘাটন করে আমাদের দেখিয়েছে যে আমাদের এ পৃথিবীটাও সূর্যকে 'Anti colckwise motion'-এ প্রদক্ষিণ করার সাথে সাথে নিজ অক্ষের উপরও প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) পূর্ণ একবার ঘূর্ণন সমাপ্ত করছে। পৃথিবীর এ ঘূর্ণনের কারণেই দিন রাত্রির পরিবর্তন ঘটছে। পৃথিবীর এ গতি অর্থাৎ আহ্নিক গতি যদি 'Anti clockwise motion' না হয়ে 'Clockwise motion' হতো তালে পৃথিবীবাসীর ভোর শুরু হতো পশ্চিম দিক থেকে, অর্থাৎ সূর্য উদয় হতো পশ্চিম দিকে এবং সূর্যাস্ত যেতো পূর্ব দিকে। পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই 'Anti clockwise motion' মেনে অদ্যাবদি সেই নিয়মেই তার প্রতিদিনের রুটিন মাফিক কাজ সম্পাদন করে চলেছে। কোনো রকম পরিবর্তন তাতে ঘটছে না।

"এ ব্যবস্থা (নির্দিষ্ট গতি ও কক্ষপথে আবর্তন) মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে আরোপিত যা একাধারে বিস্ময়কর ও অলজ্ঘনীয়।" (৩৬ : ৩৮)
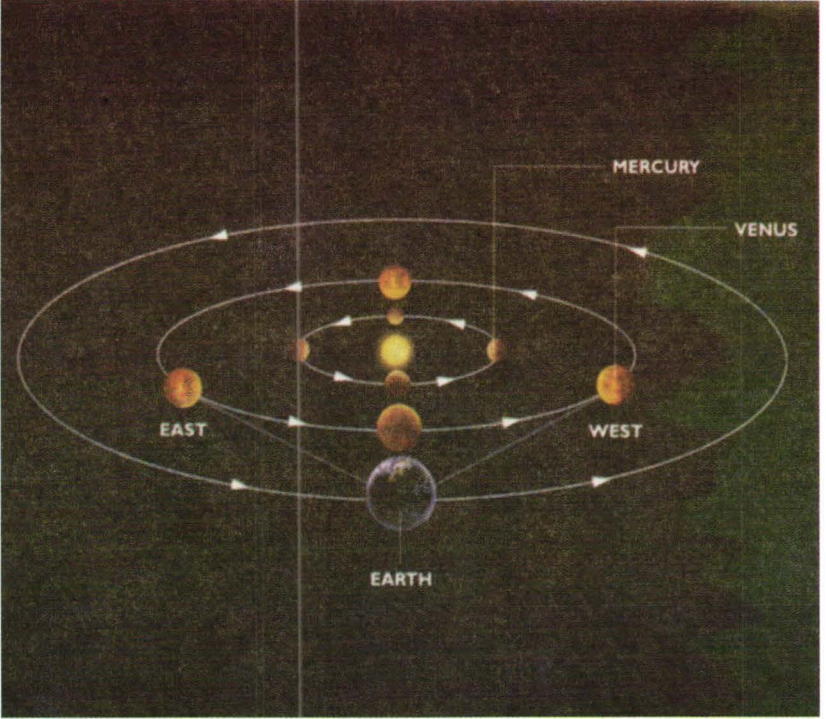
চিত্র-৬০

–বিজ্ঞানীগণ আমাদের সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখতে পান সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো চতুর্দিকে ঘুরতে গিয়ে উপগ্রহসহ সবাই 'Anti clockwise motion-এ তাদের আবর্তন সম্পন্ন করছে। এ দৃশ্য ব্যক্তিগত পর্যায়ের টেলিস্কোপ ব্যবহার করেও দর্শন করা সম্ভব।

এতে প্রমাণিত হচ্ছে– 'Anti clockwise motion তথা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিকেই আল্লাহ্ তাঁর গোলামীর একটি বড় ধরনের পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন, যা তিনি মহাবিশ্বে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যার রদবদল ঘটানো মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে।

"তিনিই (আল্লাহ্) পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন (কক্ষপথে এমনভাবে যা) সৃষ্টজীবের জন্য (খুবই বাসোপযোগী)" (৩৬ : ১০)
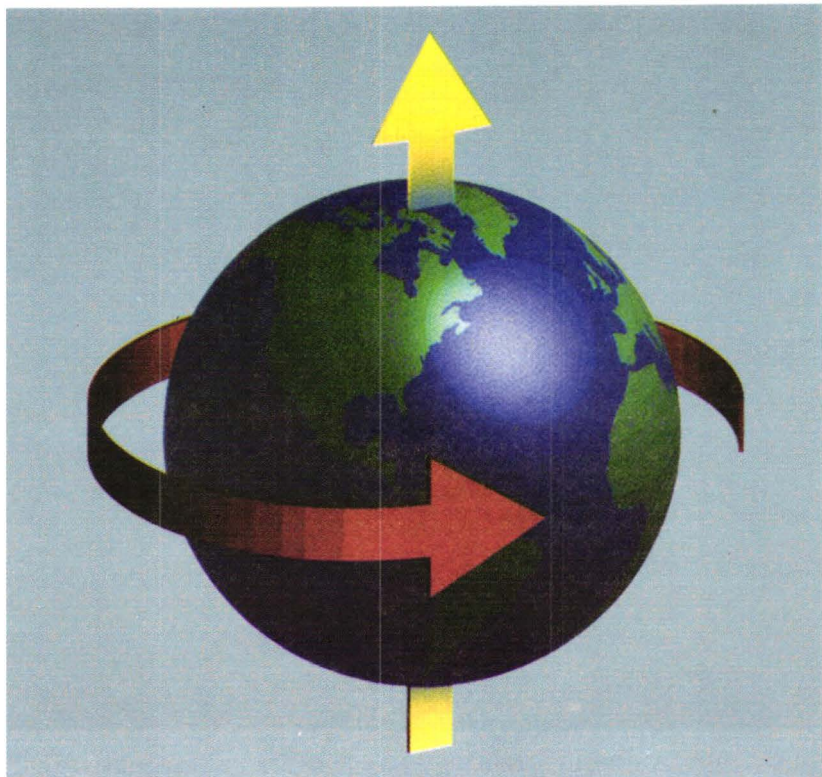
চিত্র-৬১

– যে পৃথিবী নামক গ্রহের পৃষ্ঠ আমরা মানব জাতি বসবাস করছি, সেই পৃথিবী আল্লাহর গোলামী প্রদর্শনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আল্লাহ্‌র নির্দেশে। বিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন পৃথিবী প্রতি ২৪ ঘণ্টায় নিজ অক্ষের উপর ভর করে একটি পূর্ণাঙ্গ ঘুরপাক সম্পন্ন করে থাকে। তাকে 'আহ্নিক গতি' বলা হয়। এই আহ্নিক গতির বেলায়ও পৃথিবী 'Anti clockwise motion-এ ঘুরপাক খেয়ে থাকে।

মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি ও সূর্য ইত্যাদির মতো পৃথিবীও যেন সত্যিকারভাবে এক আল্লাহর গোলামীতে নিমগ্ন হয়ে মানব জাতিকেও নীরবে আহ্বান জানাচ্ছে স্রষ্টার গোলামীতে একাত্ম হয়ে ধন্য হতে।

"তিনিই (আল্লাহ্) পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন (কক্ষপথে এমনভাবে যা) সৃষ্ট জীবের জন্য (খুবই বাসোপযোগী)।"
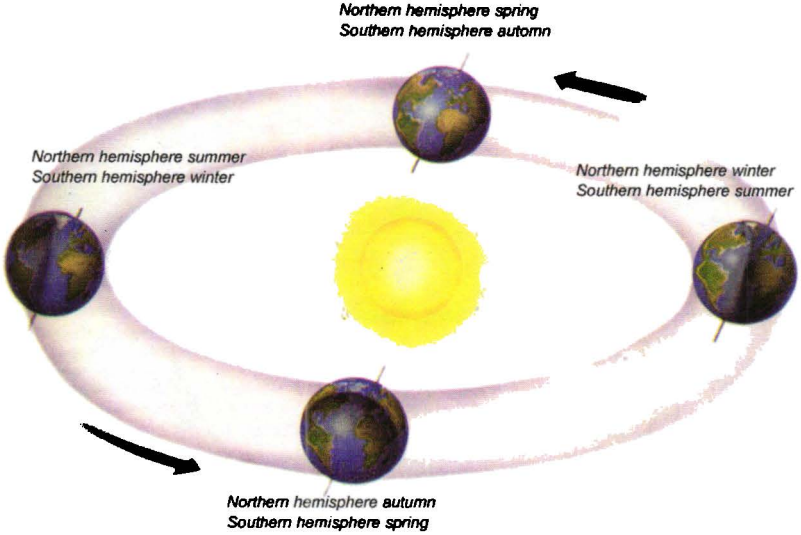
চিত্র-৬২

–আমাদের এ পৃথিবী ৩৬৫ দিনে নিজ কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণাঙ্গ আবর্তন সম্পন্ন করে থাকে। একে পৃথিবীর 'বার্ষিক গতি' বলা হয়। এই বার্ষিক গতির বেলায়ও পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে 'Anti clockwise motion-এ আবর্তন করে থাকে।

পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থান গ্রহণকারী মানুষ হিসেবে আমরা লক্ষ্য করছি যে, মহাবিশ্বে প্রায় সকল ব্যাপারই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী 'Anti clockwise motion'-ই তিনি তাঁর গোলামী করার জন্য সৃষ্ট বস্তুকে বাধ্য করেছেন। এজন্য তাঁকে কখনো প্রশ্ন করা যাবে না। সৃষ্টি তার নিজ স্বার্থেই স্রষ্টার নির্দেশ পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে মহান স্রষ্টা সবসময়ই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী।

"এতে অবশ্যই (মহান আল্লাহ্‌র উপস্থিতির বাস্তব) নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ : ৭৫)
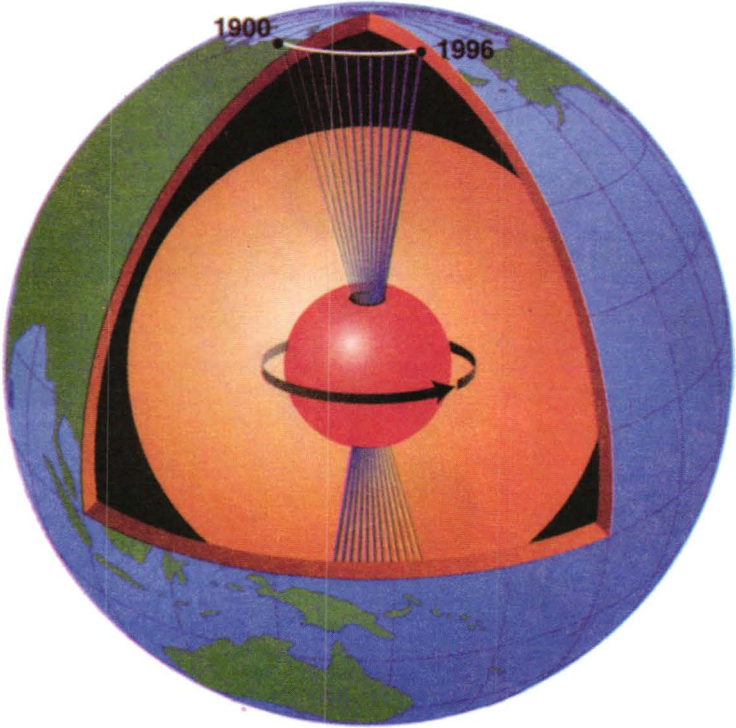
চিত্র-৬৩

–বর্তমান বিজ্ঞানের বদৌলতে আমরা আজ আমাদের এ পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য অবগত হতে সক্ষম হয়েছি। আমরা জেনেছি পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে গলিত তরল ধাতব পদার্থ (Liquid matalic core)। এই গলিত ধাতব কোরটিও প্রতিনিয়ত ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) ঘুরপাক' খাচ্ছে, পৃথিবী পৃষ্ঠে ঘটে যাওয়া যে কোন বড় ধরনের বিপর্যয়ই পৃথিবীর কেন্দ্রের এই ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন করতে পারে না।

এই যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তরল মেটালিক কোর-এর গতি সবই 'Anti clockwise motion-এ মানুষের শ্রেষ্ঠ ইবাদত 'বায়তুল্লাহ'তে তোয়াফ-এর সাথে হুবহু মিলে গেছে, তাতে প্রমাণিত হচ্ছে– স্রষ্টা একই নিয়মে শ্রেষ্ঠ গোলামীকে পছন্দ করেছেন।

কথা এখানেই শেষ নয়। বিজ্ঞানীগণ আমাদের এ পৃথিবীর অভ্যন্তরেও বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত গলিত মেটালিক কোরটিও (Metalic core) ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) অনবরত অভ্যন্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে। যতো প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই পৃথিবী পৃষ্ঠে কিংবা অভ্যন্তরে ঘটুক না কেন কখনই পৃথিবীর মেটালিক কোরটির এ গতির দিক পরিবর্তন ঘটছে না। অর্থাৎ প্রায় সবসময় সর্বত্রই 'Anti clockwise motion'টি নির্ভরযোগ্য ও অদৃশ্য এক ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টি বিজ্ঞানবিশ্বকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানীগণ ভাবছেন, কেন এই 'Anti clockwise motion' এর প্রাধান্য প্রায় সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে, এর মূল রহস্যই-বা কী? কিন্তু সমাধান পাচ্ছেন না।

পঞ্চমত আমরা মানব জাতিসহ অসংখ্য প্রাণের কলকাকলীতে মুখরিত ও ধন্য একমাত্র জীবনময় গ্রহ এ 'পৃথিবী' এবং এ পৃথিবীর উপগ্রহ হচ্ছে– মিষ্টি আলোর অধিকারী আমাদের প্রতিবেশী চাঁদটি। বিজ্ঞানীগণ এ চাঁদ সম্পর্কে গবেষণা-পর্যবেক্ষণ এমনকি চাঁদের মাটিতে স্বশরীরে পদার্পণ করে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে অবহিত করতে সক্ষম হয়েছেন যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করার কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদকে আলোকিত দেখায়।

চাঁদেরও আছে ২টি গতি। সে নিজ অক্ষের উপর ভর করে প্রতি ২৯.৫ দিনে পূর্ণ এক ঘূর্ণন সমাপ্ত করে। আবার প্রতি ২৯.৫ দিনে পৃথিবীর চারদিকের কক্ষপথে পূর্ণ এক চক্কর ঘুরে আসে। এ উভয় ঘূর্ণনই ২৯.৫ দিনে সমাপ্ত করে বিধায় আমরা সবসময় চাঁদের একটি দিকই দর্শন করে থাকি, চাঁদের অপর পিঠ পৃথিবী থেকে আমরা দেখতে পাই না। সে যাই হোক এখানে আসল যে ব্যাপারটি ঘটছে তা হলো– চাঁদ তার নিজ অক্ষের উপর ঘুরপাক খেতে এবং একই সাথে পৃথিবীর চারপাশও ঘুরে আসতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) ছুটে চলেছে। এর

"চন্দ্রের জন্য আমি (আল্লাহ্) নির্দিষ্ট করে দিয়েছি (তার কক্ষপথে) বিভিন্ন মন্‌যিল, অবশেষে তা (চন্দ্র কক্ষপথে আবর্তন করতে করতে) শুষ্ক-বক্র, পুরাতন খেজুর শাখার আকৃতি ধারণ করে।" (৩৬ : ৩৯)
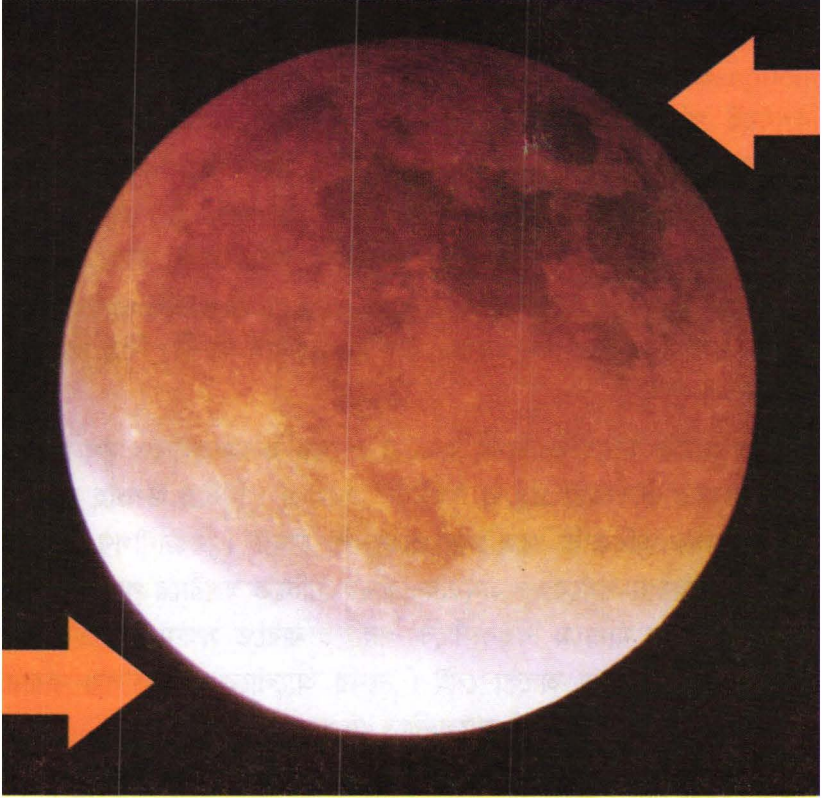
চিত্র-৬৪

–চাঁদ হচ্ছে 'পৃথিবী' নামক এ গ্রহের একটি উপগ্রহ। চাঁদ সবসময় পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই তার চারদিকে একই নিয়মে প্রদক্ষিণ করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ চাঁদকে গবেষণা করে ও পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, চাঁদটি প্রতি ২৯.৫ দিনে একবার নিজ অক্ষের উপর ভর করে 'Anti clockwise motion-এ পূর্ণরূপে ঘুরপাক খেয়ে থাকে। এটা চাঁদের আহ্নিক গতি। আল্লাহ্ তা'আলা চাঁদকে পূর্ণরূপে সৃষ্টি করে যে গতি ও দিক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন প্রথম দিন থেকে, অদ্যাবধি চাঁদ সেই একই নিয়মে তার আহ্নিক গতি ঠিক রেখে মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্‌র নিরবচ্ছিন্ন গোলামী করে যাচ্ছে। কোন অবস্থাতেই তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করছে না।

"তিনি (আল্লাহ্) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র মহাবিশ্বের সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।" (৩২ : ৫)
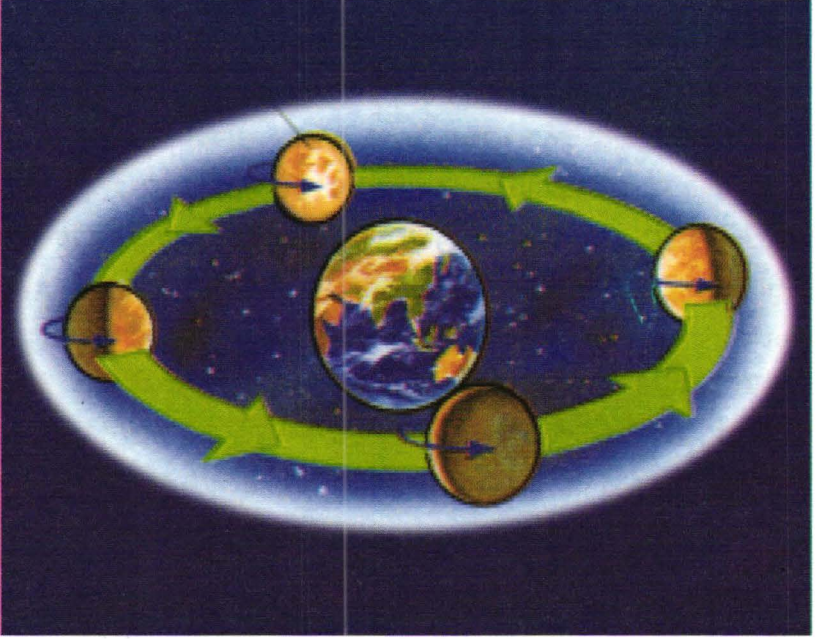
চিত্র-৬৫

–ইতোপূর্বে থেকেই আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট এ মহাবিশ্বে তাঁর গোলামী করার জন্য সবচেয়ে বড় গোলামী হিসেবে 'ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতি'কে (Anti clockwise motion) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সামগ্রিকভাবে সকল সৃষ্টিকে। তাই চাঁদের বার্ষিক গতিতে 'Anti clockwise motion-এ' পৃথিবীর চারদিকে নিয়মিতভাবে সম্পন্ন হচ্ছে প্রতি ২৯.৫ দিনে, অর্থাৎ চাঁদটিও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তার প্রধান ২টি কাজ 'আহ্নিক গতি' ও বার্ষিক গতির কাজ ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (anti clockwise motion) সম্পন্ন করছে। এভাবে প্রায় সবকয়টি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 'Anti clockwise motion' কেই আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির ভেতর সর্বাপেক্ষা বড় গোলামী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটছে না এবং ভবিষ্যতেও কোনো পরিবর্তন ঘটার লক্ষণ বিজ্ঞানীগণ দেখতে পাচ্ছেন না।

মহাজাগতিক অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় মানব সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জগৎ ও তার পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলোকে অদৃশ্য কারও পক্ষ থেকে যেনো 'ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতি' (Anti clockwise motion) দিয়ে এক কঠিন নিয়মের অধীন করে বেঁধে ফেলা হয়েছে। সমগ্র মানবমণ্ডলী এক যোগে চেষ্টা সাধনা বা পরিকল্পনা করে কখনো যার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম নয়। এখানে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে– কোটি কোটি বছর ধরে উল্লিখিত মহাকাশীয় বস্তুগুলো একই নিয়মের অধীন থেকে অর্থাৎ 'Anti clockwise motion' এ পরিচালিত হতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি। মনে হয় যেনো বিষয়টি প্রচণ্ড শক্তিশালী, সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী কোনো উৎসের কড়া নজরে রয়েছে। আর তাই নীরবে সবাই একই আইন বিধান মেনে চলেছে।

ষষ্ঠত বিগত প্রায় দু'হাজার বছর ধরে মানব সমাজ এ মহাবিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র বস্তুগত ইউনিটকে খুঁজতে গিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে এসেছে। অবশেষে বিংশ শতাব্দিতে এ মহাবিশ্বের মৌলিক বিল্ডিং ব্লক (Building block) রূপী একক ইউনিট 'পরমাণু' (Atom)-কে আবিষ্কার করেছে। 'পরমাণু' (Atom) আবিষ্কার করার সাথে সাথে তার আভ্যন্তরীণ কাঠামোও বিজ্ঞানীদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তারা পরমাণুর অভ্যন্তরে গভীরভাবে লক্ষ্য করতে গিয়ে এক অবিশ্বাস্য ও চাঞ্চল্যকর বিষয় উদঘাটন করে ফেলেন। 'পরমাণু-র' আকৃতি মহাসূক্ষ্মতার স্তরে বিরাজমান হলেও তার অভ্যন্তরে বেশ কয়েকটি মহাসূক্ষ্ম কণিকার উপস্থিতি এবং তাদের আচরণ আমাদের সৌরজগতের হুবহু অনুকরণে সম্পাদিত হতে দেখে বিজ্ঞানীগণ অভিভূত হয়ে যান। তারা পূর্বের তুলনায় আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে 'পরমাণু'র কেন্দ্রে 'প্রোটন ও নিউট্রন'

"তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে সমগ্র মহাবিশ্বের দিকে তাকায় না? আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি গোলামের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (৩৪ : ৯)
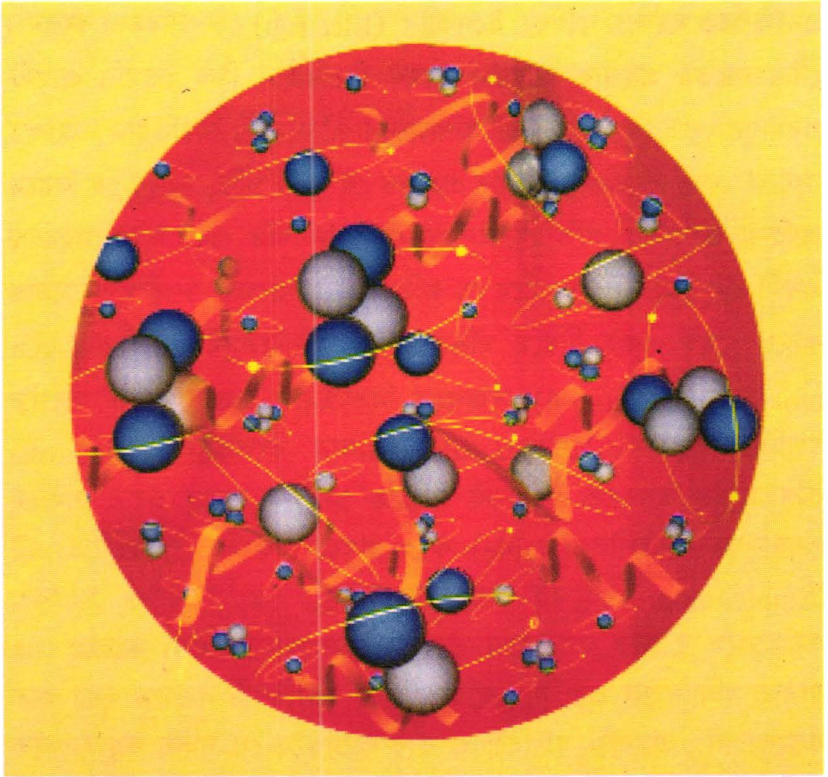
চিত্র-৬৬

–প্রায় দু'হাজার বছর থেকে মানব সমাজ চেষ্টা চালিয়ে এ মহাবিশ্বে ক্ষুদ্রতর একক এর (Building block) সন্ধান করতে গিয়ে অবশেষে বিংশ শতাব্দিতে 'পরমাণু' (Atom) কে আবিষ্কার করেছে। পরবর্তী সময়ে 'পরমাণু'কে নিয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে পরমাণুর অভ্যন্তরে আবিষ্কার করেছে 'ইলেক্ট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন' নামক মহাসূক্ষ্ম কণিকাসমূহকে। দেখা গেছে এই মহাসূক্ষ্ম স্তরেও 'প্রোটন ও নিউট্রন' কণিকাদ্বয় একত্রিত হয়ে পরমাণুর কেন্দ্র 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) তৈরী করেছে আর 'ইলেক্ট্রন' (Electron) কণিকা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clock-wise motion-এ) অনবরত নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, অবিকল যেন সৌরজগৎ। একেই বলে একই নিয়মে আল্লাহ্‌র গোলামী!

(Proton & Neutron) কণিকা মিলিত হয়ে যে 'নিউক্লিয়াস' গঠিত, সেই নিউক্লিয়াস (Nucleus) কে কেন্দ্র করে 'গ্রহ'দের মতো প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণরত মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'ইলেকট্রন' (Electron) কে আবিষ্কার করেন। সৌরজগতের গ্রহদের আবর্তন যেমন বিরতিহীন ঠিক তেমনি প্রতিটি পরমাণুর ভেতরও 'ইলেকট্রন' কণিকাদের পরিভ্রমণও বিরতিহীন। আবার 'সূর্যকে কেন্দ্র করে সৌরজগতে গ্রহদের যে ঘূর্ণন গতি, সূর্যের যে নিয়মে আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, গ্যালাক্সির যে ঘূর্ণন গতি এবং সমগ্র মহাবিশ্ব একটি একক ইউনিট হিসেবে যে গতিতে নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণন সমাপ্ত করছে, সেই একই নিয়মে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) সূক্ষ্মস্তরে বিরাজমান প্রথম পূর্ণাঙ্গ বস্তুগত ইউনিট 'পরমাণু'র ভেতরও তার উপাদান 'ইলেকট্রন' (Electron) কণিকাসমূহ অনবরত ঐ একই গতিতে প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করার মাধ্যমে পরমাণুকে স্থিতিশীল (stable) করে রাখছে। ফলে পরবর্তীতে এই 'Stable atom' থেকেই পর্যায়ক্রমে অণু, বস্তু, বিশ্ব ও মহাবিশ্ব পর্যায়ক্রমে তাদের রূপ ধারণ করে বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে। এ ব্যবস্থা যদি সফল করা না যেতো তাহলে মহাবিশ্বটি বর্তমান দৃশ্য লাভ করতো না। এমনকি মহাবিশ্ব ও তার অভ্যন্তরে যে সকল বস্তু দেখতে পাচ্ছি তাদের কোনো কিছুই সৃষ্টি হতে পারতো না। পরমাণুর এই বস্তুগত আইনকে মানব জাতি সম্মিলিত চেষ্টা-সাধনা করে কখনো পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না। উক্ত ব্যবস্থার অবসান মানেই বস্তুর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে বিলীন হয়ে যাওয়া। 'আবর্তন' বা 'প্রদক্ষিণ' নামক এই আশ্চর্য ব্যবস্থা চালু আছে বিধায় মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিসমূহ আছে, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহসমূহ আছে। আমরা প্রাণী জগৎ আছি। আছে গাছ-পালাসহ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বস্তুসম্ভার। বিজ্ঞানীগণ আমাদের এ পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের কঠিন, বায়বীয় ও তরল পদার্থের 'পরমাণু' সংগ্রহ করে

পরীক্ষা করে দেখেছেন– সকল প্রকার পরমাণুর অভ্যন্তরেই ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন (Electron, Proton & Neutron)-এর উপস্থিতি বিদ্যমান এবং প্রোটন ও নিউট্রন জড়াজড়ি অবস্থায় 'নিউক্লিয়াস' তৈরী করে পরমাণুর মধ্যস্থলে অবস্থান করছে আর চারদিকে 'ইলেকট্রন' কণিকা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খাচ্ছে তথা প্রদক্ষিণ করছে। সমগ্র মহাবিশ্বে প্রতিটি পরমাণুর ভেতর 'Universal law' হিসেবে এই নিয়ম কার্যকর রয়েছে, যার কোনো প্রকার পরিবর্তন সমগ্র মহাবিশ্ব পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত হবে না। বিজ্ঞান দৃঢ়তার সাথেই এ তথ্য বিশ্ববাসীকে পরিবেশন করেছে।

সুধী পাঠক! উপরের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে, মহাসূক্ষ্ম পদার্থ কণিকা থেকে শুরু করে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, সৌরপরিবার, গ্যালাক্সি (Milky way galaxy) এবং সমগ্র মহাবিশ্বটি একই নিয়মে সবাই 'Anti clockwise motion' তথা ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে কর্ম সম্পাদন করে চলেছে। এতে মহাবিশ্বে যে উক্ত 'Anti clockwise motion' প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বস্তুর বেলায় বুঝি 'Clockwise motion' কার্যকর নেই। আছে, অবশ্যই আছে। তবে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় ধরা পড়েছে যে মানুষ ও জীন জাতি তদের পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জবাবদিহিতার জালে আবদ্ধ বিধায় এদের সাথে সংশ্লিষ্ট মহাজাগতিক বস্তুগুলোতে 'Anti clockwise motion'-কে স্রষ্টার গোলামীতে প্রাধান্য দিয়ে তাকে স্থায়ীভাবে কার্যকর করা হয়েছে এবং ইসলামী বিধানের আওতায় মানব জাতির জন্যও বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি বড় ধরনের গোলামী হজ্জের অনুষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে সেই 'Anti clockwise motion'-কেও সেই সাথে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

মানব সমাজের জীবন নির্ভর যে সমস্ত বস্তু তাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তাদের প্রয়োজনে অঙ্গাঙ্গীভাবে তাদের সাথে মিশে আছে সেই সকল বস্তুর বিল্ডিং ব্লক (Building block) রূপী ইউনিট 'পরমাণু' (Atom)সমূহের মধ্যেও যে গতিকে 'Standard' ধরে গোলামী করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, আবার পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, সৌরব্যবস্থা, গ্যালাক্সি এমনকি সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে একক ইউনিট হিসেবে আল্লাহ্ যে গতির দিকের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত গোলামী করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, সেই একই গতির দিকের মাধ্যমে গোলামী করা থেকে সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকেও অব্যাহতি দেয়া হয়নি। জীবনে একবার হলেও মক্কায় 'বায়তুল্লাহ্'কে তার চারদিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে (Anti clockwise motion-এ) ৭ বার ঘুরপাক খাওয়া তথা প্রদক্ষিণ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, যেন আল্লাহ্র সৃষ্ট এ মহাবিশ্বে- মহাবিশ্ব, গ্যালাক্সি, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এমনকি মহাসূক্ষ্ম পদার্থ কণিকা পরমাণুর সাথে মানব সমাজও তাল মিলিয়ে মহাজাগতিক আইন (Universal law) উল্লিখিত 'Anti clockwise motion' মেনে নিয়ে এক আল্লাহ্র প্রকৃত গোলাম হয়ে ধন্য হতে পারে। এখানে আরও লক্ষণীয় যে মহাবিশ্বটি সপ্তাকাশে বিন্যস্ত বিধায় এবং 'সপ্তাকাশ'-এর সবাই একমাত্র এক আল্লাহ্রই গোলামী করছে বিধায় সমতা রক্ষার জন্য কমপক্ষে প্রতিটি মানুষকে ঐ ৭ বার ঘুরপাক খেতে তথা আবর্তন বা প্রদক্ষিণ করতে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং জ্ঞানী পাঠক সমাজ! মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক যে আল্লাহ্ মহাসূক্ষ্ম কণিকা 'পরমাণু' থেকে শুরু করে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, গ্যালাক্সি এবং মহাবিশ্বসহ সৃষ্টির সেরা মানব জাতির জন্যও তাঁর পছন্দনীয় ও উচ্চতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে গোলামী– 'ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিকে (Anti clockwise motion কে) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই মর্যাদাসম্পন্ন গোলামী প্রদর্শন করা থেকে আমরা কি দূরে অবস্থান গ্রহণ করতে পারি? এতে কি আমরা কল্যাণের অংশীদার হতে

পারবো? পারবো না। তাহলে চলুন সম্মুখ পানে, আর বিলম্ব নয়, নিজ জ্ঞানে যখন সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন (Sign) বুঝতে পেরেছি তখন ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল সৃষ্ট বস্তুর সাথে আমরাও মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু এক আল্লাহ্‌র গোলামীতে অবনতশিরে মিশে যাই। তাহলে এটাই আমাদের জন্য বয়ে আনবে বিরাট সফলতা ইন্‌শাআল্লাহ্‌। সফল হবে আমাদের পৃথিবীর এ জীবন, ধন্য হবে আমাদের পরকালীন জীবন, সার্থকতায় পৌঁছবে এ পৃথিবীতে আমাদের সংক্ষিপ্ত জীবনের চলমান মিশন।

প্রশ্ন ঃ 'হ্যাঁ' সূচক (Positive) বাক্য এবং 'Clockwise motion'-এর বাস্তবতা থাকার পরও কেন 'না' সূচক (Negative) এবং 'Anti clockwise motion'-কেই মহাবিশ্বে ও মানব জাতির গোলামীর বিষয়ে কার্যকর করা হয়েছে?

উত্তর ঃ মানব জাতির এ পৃথিবীতে আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই তারা ভাবতে শুরু করে দৃশ্যমান এ জগতের সৃষ্টি ও তার স্রষ্টাকে নিয়ে। মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় লক্ষ কোটি নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুসহ অগণিত মহাকাশীয় জ্যোতিষ্কের ভাসমান ও চলমান আনা-গোনা, মাটির দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় লক্ষ কোটি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির পোকা-মাকড় ও প্রাণীর সমাহার, আবার ভূ-পৃষ্ঠে সমান্তরালে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাঢ় সবুজের সমাহারে পরিপূর্ণ অগণিত উদ্ভিদ জগতের ছড়িয়ে থাকা নয়নাভিরাম ও মনভোলানো দৃশ্য উপভোগ করতে থাকে আর ভাবতে থাকে, বর্ণনাতীত সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এ বিশাল মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কার পরিকল্পনা এতো নিখুঁত ও সুন্দর? একই সাথে জলে-স্থলে ও আকাশে কোটি কোটি বিষয়ের অকল্পনীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কার হাতে? কে সেই মহাপরিকল্পনাকারী, সৃষ্টিকারী ও একক নিয়ন্ত্রণকারী? আমরা কি তাঁকে দেখতে পারি? আমরা কি তাঁর পরিচয় পেতে পারি? তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও পরিচয় না পেলে যে আমাদের চিত্ত শান্ত হবে না! এ পৃথিবীতে আমাদের মানব সমাজের আগমন যে

সার্থক হবে না! আমাদের পার্থিব জীবন হয়ে যাবে ব্যর্থ! মানব সমাজের প্রাণের এ আকুতি এবং এরই আলোকে তারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ করে কাটিয়ে দিয়েছে বিগত সময়ে শত শত বছর। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের সেই পেরেশানী তারা ঘুচাতে সমর্থ হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে এর সঠিক জবাব প্রেরণ না করেছেন কিংবা 'বিজ্ঞান' নামক জ্ঞানের আলোতে বিষয়টি সঠিকভাবে মেলে না ধরেছেন। মানব সমাজের বর্তমান প্রজন্ম এদিক থেকে বিবেচনায় সত্যিকার অর্থেই সৌভাগ্যবান। কারণ এখন তাদের হাতে একদিকে রয়েছে মহাবিশ্বের একমাত্র প্রভু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানব জাতির সুপথ প্রাপ্তির জন্য অবতীর্ণ 'অহী' এবং অপরদিকে আছে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্‌ঘাটন আর আবিষ্কারসমূহ।

এ মহাবিশ্বের সত্যিকার অর্থেই স্রষ্টা কে? তা স্পষ্ট করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি ঊর্ধ্বাকাশ থেকে অবতীর্ণ 'অহী' যেমন কথা বলেছে তেমনি জ্ঞানপূর্ণ বর্তমান বিজ্ঞানের উদঘাটন ও আবিষ্কারসমূহ জ্ঞানী সমাজের চোখে আঙ্গুল রেখে তা দেখিয়ে দিচ্ছে। আর এ কাজটি করতে গিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই শুরুতে 'বিপরীত' (Anti) বা 'না' (No) সূচক বক্তব্য ও কাজের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বিষয়টি একাধারে বিস্ময়কর ও মনোযোগ আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে, যাতে করে প্রশ্নকারি গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করে বিষয়টির উত্তর জেনে নিতে পারে।

আমরা আমাদের পৃথিবীর জীবনে লক্ষ্য করলেও এ রকম অনেক বিষয় দেখতে পাবো, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য অকস্মাৎ স্বাভাবিক পরিবেশের বিপরীত কিছু করা, বিকট শব্দ করা, রাগান্বিত হয়ে জোরে 'না' সূচক কোন কথা বলা, কিংবা বক্তা তার প্রতি শ্রোতাদের আকর্ষিত করার জন্য 'না' সূচক কোনো কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করে সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাতে করে বাকীরা বক্তার কথা শুনতে থাকে এবং এর ফলে যে উদ্দেশ্যে আয়োজন তা সহজেই পূর্ণতায় পৌঁছে যেতে পারে। অর্থাৎ তখন বক্তৃতার উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল হয়।

আমাদের গবেষণায়ও অনুমিত হচ্ছে যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সেরা মানব জাতির সম্মুখে নিজ পরিচয় ও তাঁর উপস্থিতির জীবন্ত স্বাক্ষর মেলে ধরার জন্যই তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত 'অহী' এবং জ্ঞানপূর্ণ মহাকাশীয় গোলামীর ব্যবস্থাপনায় 'বিপরীত' (Anti) বা 'না' সূচক (No) কথা ও কাজের আশ্রয় অবলম্বন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অহীর মাধ্যমে তিনি তাঁর পরিচয় প্রকাশ করেছেন (যা বিশ্বাস করা বিশ্বাসীদের জন্য প্রথম শর্ত) এভাবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" অর্থাৎ "নেই, কোনো ইলাহ আল্লাহ্ ছাড়া।"

এ পৃথিবীতে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার প্রথম শর্ত যে বাক্যটি উচ্চারণ করা, সেই বাক্যটির প্রথম শব্দটি হচ্ছে- 'No' বা 'Nothing' অর্থাৎ 'না' বা 'নেই'– এ 'না' সূচক কথা দিয়েই প্রথমত মনোযোগ আকর্ষণ করে শ্রোতার মন-মানসিকতাকে সর্বদিক থেকে মুক্ত করে একমুখী করা হয়েছে, তারপর সেই একমুখী মন-মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্মুখে আল্লাহ্ তাঁর পরিচয় পেশ করে তাঁর আদেশ মতো গোলামী করার আহ্বান রেখেছেন। স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ তাঁর গোলামীর জন্য এ পদ্ধতিকে পছন্দ করেছেন বিধায় তাঁর মৌলিক ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়াব-লীতে তিনি তা চালু করেছেন। যার বিপক্ষে অবস্থান নেয়া অযৌক্তিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তা। তাঁর ইচ্ছা ও কাজে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা বা অধিকার কারো নেই।

আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এ জাতিয় বহু ঘটনা লক্ষ্য করে থাকি। যেমন– কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হয়ে খাওয়ার টেবিলে খেতে যাবেন, ঠিক তখনি খাওয়া শুরুর মুহূর্তে এক বন্ধু উচ্চস্বরে 'No'-'No' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ফলে বাকী বন্ধুরা তখন খাওয়া শুরু না করে নিজেদের মনোযোগ সর্বদিক হতে সরিয়ে এনে ঐ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন এবং ভাবতে লাগলেন কিছু একটা ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ঘটেছে। বন্ধুটি এখন পিন

পতন নিস্তব্ধতায় মুখ খুললেন এবং বললেন তার মনের একান্ত প্রিয় কথাটি যে, আমি তোমাদের সবার হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু 'আব্দুর রহমান'। আমিই তোমাদের আপ্যায়নের জন্য এ সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করেছি। আমার আহ্বান থাকবে তোমরা ধীরে-সুস্থে সকল খাওয়ার শেষ করে তবেই উঠবে। সম্পূর্ণ খাওয়া শেষ না করে কেউ উঠে যাবে না। খাওয়া শেষ না করে চলে যাওয়া আমি পছন্দ করি না, বুঝলে!

এখন উপরে বর্ণিত বিষয়টি যদি পর্যালোচনায় নেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে- বক্তা শুরুতে 'No' 'No' বলে যে 'না' সূচক কথা দিয়ে শুরু করেছেন, এতে একদিকে বাকী সব বন্ধুদের একমনে একধ্যানে পরবর্তী কথাগুলো শুনার সর্বোচ্চ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং খাওয়া বন্ধ করে কথাগুলো শুনতে যেয়ে সাথে সাথে এও প্রমাণিত হয়েছে যে, আয়োজনকারী বন্ধুটির উপস্থিতি খাওয়ার টেবিলে বিদ্যমান। তিনি স্বশরীরে হাজির আছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার বেলায় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রথম বাক্যটির শুরুতেই শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি প্রমাণ করার জন্যই 'না' সূচক শব্দ দিয়ে কালেমা শুরু করেছেন এবং পরের বাক্যটিতে উপস্থিতির পক্ষে তথ্য সরবরাহ করেছেন। কারণ বিশ্বাসের বেলায় যাঁকে বিশ্বাস করা হবে তাঁর উপস্থিতি বা বিদ্যমান থাকাটা হচ্ছে প্রথম শর্ত, যা বিশ্বাসীদের মজবুত ভিত্তি প্রদান করে, যাঁকে বিশ্বাস করা হবে, তিনি যদি বাস্তব অর্থেই না থাকেন তাহলে তো বিশ্বাসের ভিত্তিই না থাকাতে সমগ্র বিষয়টি অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো বোকার কাজ হয়ে যায়। সৃষ্টির সেরা মর্যাদায় অভিষিক্ত মানুষের জন্য যে কাজ একবারেই বেমানান। এতে তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বহন করে না।

আবার মহাবিশ্বের মহাকাশেও আল্লাহ্‌ যে সকল মহাজাগতিক বস্তু সৃষ্টি করে মানব জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে রেখেছেন তাদের প্রায় সব কয়টিকেই

'Clockwise motion' দান করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে বরং সবাইকে কালেমার মতোই 'বিপরীত' বা 'না' সূচক 'Anti clockwise motion' নির্দিষ্ট করে দিয়ে গোলামী করা বাধ্যতামূলক করেছেন। যাতে করে স্বাভাবিকতার মাঝে এই যে ছন্দপতন এবং এর পেছনে যে একজন মহাজ্ঞানী সর্বশক্তিমান সত্তা সর্বদা বিদ্যমান আছেন, তা যেনো জ্ঞানবান সমাজ যথার্থই উপলব্ধি করতে পারেন।

উল্লিখিত বিষয়টিতে তথা মহাবিশ্বের সকল কিছু ও কাজের পেছনে যে এক ও একক মহান সত্তা আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বাস্তবভাবে একশত ভাগ বিদ্যমান তা দৃঢ় ও মজবুত করার জন্যই মানব জাতিকে জীবনে একবার হলেও মক্কায় গমন করে তাঁর পবিত্র ঘর 'বায়তুল্লাহ'-র চতুর্দিকে ৭ বার 'Anti clockwise motion'-এ আবর্তন বা প্রদক্ষিণ করার নির্দেশ জারি করেছেন, যা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই।

সুতরাং কি 'কালেমাতে' কি 'মহাকাশে' আর কি সর্বোচ্চ ইবাদত 'হজ্জে' সর্বত্রই মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান মহান সত্তা 'আল্লাহ্‌' তাঁর পবিত্র সত্তার সক্রিয় উপস্থিতি ও সক্রিয় কার্যক্রমকে অদৃশ্য থেকে প্রকট দৃশ্যমান বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি উল্লিখিত 'বিপরীত' (Anti) বা 'না' (No) সূচক উক্তি ও কাজের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন সর্বত্র (আসল ব্যাপারটি আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন)। আশা করি সুধী পাঠক সমাজ সূক্ষ্ম অথচ জ্ঞানময় উল্লিখিত বিষয়টি এবার উপলব্ধির সীমানায় আনতে সমর্থ হয়েছেন।

এখন আমরা আলোচিত পুরো বিষয়টি এক নজরে দেখে নিই!

একনজরে

আল-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
১. *"তারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর (সমগ্র মহাবিশ্বের) ব্যবস্থার দিকে তাকায় না এবং তাদের প্রতি যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন?" (৭ ঃ ১৮৫)*	১. বিজ্ঞানবিশ্ব এ মহাবিশ্বের পরতে পরতে অর্থাৎ সকল ধাপ ও পর্যায়ে তার নিত্য-নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে ব্যবহার করে প্রতিনিয়তই বিরামহীনভাবে পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।
"তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আকাশে ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বের পরতে পরতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে) তাকায় না? আল্লাহ্ অভিমুখী প্রতিটি গোলামের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (৩৪ ঃ ৯)	এর ফলে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন আবিষ্কার আর উদঘাটন-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে মহাবিশ্বের অগণিত বিষয়ের সার্বিক পরিস্থিতি সঠিকভাবে অবহিত করতে সমর্থ হচ্ছে। বিজ্ঞান তার উদ্ঘাটন দিয়ে যা কিছু রহস্য উন্মোচন করছে, তাতে একটি কথাই বার বার প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ মহাবিশ্বে কোনো একটি বিষয়ই অযথা বা বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়নি। সবারই কোনো না কোনো কাজ আছেই। আর এতটুকুই যখন জানা যাচ্ছে তখন প্রমাণিত হচ্ছে যে কোনো জিনিসই নিজ থেকে সৃষ্টি হয়নি, বরং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কেউ এগুলো সৃষ্টি করে থাকবেন।

২. "(আল্লাহ্) তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত (সমগ্র মহাবিশ্বের) সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।" (৩২ ঃ ৫)

২. বিজ্ঞানের বিংশ শতাব্দির অগ্রযাত্রায় বর্তমান বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করছেন যে, সম্পূর্ণ মহাবিশ্বে বস্তুগত যতো আইন (Physical law) বিদ্যমান আছে সকল আইনই একটি মৌলিক আইনের অধীন এবং পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। এতে বিজ্ঞানীগণ অনুভব করছেন যে কোনো মৌলিক উৎস থেকে হতে পারে তা একক নিয়ন্ত্রণের অধীনই পরিচালিত হচ্ছে।

"তিনি আকাশমণ্ডলী (মহাবিশ্ব) নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ (খুঁটি) ব্যতীত (যা ভাসমান ও চলমান কায়দায় টিকে আছে) তোমরা তা দেখতে পাচ্ছ?" (৩১ ঃ ১০)

বিজ্ঞান 'Telescope' এবং 'Satellite' ব্যবহার করে মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশের ছবি ধারণ করে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছে যে, মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার সমস্ত কিছুই খুঁটিবিহীন অবস্থায় ভাসমান ও চলমান (Motion) থেকে ভারসাম্য সৃষ্টি করে মহাশূন্যে টিকে আছে। মহাবিশ্বে এ এক মহাবিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা যা মানবীয় সকল প্রকার কল্পনাকেও হার মানিয়েছে।

৩. "আল্লাহ্-ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে (সমগ্র মহাবিশ্বটিকে) সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা (ভাসমান ও চলমান থাকাবস্থায়) স্থানচ্যুত না হয়। তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে?" (৩৫ ঃ ৪১)

৩. বিজ্ঞান ভাসমান এ মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে 'মহাকর্ষ বল'কে, যা মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় মহাজাগতিক বস্তুদেরকে পরস্পরের মাঝে আকর্ষণ বল সৃষ্টি করে একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ধরে রেখেছে। এতে সহযোগিতা করছে তাদের সবাইর উড়ন্ত গতি। গতির কারণে ভারসাম্যতা পূর্ণতা লাভ করেছে।

"শপথ নক্ষত্রপুঞ্জের (গ্যালাক্সির) যা ভাসমান অবস্থায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৫১ ঃ ১)

আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েল ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত একটানা আকাশ পর্যবেক্ষণ করে ঘোষণা করেন যে, মহাবিশ্বে গ্যালাক্সিসমূহ তাদের ভাসমান অবস্থায় চলমান গতির বৃদ্ধি প্রতিনিয়তই ঘটতে থাকায় এক সময় আলোর গতির সমান গতিপ্রাপ্ত হয়ে সঙ্কুচিত হওয়ার মাধ্যমে দৃশ্যমান অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

৪. "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং এর মধ্যবর্তী কোনো কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি।" (১৫ ঃ ৮৫)

৪. চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সিসমূহ কোনো কিছুই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অযথা যে সৃষ্টি নয় তা বাস্তবভাবে প্রমাণিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানীগণ। মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তু, শক্তি ও বিষয় সর্বদা কোনো না কোনো কাজে জড়িত আছেই। সবার সার্বিক সক্রিয় কর্মব্যস্ততা এ মহাবিশ্বকে পূর্ণতা প্রদান করেছে।

"কত মহান তিনি, যিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন গ্যালাক্সি এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" (২৫ ঃ ৬১)

একটি গ্যালাক্সি একটি নক্ষত্র সিটি, মহাবিশ্বে যা সবচেয়ে বড় সংগঠন। এতে বিরাজমান আছে নেবুলা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু, ব্লাক হোলসহ মহাজাগতিক আরো নানান ধরনের বস্তু।

সূর্য ও চন্দ্র এবং আমাদের এ পৃথিবী আমাদের 'মিলকি-ওয়ে গ্যালাক্সি'র সদস্য। আমাদের সূর্যের মতো নক্ষত্র এ গ্যালাক্সিতে আছে প্রায় ৪০,০০০ কোটির মতো। অধিকাংশ

নক্ষত্রের আবার আছে সৌরপরিবার। সৌরপরিবারের ভেতরই গ্রহ ও উপগ্রহ একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্দিষ্ট সীমানার ভেতর অনবরত পরিভ্রমণ করতে থাকে। এর বাইরে বিচরণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সূর্যের গণ্ডির ভেতর তারই আইনে এরা মূলত বন্দি। সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে সূর্য।

(৫) "তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অধীনে চলেছে।" (১৪ ঃ ৩৩)

"তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মের অধীন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।" (৩১ ঃ ২৯)

"এ ব্যবস্থা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তার পক্ষ থেকে আরোপিত (যা একাধারে বিস্ময়কর ও অলঙ্ঘনীয়)।" (৩৬ ঃ ৩৮)

৫. আমাদের সৌরজগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান এযাবৎ বহু তথ্য আবিষ্কার করে মানব জাতিকে অবহিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিজ্ঞান পৃথিবীর আবাসযোগ্যতা সম্পর্কে উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে জানিয়েছে যে, পৃথিবীর আবাসযোগ্যতা নির্ভর করছে সূর্যের উপর। মানব জাতিসহ সকল প্রকার প্রাণ ও উদ্ভিদের জীবন-যাপন প্রতি মুহূর্তে নির্ভর করছে সূর্যের সুস্থভাবে টিকে থাকার উপর। প্রাণ ও উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস, তাপ, খাদ্য, পরিবেশ সমস্ত কিছুই সূর্যের সরবরাহকৃত তাপের উপর নির্ভর করছে। তাপ সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে গেলে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রাণ ও উদ্ভিদের সকল প্রকার চাঞ্চল্য দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য নিজ অক্ষের উপর প্রায় ১৫০ কিলোমিটার গতিতে ঘূর্ণনরত থাকায় এবং প্রতি ২৫০ কোটি বৎসরে সম্পূর্ণ গ্যালাক্সিতে একবার প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করার কারণেই

"(মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায়) সবাই নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে পরিভ্রমণে ব্যস্ত।" (৩৬ ঃ ৪০)

পৃথিবীর এই আবাসযোগ্যতা বিরাজমান আছে এবং তা বজায় থাকতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে।

একইভাবে চাঁদটিও প্রতি ২৯.৫ দিনে নিজ অক্ষের উপর এবং প্রতি ২৯.৫ দিনে পৃথিবীর চারদিকেও একবার 'Anti clockwise motion'-এ প্রদক্ষিণ করার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর আবাসযোগ্যতা তথা জোয়ার-ভাটা ও জল-বায়ুসহ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানব জাতিসহ সবার কল্যাণ সাধন করে চলেছে।

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে, এদের সাথে আবার নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই (পক্ষ থেকে নির্ধারিত) বিধানে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে (গভীর জ্ঞানসম্পন্ন) নিদর্শন।" (১৬ ঃ ১২)

সূর্য ও চন্দ্রের নির্দিষ্ট কক্ষ পথে নির্দিষ্ট গতিতে একই নিয়মে তথা Anti clockwise motion-এ প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণের মধ্যদিয়ে কোটি কোটি বছর ধরে প্রাণ ও উদ্ভিদ জগতের কল্যাণ সাধন করে চলেছে কোন প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই। এতে অবশ্যই প্রমাণিত হচ্ছে– 'Anti clockwise motion' টি নির্ভরযোগ্য।

৬. "সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে (তাঁরই নির্ধারিত বিধান মানার ভেতর দিয়ে) এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর উচ্চ প্রশংসা,

৬. বিজ্ঞানের অগ্রগতির পূর্বে মানব সমাজ এ মহাবিশ্ব এবং তার ভেতরকার মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সম্পর্কে সঠিক কোনো জ্ঞানই রাখতো না। মাথার উপর দৃশ্যমান 'মিলকি-ওয়ে গ্যালাক্সি'র সামান্য ভগ্নাংশকেই মহাবিশ্ব ভেবে তৃপ্তি লাভ করত। বিংশ শতাব্দিতে এসেই বিজ্ঞান মহাবিশ্বের রহস্য

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।" (১৭ ঃ ৪৪)

এক এক করে উন্মোচন করতে থাকায় মানব সমাজ বুঝতে পারলো মহাবিশ্ব বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায়। তারা আরও বুঝতে সক্ষম হলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দৃশ্যমান মহাকাশীয় অংশটুকু মূল মহাবিশ্বের মাঝে বালিকণার সমানও নয়। ইতোমধ্যে মানব সমাজ বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছে। যারা নিজ নিজ কক্ষপথে অনবরত ভাসমান অবস্থায় উড়ে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে প্রস্থান করছে। আবার প্রতিটি গ্যালাক্সির ভেতর প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র ভাসমান ও নির্দিষ্ট গতিতে চলমান থেকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণরত আছে নিজ নিজ সৌরজগতকে সাথে নিয়ে। সৌরজগতে গ্রহগুলো আবার নিজ নিজ আয়ত্তে উপগ্রহগুলোকে নির্দিষ্ট নিয়ম ও কক্ষপথে আবর্তন অবস্থায় গতিশীল থাকতে সাহায্য করছে। এভাবে মহাবিশ্বের সার্বিক অবস্থাকে সাজিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সবাই যেন কোনো না কোনো এক নিয়ম ও আইনের অধীন হয়ে প্রতিনিয়ত কর্মসম্পাদন করে চলেছে, যা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য এবং অপরিবর্তনীয়। উল্লিখিত বিষয়গুলো সমাজের জ্ঞানবানদের নাড়া দিয়ে যায়, যেনো নীরবে বলতে চায়

"তিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তাদের চলার পথ (গোলামীর নমুনা, কার্যক্রম, সীমা, ধর্মনীতি ইত্যাদি) নির্দেশ করেছেন।" (২০ ঃ ৫০)

"এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ ঃ ৭৫)

এর পেছনে এক মহাজ্ঞান কাজ করছে, নতুবা কিভাবে এতো বিশাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে?

৭. বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার আর উদঘাটনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে মৃত্যুর পূর্বে অবহিত করেছেন যে, সমগ্র মহাবিশ্বটি কোনো প্রকার বিচ্ছিন্ন বা গোঁজামিল আইন দিয়ে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত নয়। বরং মহাবিশ্বের প্রতিটি ধাপ ও স্তরে এবং প্রতিটি বিষয়ের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে আছে কোনো এক অদৃশ্য মহাজ্ঞানী কর্তৃক বাছাইকৃত ও নির্ধারিত 'একসেট মৌলিক আইন' বা নিয়ম-পদ্ধতি। যা আমাদের অলক্ষ্যে ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সকল বস্তুর উপর সর্বদা ক্রিয়াশীল আছে। তাঁর এ ধারণার সাথে অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও একাত্মতা ঘোষণা করেন। ফলে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ দিকে 'The unified theory'-এর উপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যান তা উদ্‌ঘাটন করার জন্য। কিন্তু তাঁর মৃত্যু তাঁকে এ ব্যাপারে বেশি দূর অগ্রসর হতে দেয়নি। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর বর্তমান বিজ্ঞানীগণ তাঁর সেই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যাতে করে প্রস্তাবিত 'একসেট মৌলিক আইন'কে আবিষ্কার করা যায়।

৭. "তোমরা আল্লাহ্‌র (মহাজাগতিক একই বিধানের অধীন গোলামীর) উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পূর্ণ করো।" (২ ঃ ১৯৬)

"নিশ্চয় মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়) যা বরকতময় ও বিশ্বজগতসমূহের (আল্লাহ্‌মুখী সার্বিক গোলামীর) দিশারী। এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। যেমন মাকামে ইব্রাহিম। আর যে কেউ সেথায় প্রবেশ করে সে

নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ (চারদিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতিতে ৭ বার প্রদক্ষিণ) করা তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের কারও মুখাপেক্ষী নন (ফলে প্রত্যাখ্যানকারী এক কঠিন শাস্তি গ্রহণে বাধ্য হবে)।" (৩ ঃ ৯৬-৯৭)

বিজ্ঞানীগণ আশা করছেন উল্লিখিত মৌলিক আইনগুলো উদ্‌ঘাটিত হলে এ মহাবিশ্বে মহাজাগতিক যতো প্রকার বস্তু ও শক্তি মওজুদ আছে তাদের প্রত্যেকেই যে নিয়ম ও বিধান মেনে চলে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রয়েছে তার মৌলিক কারণও তখন উপলব্ধি করা যাবে। তখন আরও জানা যাবে প্রত্যেকের মধ্যে একটি 'Common law' কেন কাজ করছে! তবে ইতোমধ্যে মহাজাগতিক বস্তুদের 'Anti clockwise motion'-এ আবর্তনের যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা মক্কায় 'বায়তুল্লাহ'তে 'Anti clockwise motion' এ আবর্তন বা প্রদক্ষিণের মতো হুবহু অনুরূপ হওয়া প্রমাণ করছে যে, এ মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক এক ও একক আল্লাহ্‌ বর্তমান আছেন, যিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তা। তিনিই তাঁর পছন্দ মতো মানুষ এবং মহাজাগতিক বস্তুদের জন্য (যারা সরাসরি মানব জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের) 'Anti clockwise motion'-কে গোলামীর জন্য একই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তাই সর্বত্র একই নিয়মে গোলামী পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৮. "তারা কি চায় আল্লাহর বিধান (গোলামী) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো বিধান মানতে? অথচ আকাশমণ্ডলী ও

৮. বিজ্ঞান অর্থ– বিশেষ জ্ঞান, যে জ্ঞান কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে নিয়োজিত হলে– ঐ বিষয়ের সৃষ্টি, আকার আকৃতি, গঠন, কর্মকাণ্ড-কার্যধারা, রং, বর্ণ, বৈচিত্রতা

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (সমগ্র মহাবিশ্বে) যা কিছু আছে, সমস্তই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহর বিধান (গোলামী) মেনে নিয়েছে।" (৩ ঃ ৮৩)

"যদি কেউ ইসলাম (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া গোলামী) ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো বিধান মেনে চলে তাহলে তার কাছ থেকে ঐ বিধান গ্রহণ করা হবে না এবং ঐ ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (৩ ঃ ৮৫)

ও শেষ পরিণতিসহ সকল ব্যাপারেই যথাসম্ভব সকল তথ্য ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করে সম্মুখ টেবিলে উপস্থাপন করেছে।

এ যাবতকাল পর্যন্ত বিজ্ঞান এ মহাবিশ্বের বিভিন্ন ব্যাপারে যা কিছু আবিষ্কার আর উদঘাটন করেছে, তাতে বিজ্ঞানী সমাজ লক্ষ্য করেছেন সবার মাঝে যেন কর্মকাণ্ডের দিক থেকে একটা নীরব মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। মহাকাশীয় বস্তুগুলো যেনো অদৃশ্য কোনো এক মহাশক্তির উৎসের কড়া নির্দেশ মেনে চলছে, যা তাদের স্থায়ী গোলামী বা আনুগত্যকেই কেবল প্রকাশ করছে। যে কারণে সমগ্র মানবমণ্ডলী একযোগে চেষ্টা-সাধনা করেও তাদেরকে নির্ধারিত নিয়মের অনুসরণ থেকে কখনও বের করে আনতে পারবে না।

বিজ্ঞানের এ তথ্য আবিষ্কার প্রমাণ করছে যে, মহাকাশীয় বস্তুদের আনুগত্য নির্ভরযোগ্য বিধায় মানব সমাজও সে পথেই জীবন নির্বাহ করা জরুরী।

৯. "আল্লাহর বিধানে (গোলামীতে) তোমরা কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।" (৪৮ ঃ ২৩)

৯. বর্তমান বিজ্ঞানবিশ্ব প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে যে এ মহাবিশ্বের মহাসূক্ষ্ম বিল্ডিং ব্লক (Building block) 'পরমাণু' (Atom) থেকে শুরু করে বৃহৎ গ্যালাক্সি পর্যন্ত সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে যে নিয়ম ও বিধানে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর

থেকে সেই বিধানের কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছে না বা হচ্ছে না। এর ফলে বিজ্ঞানীগণ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন যে, নিশ্চয় মৌলিকভাবে কোনো এক অদৃশ্য সার্বভৌম উৎস এর পেছনে অবশ্যই ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। যে উৎসকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাই পূর্ণ আনুগত্যের সাথেই মেনে চলেছে।

তাই পরমাণু, চন্দ্র, পৃথিবী, সূর্য, গ্যালাক্সি এমনকি সম্পূর্ণ মহাবিশ্বসহ প্রায় সবাই একই নিয়মে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে– যা মানব জাতির সবচেয়ে বড় গোলামী 'হজ্জের' সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ বিধায় মানব জাতি তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে এক আল্লাহ্‌র গোলামী মেনে নেয়াই হবে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ।

"যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ গ্রহণ করুক।" (৭৮ ঃ ৩৯)

অতএব আজকের উৎকর্ষিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ঝলমল পরিবেশে মানব সমাজের সর্বোচ্চ ইবাদতের সাথে মহাবিশ্বের সার্বিক গোলামীর ধারা একই স্রোতে মিশে একাকার হয়ে ধরা দেয়ার পরিবেশ আবিষ্কৃত আর উদঘাটিত হওয়ার পরও সমাজে অবিশ্বাসী জ্ঞানীদের কি টনক নড়বে না? যে মহান সত্তা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে গোলামীতে সমগ্র মহাবিশ্বের বড় বড় বস্তুগুলোসহ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র 'পরমাণু' পর্যন্ত আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেই একই গোলামীর অনুকরণে গোলামী মেনে নিতে মানব সমাজের একাংশের আপত্তি থাকা কি যুক্তিযুক্ত? স্রষ্টার গোলামীর মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ কি কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী হতে পারে? অসম্ভব!

তাই আসুন অবিশ্বাসী জ্ঞানী-গুণী বন্ধুরা, সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে এক ও একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে তাঁর নির্দেশিত পথেই গোলামী করি এবং জীবনে একবার হলেও মক্কায় 'বায়তুল্লাহ্'কে কমপক্ষে ৭ বার প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বের তথা সপ্ত আকাশ-এর গোলামীর সাথে একাত্ম হয়ে যাই। তাহলে আমাদের মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্ব বহাল রাখার কারণে আল্লাহ্ আমাদের ধন্য করবেন এ পৃথিবীর জীবনে এবং অগ্নির শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়ে ধন্য করবেন পরকালীন জীবনে। আমাদের সবার জীবনে সঠিক জ্ঞানের ধারা বিজয় লাভ করুক। আমীন ॥

'নক্ষত্রবিহীন পরকাল আল্লাহ্‌র 'নূর' দিয়ে আলোকিত হবে'

আল্‌-কুরআন

"বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? অতঃপর আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (২৯ ঃ ২০)

"সৃষ্টিকে তিনি-ই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান।" (১০ ঃ ৪)

"আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে ওরা সন্দেহ পোষণ করবে?" (৫০ ঃ ১৫)

"সেদিন জমিনকে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ জমিনে পরিণত করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে আকাশমণ্ডলীকেও।" (৪৯ ঃ ৫৯)

"যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও।" (১৪ ঃ ৪৮)

"আর আমি নিশ্চয় পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে একটি পরিষ্কার ময়দানে পরিণত করবো।" (১৮ ঃ ৮)

"আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাত তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে

থাকবে, বিশ্ব (নতুন জগত) তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত (আলোকিত) হবে।" (৩৯ ঃ ৬৮-৬৯)

"এতো কেবল একটি মহাবিস্ফোরণ হবে (ঘটবে), আর তখনই সৃষ্ট ময়দানে তাদের আবির্ভাব ঘটবে।" (৭৯ ঃ ১৩-১৪)

"সেদিন মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন দলে বের হবে।" (৯৯ ঃ ৬)

"এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে, ডানদিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডানদিকের দল! এবং বামদিকের দল; কতো হতভাগ্য বামদিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তী, ওরাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।" (৫৬ ঃ ৭-১১)

"অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন ওরা কবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়, ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতবিহ্বল হয়ে। অবিশ্বাসীরা বলবে, 'বড় কঠিন এ দিন।" (৫৪ ঃ ৭-৮)

"যেদিন ওরা ফিরিশতাদের প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং ওরা বলবে, 'রক্ষা করো, রক্ষা করো।" (২৫ ঃ ২২)

"হে নবী! ওদের সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে যখন দুঃখ কষ্টে ওদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।" (৪০ ঃ ১৮)

"বন্ধুরা হয়ে পড়বে সেদিন একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।" (৪৩ ঃ ৬৭)

"বিচার দিবস সম্পর্কে তুমি কী জানো? সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।"

"অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলো-ধূসর, তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা, এরাই অবিশ্বাসী ও পাপাচারী।" (৮০ ঃ ৩৮-৪২)

"যেদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করবেন, সেদিন ওদের মনে হবে যেন ওদের অবস্থিতি (পৃথিবীতে) দিবসের মুহূর্তকাল ছিলো মাত্র।" (১০ ঃ ৪৫)

"আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নাই, এটা এক মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

'পৃথিবী নামক এ গ্রহে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের আগমন বিংশ শতাব্দিতে, আর মানব জাতির জন্য তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থরূপে 'আল-কুরআন' এর আগমন ৬১০ খ্রিস্টাব্দে। মাঝখানে ব্যবধান প্রায় ১৪০০ বছর। 'কুরআন' অবতীর্ণের সময় বলতে গেলে 'বিজ্ঞান'-এর চোখও ফুটেনি এমনি এক অবিজ্ঞান পরিবেশে যখন কুরআন অবতীর্ণ হয়ে মহাবিশ্বের তথা ইহকাল ও পরকালের বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যসমূহ এমনভাবে জ্ঞানের পরশ বুলিয়ে গেছে যে, যার অধিকাংশ তথ্য-ই বিজ্ঞানের জ্ঞানগত ও প্রযুক্তিগত চরম উৎকর্ষতা অর্জন ব্যতিরেকে বুঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন ও দুরূহ ছিল। বর্তমান বিজ্ঞান তার প্রতিদিনের আবিষ্কার এবং উদ্‌ঘাটন দিয়ে আমাদের এ মহাবিশ্বের পরিকল্পনা, কার্যক্রম, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসহ অগণিত ব্যাপারে একেবারে হুবহু কুরআনের পক্ষ অবলম্বনে 'তত্ত্ব' ও তথ্য'সমূহ সরবরাহ করায় মানব জাতি তার জীবনের যথার্থ সফলতা লাভে 'রাজপথের' সন্ধান পেয়ে সৌভাগ্যের অধিকারী হচ্ছে, যা মাত্র কিছুদিন পূর্বেও চিন্তা করা ছিলো একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। এর জন্য কারণ ছিলো– বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্যায়ের অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা তথ্যসমূহ দিয়ে অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী বিজ্ঞানী মহলের নানান ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং তা মানব সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকার ফল। একটু বিলম্বে হলেও বর্তমানে সে অবস্থার অবসান ঘটছে খুবই দ্রুততার সাথে, যা মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে।

আমাদের বক্ষমান অধ্যায়টিও 'পরকাল' বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা বিশেষ, যা দৃশ্যমান বস্তুজগতে সাধারণত প্রতিষ্ঠিত আইন-কানুন ও পদ্ধতি-শৃঙ্খলার পরিপন্থি-ই মনে হবে বাহ্য দৃষ্টিতে, কিন্তু বর্তমানে উদ্‌ঘাটিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানপূর্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করলে বিষয়টি যে হতবাক করার মতো 'মহাসত্যতায়' মণ্ডিত তা স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হবে। এখন উক্ত বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে বিস্ময়কর

বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতা স্পষ্ট আলোতে তুলে ধরার জন্য প্রথমে উদ্ধৃত কুরআনের বাণীসমূহের মর্মকথা উপলব্ধির চেষ্টা করবো এবং পরক্ষণে একই বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানের উদ্ঘাটিত তথ্য ও তত্ত্ব এবং ছবির পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করবো। তাহলে চলুন এগিয়ে যাই!

অধ্যায়ের শুরুতে উল্লিখিত কুরআনিক বাণীর বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের মর্মকথা হলো– এ মহাবিশ্বের একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দেখার জন্য, কিভাবে তাদের এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা করা হয়েছে? যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তারা পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণও করে দেখতে পারে। তাদের একমাত্র প্রভু যেভাবে যে পদ্ধতিতে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, ঠিক সেরূপ এবং সেই একই পদ্ধতিতে নতুন জগত সৃষ্টি করবেন এদের প্রথম ধ্বংসের পরে। জগতসমূহের প্রথম স্রষ্টা তিনি, আবার একবার ধ্বংস আবার সৃষ্টির পুনরাবর্তনও তিনি-ই ঘটিয়ে থাকেন। সর্ববিষয়ে তিনি সর্বশক্তিমান বিধায় এটা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব এবং এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকা ঠিক নয়। এ মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে যদি তাদের বিশ্বাস গড়ে উঠে থাকে, তাহলে পরবর্তীতে এক সময় তার অংশ বিশেষের ধ্বংস সাধন ঘটিয়ে আবার ঐ ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন জগত সৃষ্টিতে তাদের প্রভু যে সক্ষম, তা কেন তারা মেনে নিতে পারে না? এ জাতীয় স্ববিরোধিতার কি কোনো যুক্তি আছে?

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা মানবমণ্ডলীর কোনো প্রকার পরওয়া না করে সম্পূর্ণ নিজ ইচ্ছায় একদিন কিয়ামাতের মাধ্যমে জীবনময় এ পৃথিবীর ধ্বংস সাধন ঘটিয়ে আবার সম্পূর্ণ নতুনভাবে তা সৃষ্টি করবেন। সেই পরিবর্তনে এ পৃথিবীর চেহারা সবদিক থেকেই বদলে যাবে। আকৃতি হবে বিরাট-বিশাল ও সর্বত্র সমতল। কোথাও উঁচু-নিচু আর থাকবে না, থাকবে না খাল-বিল, নদী-নালা ও সাগর-মহাসাগর। সমগ্র নতুন জগতটি হবে একটি একক

"তিনিই (আল্লাহ্) সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্বে আনেন। অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান।"
(১০ : ৪)

"আমি (আল্লাহ্) কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে ওরা সন্দেহ পোষণ করবে?। (৫০ : ১৫)

চিত্র-৬৭ (ক)

–আল্লাহ্ তা'আলা এ মহাবিশ্বকে Oscillating তথা পুনঃপুন সৃষ্টির পদ্ধতির আওতায় সৃষ্টি করেছেন। প্রথমবার সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি সৃষ্টি করার পর পরবর্তীতে মহাবিশ্বের বড় সংগঠন গ্যালাক্সিসমূহ এক এক করে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস হয়ে আবার সৃষ্টি হবে। আবার ধ্বংস হবে আবার সৃষ্টি হবে। এভাবে লম্বা সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। অবশেষে একদিন সম্পূর্ণ মহাবিশ্বটি চিরদিনের জন্যই আল্লাহ্ বিলীন করে দেবেন। তখন তাঁর পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। গ্যালাক্সিসমূহ এক এক করে ধ্বংস হওয়া মানে ওর ভেতরকার জগতগুলোর কিয়ামত সংঘটিত হওয়া। পরে আবার সৃষ্টি হওয়া মানে বিচারের জন্য নতুন জগত তৈরী হওয়া। এ কাজ তিনি করবেনই।

ময়দান মাত্র। তখন শুধু একা এ পৃথিবীর আকার-আকৃতি-ই ঐরূপ হবে না, সাথে সাথে সমগ্র গ্যালাক্সিতে অনুরূপ পরিবর্তন সূচিত হবে (যেহেতু আলোর গতিতে চলমান হওয়ার কারণে অসংখ্য জীবনময় জগতসহ সমগ্র গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে প্রথমে ধ্বংস ও পরবর্তীতে সঙ্কুচিত বিন্দুতে চাপ ও তাপে শর্ত পূরণ হয়ে বিস্ফোরণের মাধ্যমে আবার নতুন নতুন জগত তৈরী হবে)। অর্থাৎ একই পরিবর্তন ঘটবে আকাশমণ্ডলীতেও। আর এ সমস্ত কর্মকাণ্ড-ই ঘটবে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে (শিঙ্গায় ফুৎকার-এর মাধ্যমে)। সেখানে বড় বিস্ময়কর ঘটনা হিসেবে যা লক্ষণীয় হবে তা হলো নক্ষত্রবিহীন জগৎ। অর্থাৎ সূর্য বা নক্ষত্র শাসিত সৌরপরিবার সৃষ্টি না হয়ে শুধুমাত্র বড় বড় জীবন উপযোগী গ্রহ সৃষ্টি হবে বিচারের মাঠ হিসেবে ব্যবহার হওয়ার জন্য। সেখানে পারমানবিক চুল্লী (Atomic nuclear reactor) সম্বলিত কোনো প্রকার সূর্য বা নক্ষত্র সৃষ্টি করা হবে না। নতুনভাবে সৃষ্ট বৃহৎ-বৃহৎ গ্রহসমূহ মহাজাগতিক নিয়মের আওতায় 'মহাকর্ষ বল' (Gravity) এর প্রভাবে ভাসমান ও চলমান অবস্থায় ভারসাম্য সৃষ্টি করে ব্যবস্থিত হবে। সূর্য বা নক্ষত্র সৃষ্টি না হওয়ায় সৃষ্ট নতুন জগতসমূহে আলোর ব্যবস্থায় কোনোও প্রকার অসুবিধা হবে না এ জন্য যে বিচারের নিমিত্তে ঐ ময়দানে সকল মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করে জাগিয়ে তোলার পর সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী (যা তুলনাতীত) শাহান শাহ, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা প্রভু 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন' তাঁর 'কুরসি'সহ সম্মানিত ফিরিশতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঐ হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন, যার কারণে তাঁর পবিত্র 'নূর'-এর আলোকচ্ছটায় পরকালের সমগ্র পরিবেশই আলোকময় হয়ে উদ্ভাসিত হবে বলে সেখানে অন্য কোনো প্রকার আলোর উৎসের প্রয়োজন না থাকায় কোনো সূর্য বা নক্ষত্র সৃষ্টি করা হবে না (ব্যাপারটি হুবহু- 'প্রখর সূর্যালোকে মোমবাতির প্রয়োজন না থাকার মতোই')। কেননা ঐ পরিবেশে তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। সমগ্র মহাবিশ্বের

"আর আমি (আল্লাহ্) নিশ্চয় পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে একটি পরিষ্কার ময়দানে (বিচারের মাঠে) পরিণত করবো।" (১৮ : ৮)
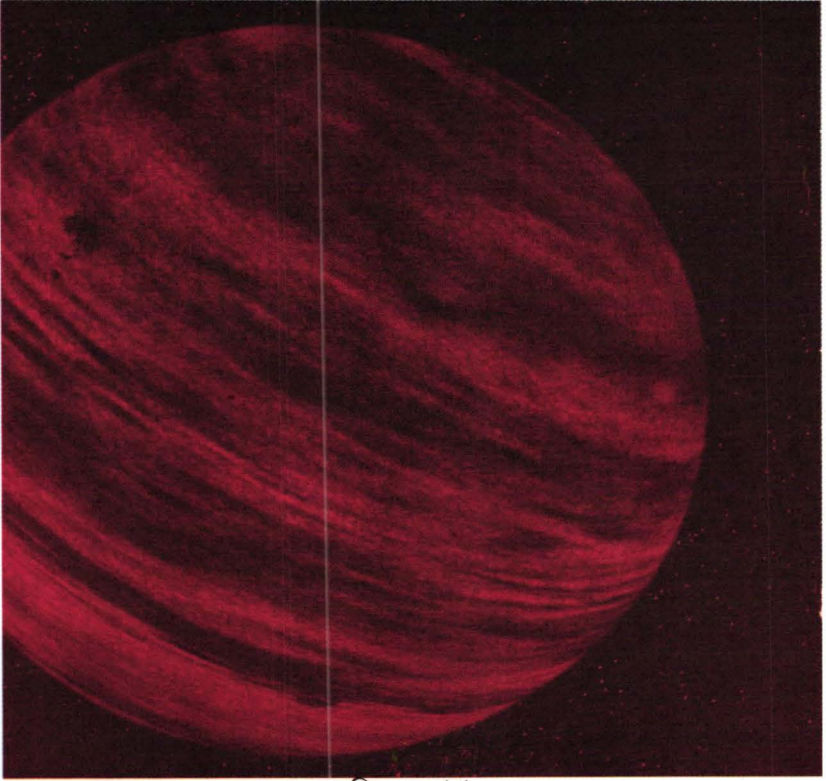
চিত্র-৬৭ (খ)

–যুগ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলে গেছেন, দৃশ্যমান উড়ন্ত গ্যালাক্সিসমূহ এক সময় আলোর গতিতে উড়তে গিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ধ্বংস হবে এবং পরক্ষণে প্রচণ্ড চাপ ও তাপে সঙ্কুচিত বিন্দুটি 'বিস্ফোরণ' ঘটিয়ে নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি করবে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে বর্তমানে, মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায় প্রায় প্রতিদিন যে 'গামা-রে বার্স্ট' সংঘটিত হচ্ছে এবং তা বিজ্ঞানবিশ্ব ছবিসহ সংরক্ষণ করছে। সম্ভবত এর মাধ্যমে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর সেই ভবিষ্যৎ বাণী-ই বাস্তবে সংঘটিত হচ্ছে।

ইতোমধ্যে বিজ্ঞান মহাবিশ্বের মাঝে আমাদের পৃথিবীর মতো প্রায় তিন'শত গ্রহের সন্ধান পেয়েছে। আবার বিস্ফোরণ পরবর্তী সময়ে সৃষ্টি হতে থাকা প্রাথমিক অনেক জগতের আবিষ্কারও সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছে। অতএব পরকালে নতুন জগত সৃষ্টি বাস্তবে সত্য ঘটনা। ছবিতে আবিষ্কৃত বিশাল একটি গ্রহ দেখা যাচ্ছে।

একমাত্র প্রভুর উপস্থিতি উপলক্ষে সেথায় তুচ্ছ বস্তুজগতের ব্যবস্থাপনার ন্যায় সূর্য বা নক্ষত্র নামক সাধারণ চেরাগ দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করা মহান স্রষ্টার মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার দিক থেকেও তা একেবারেই বেমানান। তাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র 'নূর' দিয়েই পরকালের ব্যবস্থাপনাকে সরাসরি আলোকিত করবেন। এতে ইহকালের তথা বস্তুজগতের তুলনায় পরকালের বা আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠত্বও সগৌরবে একই সাথে প্রকাশিত হবে।

'বিগ ব্যাংগ' (Big Bang)-র অনুকরণে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে পরকালে হাশরের ময়দান নামক গ্রহটি সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর তাপমাত্রা (Microwave background radiation) সেখানে বর্তমানের ২.৭৩ k. তাপমাত্রার তুলনায় কয়েক গুণ বেশি থাকাবস্থায় মানুষ জন্ম নিয়ে বিচারের মাঠে দাঁড়িয়ে যাবে এবং বিভিন্ন দলে তথা ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পৃথক হয়ে পড়বে। প্রথম দলটি হচ্ছে 'অগ্রবর্তী দল'। এ দলের সদস্যগণ হবেন নবী-রাসূলগণ (সা)। তাঁরা প্রচণ্ড উত্তপ্ত বিচারের মাঠে সৃষ্টি হবেন ঠিকই তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য 'আর্শ'-এর ছায়ায় তৈরী শান্তিময় প্যাণ্ডেলে অবস্থান করবেন বিধায় তখন কোনো প্রকার কষ্ট-ই তাঁরা অনুভব করবেন না বরং আল্লাহ্র প্রিয় মেহমান হিসেবে শুধু শান্তিই অনুভব করবেন। দ্বিতীয় দলটির সদস্যগণ হচ্ছেন– ঈমানদার, মো'মেন আল্লাহ্র বান্দাগণ। এ দলটি 'ডানদিকের দল' হিসেবে পরিচিত হবে। এ দলের লোকগুলোও তাদের ঈমানের কারণে উত্তপ্ত বিচারের মাঠে অগ্নিঝরা শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে তাঁর 'আরশ'-এর ছায়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্থান দান করবেন, ফলে তারাও উদ্ভূত উত্তপ্ত পরিবেশের শাস্তি থেকে বেঁচে গিয়ে কল্যাণের অধিকারী হবেন। আনন্দে তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও হর্ষোৎফুল্ল।

"আবার যখন বিস্ফোরণ ঘটবে, তখনই তারা (সৃষ্ট নতুন জগতে) দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। বিশ্ব (নতুন জগৎ) তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত (আলোকিত) হবে।" (৩৯ : ৬৮, ৬৯)
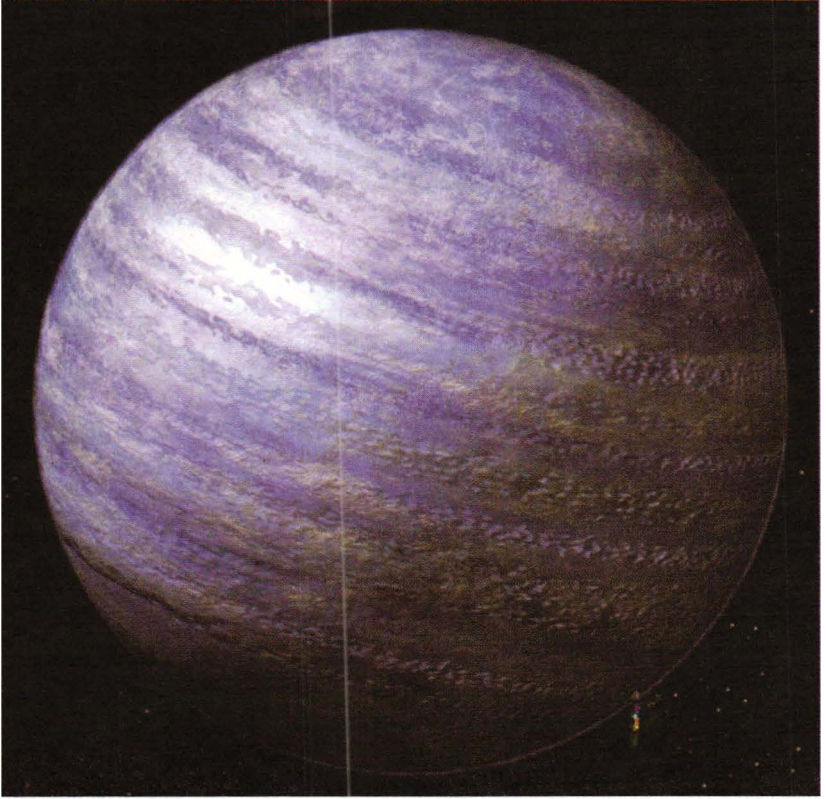
চিত্র-৬৭ (গ)

–ইতোমধ্যে বিজ্ঞানজগৎ আমাদের এ পৃথিবীর প্রায় সাড়ে তিন হাজার গুণ বড় একটি গ্রহের সন্ধান লাভ করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় দু'শ এর মতো গ্রহ বিজ্ঞান মহাকাশে আবিষ্কার করেছে। আমাদের এ পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল (২৫০০০ মাইল)। অতএব অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে সাড়ে তিন হাজার গুণ বড় নতুন গ্রহটির সমতল পৃষ্ঠদেশ কত বিশাল হবে, কত বড় ময়দানে পরিণত হবে। যেখানে খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর কিংবা গাছ-পালা, পাথর-পর্বত কিছুই থাকবে না।

পরকালের সৃষ্ট নতুন জগৎ আলোকিত হবে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ 'নূর' দিয়ে। বিজ্ঞানও স্বীকার করছে মহাকাশে অসংখ্য প্রকার আলোকরশ্মি বিরাজমান আছে।

"হে নবী! ওদের সতর্ক করে দাও আসন্ন দিবস সম্পর্কে, যেদিন দুঃখ-কষ্টে ওদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।" (৪০ : ১৮)
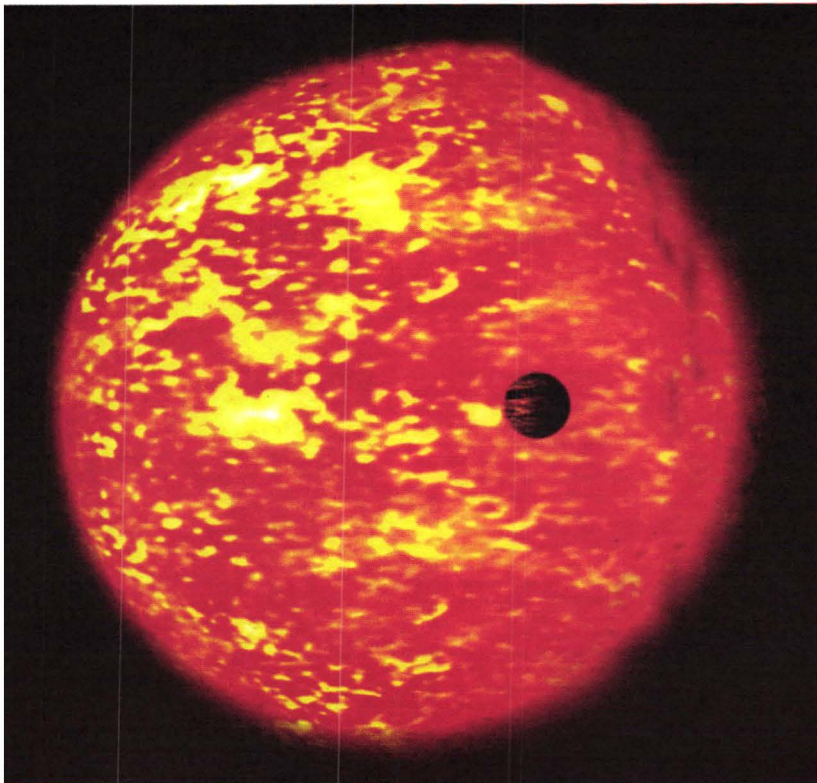
চিত্র-৬৭ (ঘ)

–'মহাবিস্ফোরণে' সৃষ্ট নতুন জগতে শুধুমাত্র বিচারের নিমিত্তে স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই মানুষগুলোকে আবার নতুনভাবে যেহেতু সৃষ্টি করা হবে, তাই নতুন সৃষ্ট সেই গ্রহটি ততক্ষণে পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে শান্তিময় হয়ে ওঠার আগেই মানুষের সেখানে আগমন ঘটবে বিধায় অপরাধীরা উত্তপ্ত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় পড়ে দারুণ দুঃখ-কষ্টে জড়িয়ে পড়বে। এতে পরিস্থিতির ভয়াবহতায় তারা দিশেহারা হয়ে যাবে। অপরদিকে সৌভাগ্যবান মানুষগুলোকে আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র আরশের বিশেষ প্রোটেকশানে ঐ বিপর্যয়কর অবস্থা হতে রক্ষা করবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। তিনি তা শতভাগই পূরণ করবেন।

সেদিন সূর্য মাথার ওপর থাকার যে প্রবাদ প্রচলন আছে সমাজে, তা চরম বাস্তবতার আলোকে বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। কারণ সেকথা কুরআন ও বিজ্ঞান থেকে প্রমাণিত হচ্ছে না। ছবিতে একটি উত্তপ্ত গ্রহ দেখা যাচ্ছে।

তৃতীয় দলটি হচ্ছে 'বামদিকের দল' । এ দলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে– পৃথিবীতে বসবাসকারী পাপিষ্ঠ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় । এরা একদিকে যেমন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীনকে, তাঁর রাসূলকে, তাঁর কিতাবকে, পরকালকে অস্বীকার করছে ঠিক তেমনি তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে অপরাপর মানুষকেও সৎপথ থেকে বিচ্যুত করছে । বিচারের ময়দানে এরা হতভাগ্যরূপে উপস্থিত হবে । নতুন সৃষ্টি জগতে প্রচণ্ড উত্তপ্ততার ভেতর এরা এক দারুণ কষ্টে সময় অতিবাহিত করবে । মাটি থেকে জন্ম নিয়ে এরা বিচারের মাঠের ভয়াবহ পরিবেশের রূঢ়তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকবে 'বড় কঠিন এ দিন, রক্ষা করো, বাঁচাও বাঁচাও' । তাদের নিজেদের মধ্যে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়বে । সবাই শুধু নিজ সত্তাকে বাঁচাবার চেষ্টায় আত্মবিভোর হবে । ফলে বন্ধুও হয়ে পড়বে শত্রু । অবর্ণনীয় দুঃখ, কষ্ট-ক্লেশে ও উত্তপ্ততায় পুড়ে তাদের চেহারা হবে মলিন ও ধূলি-ধূসর । কোনো প্রকার সুখ-শান্তি তাদের জন্য রাখা হবে না এবং সে ধরনের কোনো পরিবেশে তারা পৌঁছতেও পারবে না । বর্ণনাতীত সেই বিপর্যয়কর অবস্থায় এ পাপিষ্ঠ মানুষেরা পৃথিবীর জীবনকালকে, বিচারের মাঠে সময়ের দীর্ঘতার তুলনায় মাত্র মুহূর্তকাল মনে করবে । একদিকে উত্তপ্ত পরিবেশের ভয়ার্ত দুঃখ-ক্লেশ, অপরদিকে কঠিন সেই অবস্থায় সময়ের দীর্ঘ সূত্রিতায় হতাশ হয়ে পাপিষ্ঠরা চিৎকার করে আর্তনাদ করবে 'হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম । কতই না ভালো হতো!' কিন্তু তাতে তাদের কোনোই উপকার হবে না ।

পরকালে উল্লিখিত ব্যবস্থাপনায় কোনো পরিবর্তন আনা হবে না, এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিজস্ব সিদ্ধান্ত যা পরিবর্তন করার কারো কোনো ক্ষমতা নেই ।

মানব জাতিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে তা মোকাবেলা করতে হবে ।

বিচারের মাঠের বর্ণিত বিষয়গুলোকে এবার পর পর সাজিয়ে নিলে দাঁড়ায়–

১. আমাদের এ জীবনময় পৃথিবীটি এক সময় 'কিয়ামাতের' মাধ্যমে ধ্বংস হবে।

২. আল্লাহ্ তা'আলা যে পদ্ধতিতে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে আবার নতুন করে, নতুন কাঠামোতে এ জগতকে সৃষ্টি করবেন।

৩. প্রথম সৃষ্টিতে প্রায় ১০,০০০ কোটির অধিক গ্যালাক্সি মহাবিস্ফোরণে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সৃষ্টিতে মাত্র একটি গ্যালাক্সির আভ্যন্তরীণ বস্তুভর সমষ্টি সঙ্কুচিত হয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে বৃহৎ-বৃহৎ অগণিত গ্রহ (বিচারের ময়দান হিসেবে) সৃষ্টি হচ্ছে এবং হবে।

৪. দ্বিতীয় সৃষ্টির বেলায় কোনো নক্ষত্র বা সূর্য সৃষ্টি হবে না। শুধুমাত্র বিচারের নিমিত্তে বহুজগতের জন্য বহু সংখ্যক বিশাল-বিশাল গ্রহ জন্ম নিবে।

৫. নক্ষত্র ও তার কর্তৃত্ব না থাকায় ব্যাপক-বিশাল বস্তুভর দিয়ে গঠিত গ্রহগুলো 'মহাকর্ষ' বলের (Gravity) মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে মহাশূন্যলোকে বিরাজমান থাকবে।

৬. আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর' (বিশেষ কসমিক-রে) এর সরাসরি ব্যবস্থায় পরকালের যাবতীয় ব্যবস্থা ও কার্যক্রম আলোকিত হবে।

৭. মানব জাতির বিচারের নিমিত্তে হাশরের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নিজে তাঁর কুরসি ও সম্মানিত ফিরিশতাদেরকে নিয়ে উপস্থিত হবেন বিধায় বস্তুজগতের নগণ্য নক্ষত্র দিয়ে আলোকসজ্জা তৈরী শোভনীয় হতে পারে না, তাই আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর পবিত্র 'নূর' দিয়েই সরাসরি পরকাল আলোকিত করবেন।

৮. প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সৃষ্ট বিচারের মাঠে তাপমাত্রার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হবে। কোথাও তাপমাত্রা সহ্যের সীমার চেয়েও বেশি রাখা হবে, আবার কোথাও নাতিশীতোষ্ণ পর্যায়ে রাখা হবে।

৯. বিচারের মাঠ নামক সৃষ্ট নতুন গ্রহটি (জগতটি) পুরোটাই সমতল, উঁচু-নিচুহীন একক ময়দানে রূপ নিবে এবং বিশাল আকৃতিতে আবির্ভূত হবে।

১০. অনুরূপ পরিবর্তন আকাশমণ্ডলীতেও (কয়েকটি আকাশে) আনা হবে। অর্থাৎ সমগ্র গ্যালাক্সিতেই একই ধরনের বহু গ্রহ জন্ম নিবে।

১১. মানুষ মাটি থেকে জন্ম নিয়ে ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পৃথক হয়ে যাবে। 'অগ্রবর্তী দল' ও 'ডানদিকের দল' আল্লাহ্‌র আরশের ছায়ায় অবস্থান লাভ করে কল্যাণের অধিকারী হবে। হাশরের মাঠে কোনো প্রকার কষ্ট ও গ্লানির ছোঁয়া পর্যন্ত তারা পাবে না। তাদের মুখমণ্ডল হবে হাসি-খুশী ও আনন্দপূর্ণ।

১২. 'বামদিকের দল'-এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে অবিশ্বাসীরা ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা। তুলনামূলক উত্তপ্ত পরিবেশে তাদের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকবে না, বর্ণনাতীত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় তাদের আর্তনাদ ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাবে। মুখমণ্ডল বীভৎস্য ও ধূলিমলিন হবে। ভয়ে সকল প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়বে।

১৩. নক্ষত্রবিহীন পরিবেশে 'নূর'-এর আলোয় উদ্ভাসিত বিচারের মাঠে রাত্রির আগমন না থাকায় সময়ের স্কেল একমুখী দীর্ঘ স্রোতে (শুধু-ই দিন-এ) প্রবাহিত হওয়ায় পাপিষ্ঠরা তাদের পৃথিবীর জীবনকে পরকালের তুলনায় একটি মুহূর্ত-ই মনে করবে।

১৪. মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরকালে এ ব্যবস্থা অবশ্যই কার্যকর হবে, তা প্রতিরোধ বা অকার্যকর করার ক্ষমতা কারো নেই।

যুক্তিকতা ঃ ১. যেহেতু পৃথিবীর ন্যায় বিচারের মাঠে মানুষগুলোকে পুনর্বার বসতবাড়ি করে জীবন নির্বাহের জন্য উঠানো হবে না, বরং উঠানো হবে পৃথিবীর জীবনের হিসাব নেয়ার জন্য। তাই রাত এবং দিনের আবর্তন প্রয়োজন না থাকায় নক্ষত্রের (সূর্যের) সৃষ্টিও মূল্যহীন। দিন ও রাতের আবর্তনের জন্যই নক্ষত্রের আলোর প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাই 'নূর' দিয়েই নতুন জগৎ সরাসরি আলোকিত করা হবে।

২. বিচারের মাঠে একটানা বিচারকার্য সম্পাদনের নিমিত্তে ঐ সময়টি যতো দীর্ঘ-ই হোক না কেন পুরো সময়টি আলোকময় দিন হওয়া-ই শ্রেয়। সেখানে রাতের আগমন মানেই হচ্ছে একটানা কাজের মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া। আর সেজন্যই হয়তো বা আল্লাহ্ তা'আলা নিজ 'নূর'-এর আলো দিয়ে সরাসরি হাশরের মাঠ আলোকিত করার সিদ্ধান্ত করে থাকবেন। এতে সেখানে রাতের আগমন ঘটবে না।

৩. আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর 'কুরসি'সহ স্বসম্মানে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেন বান্দাহদের বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য। অতএব তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নগণ্য বস্তুজগতের নক্ষত্র দিয়ে আলোকসজ্জা তৈরী মোটেই শোভনীয় নয়, তাই তাঁর পবিত্র সত্তার সর্বোচ্চ গৌরব ও মহিমা প্রকাশার্থে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মৌলিক আলো সরাসরি তাঁর 'নূর' দিয়ে-ই তাঁর আগমন স্থলে আলোকসজ্জা তৈরী হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত, শোভনীয়, সম্মানীয় এবং উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪. বিচার অনুষ্ঠানের পর ঐ ময়দানে তখনকার মতো আর প্রয়োজন না থাকায় (কেননা পরক্ষণেই জান্নাতিগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে বাধ্য হয়ে চলে যাওয়ায় ময়দানটি খালি পড়ে থাকবে) স্বল্প সময়ের জন্য সৌর ব্যবস্থার উদ্ভব নিষ্প্রয়োজন, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'নূর' দিয়েই বিচারের মাঠ আলোকিত করার সিদ্ধান্ত করে থাকতে পারেন (প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্-ই ভালো জানেন)।

৫. ইহজগত তথা বস্তুজগতের তুলনায় পরজগত বা আধ্যাত্মিক জগৎ কল্পনাতীতভাবে উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর। তাই বিচারের মাঠে নক্ষত্রের আলোর তুলনায় আল্লাহ্‌র 'নূর'-এর মাধ্যমে সরাসরি আলোকিত করা অবশ্যই সর্বোচ্চ মর্যাদা, সম্মান ও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা বিধায় উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকবে।

"বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (২৯ : ২০)

"সমগ্র মহাবিশ্ব আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর' দিয়ে সৃষ্টি।" (২৪ : ৩৫)
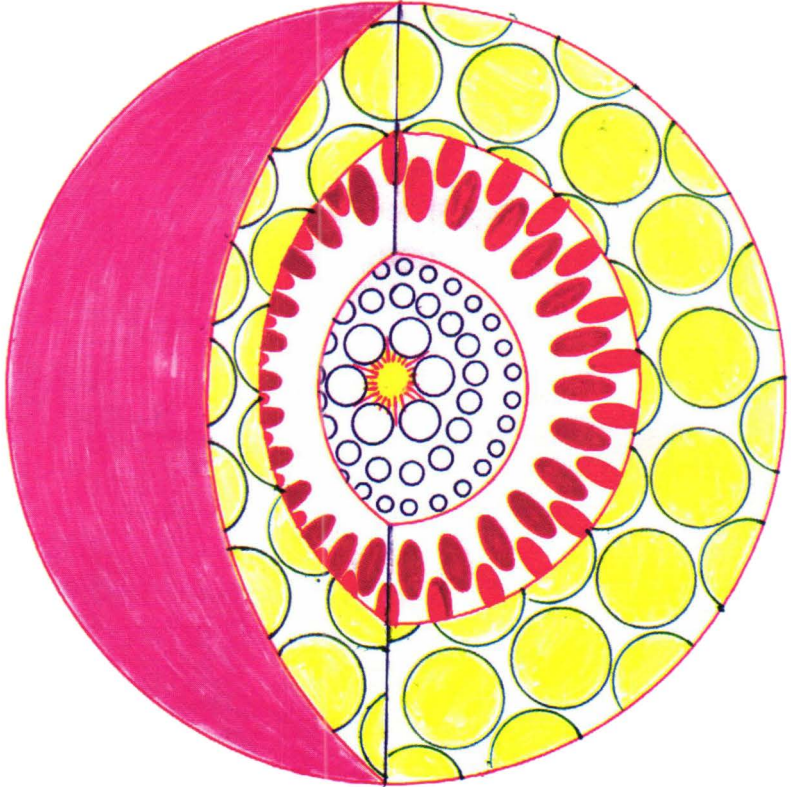
চিত্র-৬৮

–বর্তমান সময়ে পূর্বের তুলনায় ব্যাপক প্রসার ঘটায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ঘেঁটে মানব সমাজ জানতে পারছে এ মহাবিশ্বটি মূলতই 'আলোকশক্তি' (নূর) থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে 'কুরআন' এ তথ্য মানব জাতির নিকট প্রকাশ করেছে আর বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দিতে তা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞান আরো দাবী করছে, মহাবিশ্ব ভরপুর হয়ে আছে অসংখ্য অজানা আলোকরশ্মি দিয়ে যা আমরা এখনো জানি না। প্রযুক্তিগত যত উন্নতি ঘটবে ভবিষ্যতে ততবেশি আলোকরশ্মির উদঘাটন সম্ভব হবে। ছবিতে মহাবিশ্বের Section Venw দেখানো হয়েছে।

সুতরাং 'কুরআন' যে সত্য বাণী তা জ্ঞানবান মানুষ অস্বীকার করতে পারে না।

"আমি (আল্লাহ্) কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে ওরা সন্দেহ পোষণ করবে?" (৫০ : ১৫)

"নিশ্চয়ই সে (নবী) তাঁকে আরেকবার দেখেছিল সীমান্তে (সিদরাতুল মুনতাহা) কুল বৃক্ষের নিকট, যার সাথেই জান্নাত অবস্থিত। যখন বৃক্ষটি যদ্দারা (নূর দ্বারা) আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্দারা আচ্ছাদিত ছিল। তার দৃষ্টি (এতে) বিভ্রম ঘটেনি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে (নবী) তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।" (৫৩ : ১৩-১৮)
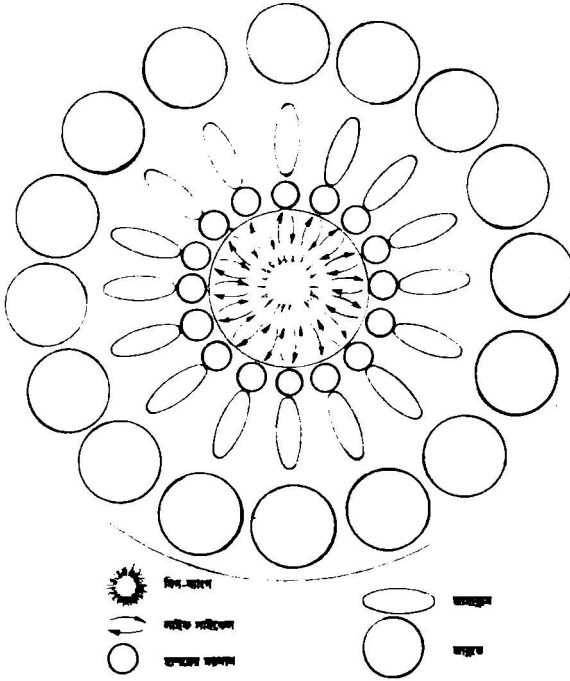
চিত্র-৬৯

-বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আজকের দিনে যেভাবে জানতে পারছি মহাবিশ্বব্যাপী অগণিত-অসংখ্য আলোকরশ্মির অস্তিত্ব ও তাদের গঠনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, তেমনি 'কুরআন' থেকেও আমরা আকাশ জগতের আলোকশক্তি তথা আল্লাহ্ তা'আলার 'নূর'-এর বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের তথ্য বিজ্ঞানেরও বহু পূর্ব থেকে অবহিত হতে পেরেছি। যেমন ঃ রাসূল (সা)-এর মে'রাজ-এর আকাশজগতে ভ্রমণ কাহিনী, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে তাঁর উম্মাতের উপর তুর পর্বতের বিশেষ আলোকরশ্মির পতন ইত্যাদি ঘটনাতে মহাবিশ্বে বিরাজমান অসংখ্য আলোকরশ্মির উপস্থিতি প্রকাশিত হয়েছে।

বিজ্ঞান

দিন যতোই অতিবাহিত হচ্ছে, বিজ্ঞানের নিরপেক্ষ আবিষ্কারমূলক অবদানের প্রতি মানুষের জ্ঞানগত আকর্ষণ ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদিও বিভিন্ন বাস্তব কারণে পূর্বে এ অবস্থা ছিল না। বর্তমান সময়ে এটা বড়ই আশার কথা যে বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও উদঘাটনসমূহ এতোই বিস্ময়করভাবে এগিয়ে যাচ্ছে যে তা মহাবিশ্বে বস্তুজগতের বিষয়সমূহ নান-াভাবে বাস্তবতার আলোকে দাঁড় করিয়ে প্রমাণিত করছে। আর তা না করেই বা বিজ্ঞানের উপায় কি? বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান, তাই মহাসত্যতায় প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্‌ এবং তাঁর সৃষ্টি জগৎ এর বিভিন্ন দিক ও বিভাগে জ্ঞানের যে মণি-মুক্তা ছড়িয়ে আছে, বিজ্ঞান তার জ্ঞানের মাপকাঠিতে তা আয়ত্ত করে মানব সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরতে বাধ্য হচ্ছে। এতে বড় উপকার সাধিত হচ্ছে এই যে, একদিকে বর্তমান মানব সভ্যতা মহাবিশ্বের দৃশ্য অদৃশ্য অসংখ্য বিষয়ের মূলে নিহিত সঠিক 'তত্ত্ব ও তথ্য' অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করছে এবং অপরদিকে ঐ সকল জ্ঞানের নিদর্শনের মাধ্যমে মহাবিশ্বের প্রকৃত স্রষ্টাকে চেনার ও জানার ভেতর দিয়ে তাঁর নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনার জন্য আগ্রহান্বিত হচ্ছে, এ মহাবিশ্বের মূল উদ্দেশ্যও মূলত এটাই।

'মহাকাশ বিজ্ঞান' বর্তমান বাস্তবতার আঙ্গিকে প্রবেশ করার পূর্বে একটা দীর্ঘসময় পর্যন্ত মানুষের কল্পনার ভেলায় এবং অদ্ভুত পৌরানিক কাহিনীর মুখরোচক গল্পের আকারে মুখে মুখে ফিরতে ছিল। প্রাচীন চীনাদের 'ইন' (Yin) এবং 'ইয়েং' (Yang) এর পরস্পর বিপরীত প্রভাবে আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির কথা, ছন্দোগ উপনিষদের 'কসমিক ডিম, বেলামারদুকের ড্রাগন কাটা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি, মিশরীয়দের আকাশদেবীর উর্ধ্বাকাশ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবিলনীয়দের 'রা-দেব' (Ra-God) ও সুন্দর নৌকা যা অনিষ্ট ও ধ্বংস থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করার কথা, প্রাচীন হিন্দুদের চারটি

অতিকায় হাতীর পৃষ্ঠে বাহিত এই পৃথিবীর তথ্য, ইত্যাদি সবই মানুষের যুগে যুগে কল্পনার ফসলমাত্র। উল্লিখিত তথ্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে 'হাবার্ট ফ্রেডম্যান বলেছেন 'In such fashion did ancient man see earth at the centere of the Universe' অর্থাৎ এভাবেই প্রাচীন মানুষ এ মহাবিশ্বের কেন্দ্ররূপে 'পৃথিবী'কে চিহ্নিত করে নিয়েছিল। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যা 'Geocentric Theory' হিসেবে পরিচিত।

এরপর অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে লাগলো, বিজ্ঞান তার পা-পা করে আলো-আঁধারে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। সর্বপ্রথম গ্রীক একজীমাণ্ডার (৬১০-৫৪৬ বি,সি) তথ্য পেশ করলেন যে, পৃথিবী একটি প্রসারিত বস্তু নয় বরং এর পৃষ্ঠতল বক্র, কিন্তু পৃথিবী কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা তখনও প্রবল ছিলো। এরপর 'পীথাগোরাস' এসে অঙ্ক কষে পৃথিবী কেন্দ্রিক তথ্যকে আরও মজবুত করে দিলেন এবং পৃথিবীকে স্থির ও গোলাকার বস্তুপিণ্ডরূপে তুলে ধরলেন। তিনি আরও তথ্য দিয়ে বললেন– সূর্য, চন্দ্র ও তৎকালীন আবিষ্কৃত ও জানা ৫টি গ্রহ পৃথিবীর চারদিকে পথ পরিক্রমণ করে থাকে। তারপর দার্শনিক 'এ্যারিস্টোটল' এসে উক্ত ধারণায় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ফলে 'ভূ-কেন্দ্রিক' ধারণা দীর্ঘ সময় প্রভাব বিস্তার করে রাখতে সমর্থ হয়। অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ২৪০ অব্দে গ্রীসের বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর গোলাকার পরিধি নির্ণয়ে ও চন্দ্রের ব্যাস নিরূপণে সফল হন। 'এ্যারিস্টোকাস' সর্বপ্রথম পৃথিবী কেন্দ্রিক ধারণারও বিরোধিতা করে সূর্য কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা ব্যক্ত করেন, কিন্তু যথার্থ তথ্য প্রমাণের অভাবে তার সে প্রস্তাব তখন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

তারপর গ্রীক জ্যোতিবিদ্যার সর্বশেষ ল্যাণ্ডমার্ক 'টলেমি' (১০০-১৭৮ এ ডি) এসে তার পূর্বসূরীদেরই সমর্থন জানালেন। টলেমির প্রস্থানের পরও প্রায় ১৫০০ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ষোল শতাব্দির মাঝামাঝি পর্যন্ত মানুষ উক্ত পৃথিবী কেন্দ্রিক ধারণায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বিশ্বাসী ছিলো। এরপর 'নিকোলাস কোপার্নিকাস' এসে তার সূর্যকেন্দ্রিক দৃঢ় প্রস্তাব দ্বারা সর্বপ্রথম পূর্বের

"মানব সৃজন অপেক্ষা মহাবিশ্ব সৃষ্টি তো কঠিনতর কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"
(৪০ : ৫৭)
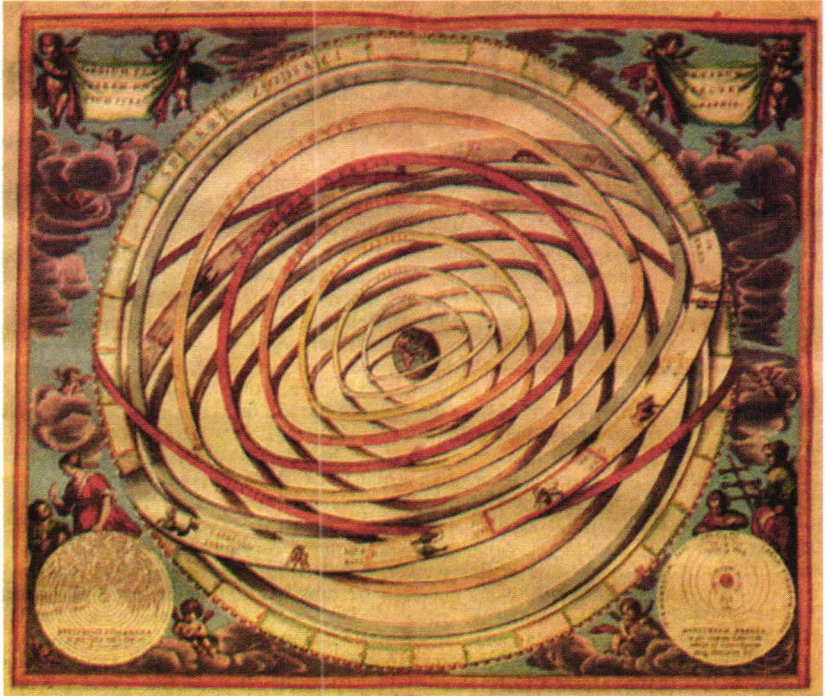
চিত্র-৭০

—আমাদের এ মহাবিশ্বকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রথমদিকে মানব সমাজ অনুমান নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর জন্য কারণ ছিল তখন মানব সমাজে যথাযথভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেনি। আর তাই তখন তারা ভাবত দৃশ্যমান এ মহাবিশ্বের কেন্দ্র হচ্ছে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীকেই কেন্দ্র করে গ্রহ-নক্ষত্র, ধূমকেতু, উপগ্রহ ইত্যাদি মহাকাশীয় বস্তুগুলো তাদের প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে চলছে।

মূলত পৃথিবী এবং দৃশ্যমান সবটুকু মিলিয়ে তুলনামূলকভাবে যে মূল মহাবিশ্বের সম্মুখে বালি-কণার সমানও হতে পারে না সেকথা তখন কল্পনাও করতে তারা সক্ষম ছিল না। পরবর্তী সময়ে অবশ্য সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং মানুষ ক্রমান্বয়ে সবকিছুই জানতে পেরেছে।

"তিনিই (আল্লাহ্) মানুষকে জ্ঞাত করেছেন ইতোপূর্বে মানুষ যা জানতো না।" (৯৬ : ৫)
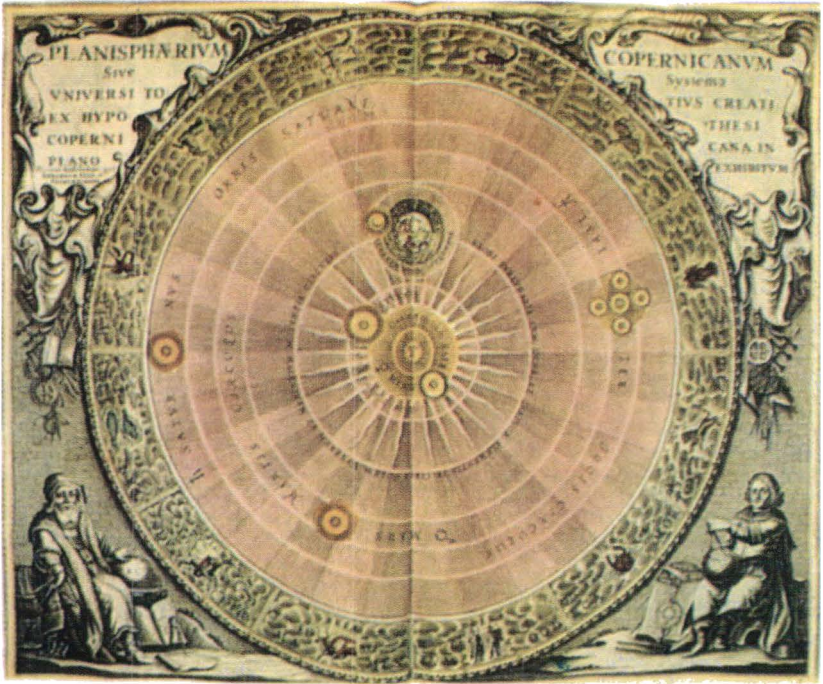
চিত্র-৭১

–'এ্যারিস্টোকাস' সর্বপ্রথম 'পৃথিবী' কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণার বিরোধিতা করে 'সূর্য' কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা ব্যক্ত করেন। কিন্তু যথার্থ তথ্য প্রমাণের অভাবে তার সেই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এরপর 'নিকোলাস কোপার্নিকাস' এসে সূর্য কেন্দ্রিক মহাবিশ্বের (Heliocenric Theory) পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৫৭২ সালে 'টাইকো ব্রাহে' এসে 'সূর্য কেন্দ্রিক' মহাবিশ্বকে আরো দৃঢ় করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন– 'আমাদের মহাবিশ্ব কখনোই নিথর নয়, নিখুঁত নয়, অপরিবর্তনশীলও নয়। সূর্যকে কেন্দ্র করে সবাই ঘুরছে ঠিকই, তবে সূর্যও তার আসনে স্থির নয় বরং সেও ঘুরছে।" অবশ্য তখনও মহাবিশ্বের সীমানা প্রকৃত সৌরজগতকে ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারেনি।

প্রস্তাবকে আঘাত করেন। তিনি দাবী করেন পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র বিন্দু নয় বরং সূর্য হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু, সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসমূহ চতুর্দিকে ঘুরছে। উক্ত প্রস্তাবটি পরবর্তীতে 'হেলিও সেন্ট্রিক তত্ত্ব' (Helio centric Theory) নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কিন্তু কোপার্নিকাসের তথ্য- As if seatedupan a royal thorne, the Sun rules the family of the planets as they circle round– অর্থাৎ সূর্য তার রাজকীয় সিংহাসনে স্থির হয়ে বসে তার চারদিকে ঘূর্ণনরত গ্রহদের শাসন করে থাকে, একথা পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি 'টাইকো ব্রাহে' (Tycho-Brahe ১৫৪৬-১৬০১)। তিনি ১৫৭২ সালে ঘোষণা করলেন, আমাদের জানা মহাবিশ্ব কখনই স্থির নয়, নিখুঁত নয়, অপরিবর্তনশীলও নয়, সূর্যকে কেন্দ্র করে সবাই ঘুরছে ঠিকই, তবে সূর্যও তার আসনে স্থির নয় বরং সেও ঘুরছে। এই ঘূর্ণন পরস্পর পরস্পরের চারদিকে।

তারপর এলেন গ্যালিলিও। তিনি ১৬০৯ সালে সর্বপ্রথম 'টেলিস্কোপ' (Telescope) আবিষ্কার করে মহাকাশ বিজ্ঞানে এনে দিলেন নতুন জোয়ার। তিনি চাঁদ, বিভিন্ন গ্রহ ও নিকটবর্তী নক্ষত্রের প্রতি টেলিস্কোপ দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনেক নতুন নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করে ঘোষণা করলেন– মহাবিশ্বে কোনো কিছুই স্থির নেই, সূর্যও নয়। সূর্য একদিকে যেমন নিজে ঘুরছে, অপরদিকে তার পরিবারের সকল গ্রহ-উপগ্রহকে তার চতুর্দিকে ঘূর্ণনরতাবস্থায় ধরে রেখেছে। অতঃপর ১৬৮৭ সালে ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী নিউটনের প্রকাশিত Philosophiae Naturalis Principia Mathematica'-তে মহাজাগতিক 'অভিকর্ষ বল' (Gravity) ও সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণে বিশুদ্ধ তথ্য-প্রমাণ এবং গণিতের মাধ্যমে 'হেলিও সেন্টিক' (Helio centric) প্রস্তাব অনুমোদন করেন। তিনি বিভিন্নভাবে প্রমাণ করে দেখান যে আমাদের সৌরজগতটি মূল মহাবিশ্ব নয় এবং সৌরজগতের ভেতর অবস্থিত প্রতিটি গ্রহ ও উপগ্রহ মূলত সূর্যের অভিকর্ষ বলের (Gravity)-র দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থেকেই চতুর্দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

"পৃথিবীতে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করো এবং অনুসন্ধান করো।" (২৯ : ২০)
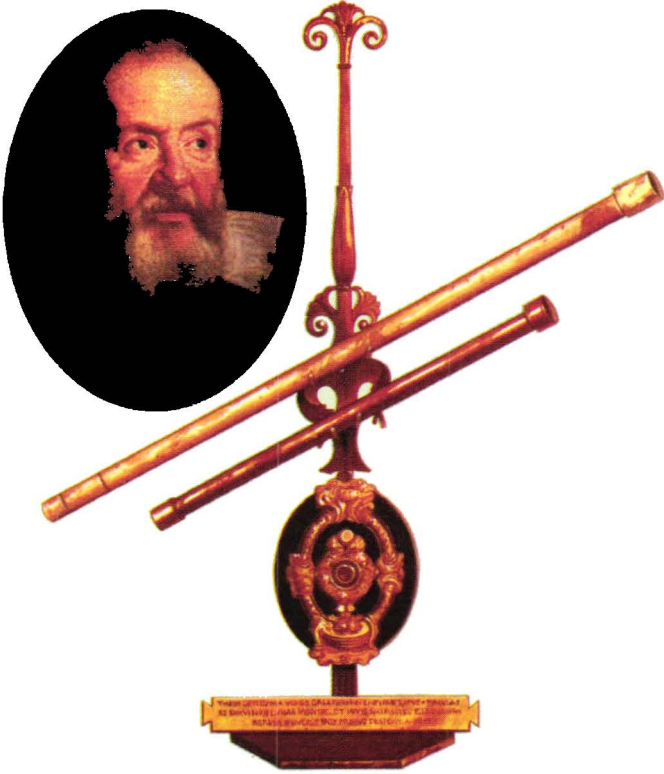
চিত্র-৭২

–বিজ্ঞানী 'গ্যালিলিও' ১৬০৯ সালে সর্বপ্রথম টেলিস্কোপ আবিষ্কার করে মহাকাশ বিজ্ঞানে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি চাঁদ, বিভিন্ন গ্রহ ও নিকটবর্তী নক্ষত্রদের প্রতি টেলিস্কোপ-এর সাহায্যে দৃষ্টি দিয়ে রীতিমত হতবাক হয়ে যান এবং পর্যবেক্ষণ করে অনেক নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করে ঘোষণা করেন– এ মহাবিশ্বে কোন কিছুই স্থির নয়। এমনকি সূর্যও নয়। সূর্য একদিকে নিজে ঘুরছে অপরদিকে তার পরিবারের সকল গ্রহকে তাদের উপগ্রহসহ তার চতুর্দিকে ঘূর্ণনরতাবস্থায় ধরে রেখেছে। মানব সমাজ তখন তার উদ্ভাবিত টেলিস্কোপ দিয়ে উল্লেখিত তথ্যগুলো স্বচোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলেও প্রকৃত মহাবিশ্বের আসল আকৃতি ও সীমানা তখনও জানতে পারেনি। জেনেছে আরো অনেক পরে।

মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক। এই আকর্ষণ শক্তির পরিমাণ হলো দুটি ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ বস্তু দুটির ভরকে গুণ করে তাদের দূরত্বের বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফলাফল পাওয়া যায় তার সমান (m_1 x m_2 x d^2) । উক্ত তথ্যে স্পষ্টভাবেই ফুঠে উঠেছে যে মহাবিশ্বে যে কোনো বস্তুই অপর যে কোনো বস্তুকে 'মহাকর্ষ বলের' (Gravity) মাধ্যমে পরস্পরকে আকর্ষণ করছে, সেজন্য একাধিক গ্রহের বেলায় কেন্দ্রে নক্ষত্র অবস্থান করা জরুরী নয়। শুধুমাত্র একটি সূর্যকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত সৌরপরিবার গঠনের জন্যই কেন্দ্রে নক্ষত্র বা সূর্য থাকা একান্ত প্রয়োজন, যাতে করে 'গ্রহ' নামক পরিবারের সদস্যরা সূর্যকে কেন্দ্র করে 'মহাকর্ষ বলের' মাধ্যমে চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে পারে। মহাবিশ্বে এই অদ্ভুত মহাকর্ষ বলের কারণে দুই বা ততোধিক নক্ষত্র কিংবা গ্রহ এমনকি গ্যালাক্সি পরস্পর পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে মহাশূন্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে ভাসমান অবস্থায় টিকে থাকতে পারছে। বর্তমান উৎকর্ষিত প্রযুক্তির প্রয়োগ করে বিজ্ঞানবিশ্ব ইতোমধ্যেই 'বাইনারী স্টার', 'গ্যালাক্সি গুচ্ছ' (Cluster) ও একাধিক গ্রহ পরস্পর পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে ভারসাম্য আনয়নের মধ্যে উল্লিখিত তথ্যের বাস্তব প্রমাণ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ের প্রয়োজনে আমরা এখানে শুধু নক্ষত্রবিহীন গ্রহদের নিজেদের মধ্যে 'মহাকর্ষ বলের' (Gravity) কার্যকারিতা নিয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। এক সময় বিজ্ঞানবিশ্বসহ সর্বত্র বিশ্বাস করা হতো যে, সূর্য বা নক্ষত্র ছাড়া মহাকাশে গ্রহদের ভাসমান অবস্থায় টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা সে বিশ্বাসের ভীতকে ইতোমধ্যেই গুড়িয়ে দিয়েছে। প্রমাণ করেছে নক্ষত্র বা সূর্যের বন্ধন শক্তি বা আবদ্ধতার বাইরেও গ্রহসমূহ নিজেরাও পরস্পর পরস্পরকে 'মহাকর্ষ বল' দ্বারা প্রদক্ষিণের মাধ্যমে ভারসাম্য সৃষ্টি করে

"তিনিই আল্লাহ, যিনি সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন অনুরূপ বহু সংখ্যক পৃথিবী। ঐসকল জগতেও তাঁর হুকুম নাযিল হয়। যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপরই ক্ষমতা রাখেন আর আল্লাহর জ্ঞান প্রতিটি জিনিসকে ঘিরে রয়েছে।" (৬৫ : ১২)
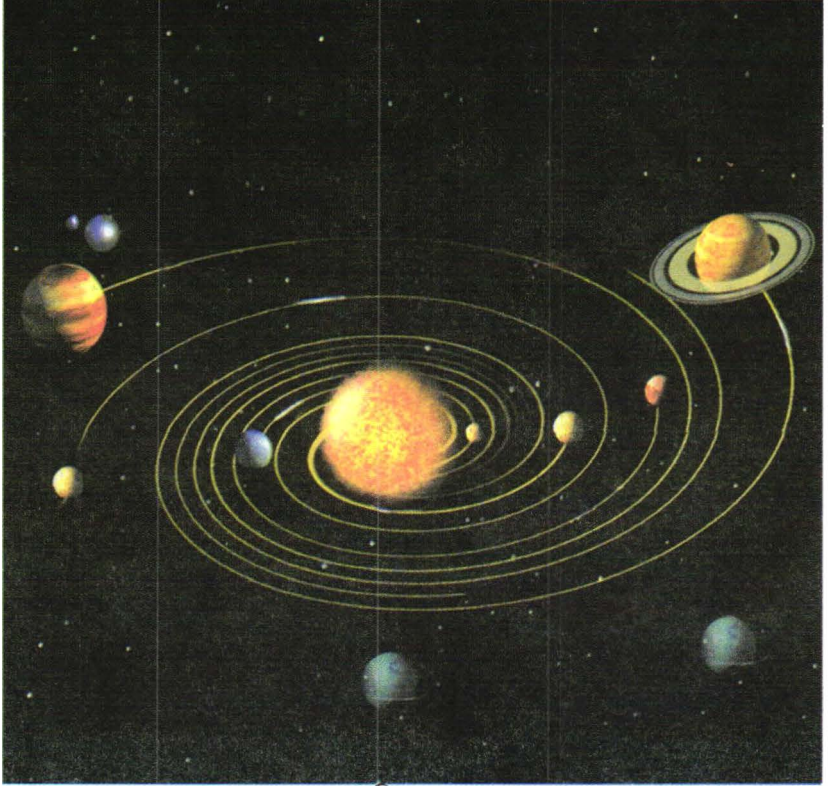
চিত্র-৭৩

"১৬৮৭ সালে এলেন ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী 'নিউটন'। তিনি মহাজাগতিক 'অভিকর্ষ বল' (Gravity) বা 'মহাকর্ষ বল' আবিষ্কার করে 'সূর্য কেন্দ্রিক তত্ত্ব'কেই অনুমোদন করলেন। তিনি বিভিন্নভাবে প্রমাণ করে দেখালেন যে সৌরজগতটি মূল মহাবিশ্ব নয় এবং এ মহাবিশ্বে প্রতিটি বস্তুই অপর বস্তুকে 'মহাকর্ষ বল'-এর মাধ্যমে পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। সেজন্য একাধিক বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে মহাকাশে টিকে থাকতে পারে পরস্পর পরস্পরের প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাইনারী স্টার, গ্যালাক্সিগুচ্ছ (Claster) কিংবা একাধিক গ্রহ ব্যবস্থা যেখানে কেন্দ্রে নক্ষত্র নেই বিজ্ঞানীদের কাছে ইতোমধ্যে মহাকাশে তা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বাস্তব ছবিও ধারণ করা হয়েছে।

মহাশূন্যে টিকে থাকতে সক্ষম। অতি সম্প্রতি আমাদের মিলকি-ওয়ে গ্যালাক্সির 'ওরিয়ন বেল্টে' (Orion belt) একাধিক গ্রহের (এক গুচ্ছে প্রায় ১৩টি গ্রহের) সন্ধান বিজ্ঞানীগণ লাভ করেছেন, যাদেরকে কোনো নক্ষত্রের আওতায় বা বন্ধনে আছে বলে সনাক্ত করা যায়নি। সেখানে গ্রহগুলো নিজেদের মাঝে অভিকর্ষ বলের মাধ্যমে পরস্পর প্রদক্ষিণ করার প্রক্রিয়ায় ভারসাম্য আনয়নের ভেতর দিয়ে ব্যবস্থিত হয়ে আছে। নিকট অতীতে জাপানী বিজ্ঞানীগণও মহাকাশে ২টি 'Free floating planet' আবিষ্কার করতে সক্ষম হন।

বক্ষমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সমান প্রায় অর্থাৎ বিরাট বিশাল অস্তিত্বসম্পন্ন গ্রহের সম্ভাব্যতা। এ বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানের হাতে একাধিক বাস্তব প্রমাণ ইতোমধ্যেই হাজির হয়েছে। এ পর্যন্ত আমাদের সৌরপরিবারের বাইরে অন্যান্য নক্ষত্রের আওতায় প্রায় ৬০০টির অধিক গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। তার মধ্যে বহু সংখ্যক গ্রহকে আমাদের পৃথিবীর তুলনায় বেশ বড় বলে প্রমাণ সাপেক্ষে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, এদের মধ্যে আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় গ্রহটি আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের চাইতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার (৩৫০০) গুণ বড়। এতে প্রমাণ হয়েছে মহাবিশ্বে এর চাইতেও বড়– বৃহৎ গ্রহ আরও কোটি কোটি হিসাবে বর্তমান থাকা কোনো বিচিত্র কিছু নয় এবং তদ্রূপ নতুনভাবে আরও সৃষ্টি হওয়া কোনো সমস্যার কথা নয়, বরং খুবই সম্ভব।

এছাড়াও Orion nebula-তে প্রায় ১০০টির অধিক 'ব্রাউন ডর্‌ফ' (Brown dwarf)-এর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীগণ, যেগুলো আমাদের সূর্যের তুলনায় প্রায় ১.৩% বেশি বস্তুভর দিয়ে গঠিত, অর্থাৎ গ্রহরাজ বৃহস্পতির চেয়ে প্রায় ১৩ গুণ বেশি বস্তুভর সম্পন্ন। এ 'ব্রাউন ডর্‌ফ'গুলো নক্ষত্রের মতো কেন্দ্রে পারমানবিক চুল্লী প্রজ্জ্বলিত করার নিমিত্তে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল সংগ্রহ করতে না পারায় নক্ষত্র হিসেবে রূপ নিতে পারেনি, তবে তাদের সৃষ্টিক্ষণে প্রচণ্ড সঙ্কোচনে উদ্ভূত চাপ ও তাপের কারণে প্রায় ৩০০০

"অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য।" (১৬ : ৬৭)
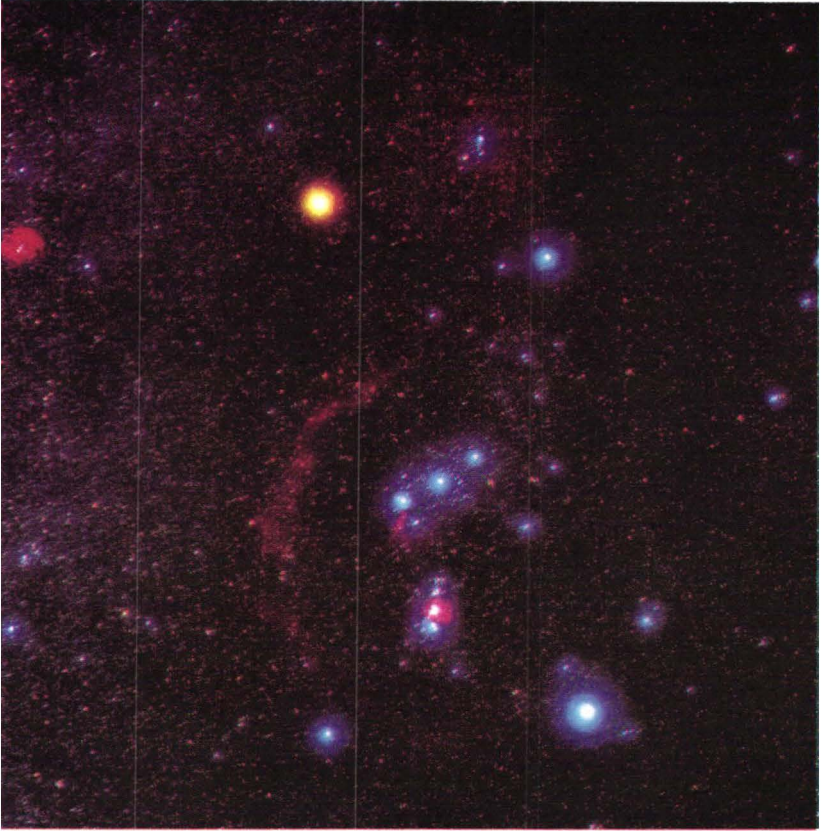
চিত্র-৭৪

–ছবিতে 'Orion belt' দেখা যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে এই 'Orion nebula'-র দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ১৬০০ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ আলোর গতিতে গেলেও পৃথিবী থেকে আমাদের প্রায় ১৬০০ বছর লেগে যাবে। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ এখানে টেলিস্কোপের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করতে গিয়ে পূর্বের আবিষ্কার ও সিদ্ধান্তের বাইরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মহাজাগতিক বিষয় আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারগুলো বিজ্ঞান জগতকে নতুনভাবে ভাবতে সুযোগ এনে দিয়েছে। বিষয়গুলোর মধ্যে আছে– নক্ষত্রবিহীন একগুচ্ছ গ্রহের সন্ধান, যেখানে শুধুমাত্র ১৩টি গ্রহ অবস্থান করছে, প্রায় ১০০টির অধিক 'ব্রাউন ডরফ' আবিষ্কার করেছে যেগুলো আমাদের সূর্যের তুলনায় প্রায় ১.৩% বেশি বস্তুভর দিয়ে গঠিত।

"মহাবিশ্বে যা কিছুই দৃষ্টির আওতা বহির্ভূত তা সবই আল্লাহ্‌র ।" (১১ : ১২৩)

Free-Floating Planets In Orion

Credit: Philip Lucas (Univ. Hertfordshire) and Partick Roche (Univ. Oxford), UKIRT

চিত্র-৭৫

–বর্তমান বৈজ্ঞানিক চরম উৎকর্ষতার যুগে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন বিস্ময়কর তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন করেই চলছে । পূর্বে বিজ্ঞানের ধারণা ছিল নক্ষত্রকে কেন্দ্র করেই কেবল গ্রহগুলো ওর চারদিকে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ভারসাম্য সৃষ্টি করে মহাশূন্যে টিকে থাকে । কিন্তু ইদানিং বিজ্ঞানীগণ Orion nebula-তে এক ঝাঁকে প্রায় ১৩টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন যেখানে আশে-পাশেও কোন প্রকার নক্ষত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি । গ্রহগুলো পরস্পর পরস্পরকে মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে আকর্ষণ করে প্রদক্ষিণ করার ভেতর দিয়ে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে মহাশূন্যে টিকে আছে । যা পূর্বে বিজ্ঞানীগণ ভাবতেও পারেননি । প্রমাণিত হয়েছে নক্ষত্র ছাড়াও গ্রহ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা মহাশূন্যে সম্ভব । পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই ব্যবস্থা আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করবেন ।

"তিনি সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কেও সুপরিজ্ঞাত।" (৬ : ১১০)
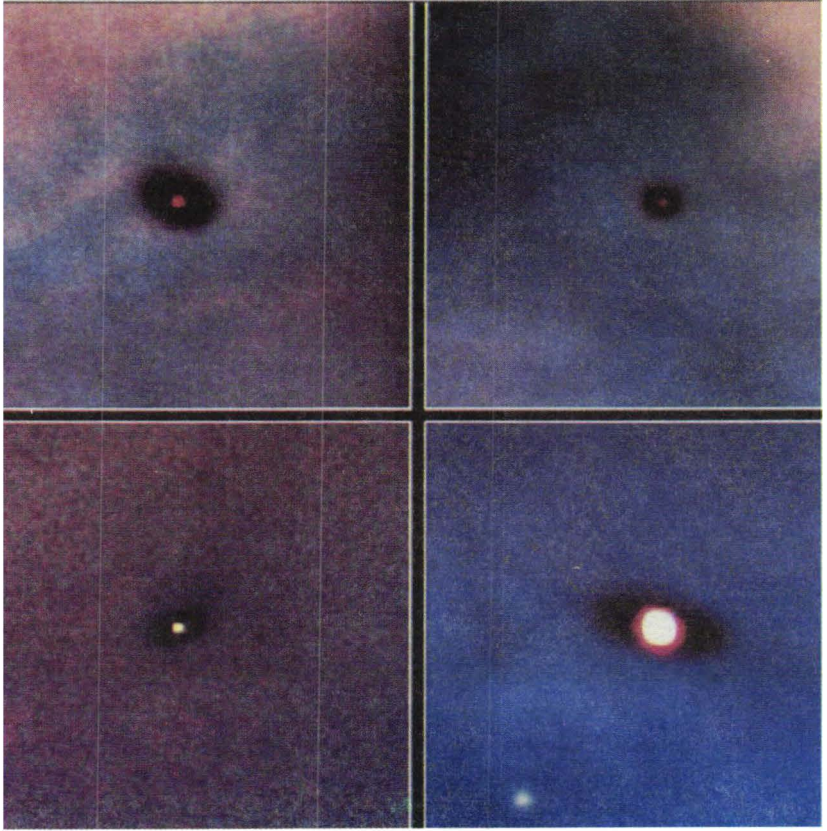
চিত্র-৭৬

–অতি সম্প্রতি জাপানী একদল বিজ্ঞানী মহাকাশে নক্ষত্রবিহীন মাত্র ২টি গ্রহের মাঝে পরস্পর-পরস্পরকে 'মহাকর্ষ বল' (Gravity)-এর মাধ্যমে আকর্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রদক্ষিণ করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে টিকে আছে– যেখানে নক্ষত্রের কোন প্রকার প্রয়োজন পড়েনি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আবিষ্কৃত গ্রহ দু'টির আশেপাশে কোথাও নিকটে কোন নক্ষত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। এতে প্রমাণ হল– নক্ষত্র ছাড়াও গ্রহ ব্যবস্থা মহাকাশে সৃষ্টি হয়ে টিকে থাকা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয় সার্ভিস বজায় রাখা যথাযথভাবে অসম্ভব কিছু নয়।

অতএব চলতি অধ্যায়ে যে, 'কুরআন' দাবী করেছিল পরকালে নক্ষত্রবিহীন বিচারের মাঠ তৈরী হবে এবং তা আলোকিত হবে আল্লাহ্‌র 'নূর' দিয়ে, সেই বিস্ময়কর তথ্য আজ বিজ্ঞান নিজেই প্রমাণ করে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। সত্য নয় কী?

"বলো, তোমরা কি আল্লাহকে মহাবিশ্বের এমন কোন কিছুর সংবাদ দিতে চাও, যা তিনি অবগত নন? নিশ্চয়ই তিনি (অজ্ঞানতা থেকে) অতি পবিত্র।" (১০ : ১৮)

চিত্র-৭৭

–অদ্যাবধি বিজ্ঞান প্রায় ৩০০টির কাছাকাছি নতুন নতুন গ্রহ ব্যবস্থা মহাকাশে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। এর মধ্যে ছোট, বড় ও মাঝারি বিভিন্ন ধরনের ও গড়নের গ্রহ বিদ্যমান আছে। সবচেয়ে বড় যে গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রায় আমাদের পৃথিবীর সাড়ে তিন হাজার (৩৫০০) গুণ বড় হবে। অর্থাৎ প্রায় ৩৫০০টি পৃথিবী জড় করলে আবিষ্কৃত গ্রহটির সমান হবে আয়তন। বিজ্ঞানীগণ বলছেন এত তেমন কিছু নয়– এর চেয়েও হাজার হাজার গুণ বড় গ্রহ এ মহাবিশ্বে থাকা খুবই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তাই যদি হয়, তাহলে 'কুরআন' যে পরকালের সৃষ্ট জগৎ ও জান্নাত (অগণিত উন্নত জীবনোপযোগী সামগ্রী দিয়ে ভরপুর বাগানবাড়ি) আকাশ ও জমিন সমান অর্থাৎ বিশাল বিশাল হবে বলে দাবী করেছে, তা ১০০%ই মহাসত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, যা বিজ্ঞান কর্তৃকও প্রমাণিত। যদিও কুরআনের পর আর কিছু নেই। বিশ্ববাসীর জন্য কুরআনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য কিতাব।

ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত 'সারফেস তাপমাত্রা' (Surface temparature) প্রদর্শিত হয়ে থাকে। যার কারণে লালচে বাদামী রং ধারণ করে মহাশূন্যে বিরাজ করায় প্রথমদিকেই এদের সহজে সনাক্ত করা সম্ভব হয়, পরবর্তীতে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে কমে গিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হলে গ্রহদের ন্যায় সহজে সনাক্ত করা যায় না। সম্প্রতি Philliplucas (University of Hert fordshire) এবং Patrick Roche (University of Oxford) নতুন ধরনের ক্যামেরা 'LIFTI' ও 'LIKIRT' ব্যবহার করে 'ওরিয়ন বেল্টের' ট্রাপিজিয়াম (Trapezium cluster) গুচ্ছে উল্লিখিত 'ব্রাউন ডর্‌ফ' ও 'মুক্ত ভাসমান গ্রহদের' (Free floating planets) আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। মুক্ত ভাসমান গ্রহগুলোর সবগুলোই গ্রহরাজ বৃহস্পতি গ্রহের তুলনায় কমপক্ষে ৮ গুণ বড়, এর চাইতে ছোট নয়। আর বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থা হচ্ছে, ওর আয়তন আমাদের পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩০০ গুণ বড় (1970s measurements of jupiter's gravitational field by the pioneer 10 and 11 probes suggested that Jupiter contained a rocky core weighing between 10 and 20 earth mass, which was buried under 300 earth masses of gas), এতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে– সদ্য আবিষ্কৃত 'ব্রাউন ডর্‌ফ'গুলো পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩৯০০ গুণ বড় বস্তুপিণ্ড হিসেবে মহাকাশে বিচরণ করছে। আরো মজার বিষয় হচ্ছে যে, এদের কোনোটি দেখা যাচ্ছে কোনো না কোনো নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে, আবার কোনোটি এককভাবে নিজ কক্ষপথে পৃথকভাবে (স্বাধীনভাবে) মহাকাশে পরিভ্রমণেরত আছে। মোটকথা সদ্য আবিষ্কৃত 'ব্রাউন ডর্‌ফ' (Brown dwarf)গুলো নক্ষত্ররূপে সৃষ্টি হতে না পারায় বর্তমান বিশাল বিশাল গ্রহদের ন্যায় আকৃতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করে মহাকাশে তাদের জীবন পরিক্রমা (Life cycle) চালিয়ে যাচ্ছে এবং ঐ জগতগুলোতে প্রাণের কোনো স্পন্দন আছে কি-না তা আগামী দিনে উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের অবদানে হয়তো বা পৃথিবীবাসী অবহিত হতে সক্ষম হবে।

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। তাঁর বাণী কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হবে না। তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন।" (৬ : ১১৫)
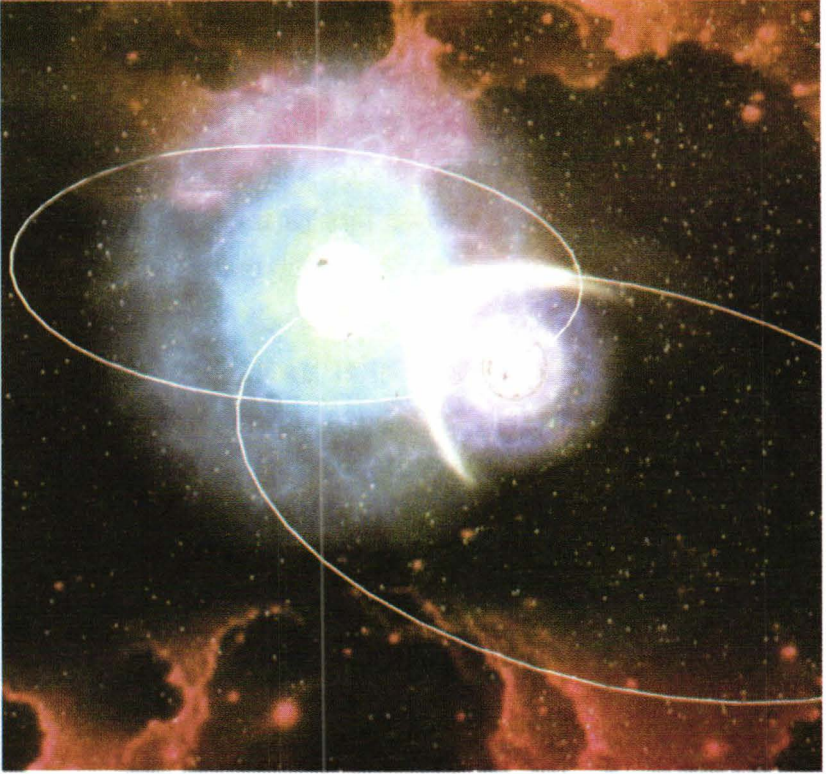
চিত্র-৭৮ (ক)

–পূর্বে আলোচিত 'Orion nebula'-তে বর্তমান বিজ্ঞান প্রায় ১০০টির অধিক 'ব্রাউন ডরফ' (Brown dwarf) আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, যেগুলোর আয়তন পৃথিবী নয় সূর্যের তুলনায় (সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮৬ লক্ষ মাইল) প্রায় ১.৩% বেশি বস্তুভর দিয়ে গঠিত ও বিশাল বিশাল আয়তন বিশিষ্ট এরা মূলত নক্ষত্র হওয়ারই কথা ছিল কিন্তু নক্ষত্রের মতো কেন্দ্রে পারমানবিক চুল্লী (Atomic reactar) প্রজ্জ্বলিত করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারেনি। তাই নক্ষত্রের রূপ নিতে ব্যর্থ হয়ে ব্রাউন ডরফে পরিণত হয়েছে। এদের সারফেস তাপমাত্রা প্রায় ২৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বিদ্যমান থাকায় এরা লালচে বাদামী রং ধারণ করে। পরবর্তীতে তাপমাত্রা কমে কমে প্রায় ৫০/৬০^{oC} -এ উপনীত হয়। যা মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে প্রমাণিত হচ্ছে– পরকালে বিচারের মাঠ বিশাল হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি সেখানে তাপমাত্রাও সহ্যের মাথা থেকে একটু বেশি রাখাও আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সম্ভব।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, 'ব্রাউন ডরফ' নামক ঐ প্রকাণ্ড বস্তুপিণ্ডগুলো বিজ্ঞানীদের হিসাব মতে মাত্র মিলিয়ন বছর পূর্বেই ওরিয়ন বেল্টে (Orion belt) ধোঁয়ার মেঘপুঞ্জ থেকে সঙ্কোচন (Compressed) প্রক্রিয়ায় জন্ম নিয়েছিল এবং মিলিয়ন বছরের মাথায় এসে তাদের সারফেস তাপমাত্রা (Surface temperature) মাত্র ২৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এভাবে আরও কয়েক হাজার বছর অতিক্রান্ত হলে তাপমাত্রা আরও অনেক নিচে নেমে আসবে এবং একসময় এমন এক স্তরে নেমে আসবে যখন এ পৃথিবীর মানুষের বর্তমান সহ্যের সীমা থেকে একটু উপরে থাকবে। (৫০/৬০°c তাপমাত্রা) যেখানে পৌঁছামাত্র মানুষের শরীরের চামড়া অসহ্য গরমের কারণে কিছুটা পুড়ে কালো হয়ে যেতে পারে। শরীর থেকে ব্যাপকহারে ঘাম নির্গত হতে পারে। মাথার মগজ টগ-বগ করে ফুটতে পারে। মুখমণ্ডল কালো মলিন হয়ে যেতে পারে। মানুষ ঐ সময়টিকে তার জন্য সবচেয়ে কঠিন সময় হিসেবেও আখ্যায়িত করতে পারে। যদিও মহাবিশ্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায়, তার পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় মিলিয়ন মিলিয়ন বছরের হিসাব কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার দাবী রাখে না।

'বিগ-ব্যাংগ' বিস্ফোরণের বেলায় আমরা 'স্টাণ্ডার্ড মডেল অফ বিগ-ব্যাংগ' হতে জানতে পেরেছি যে, সৃষ্টি মুহূর্তে তাপমাত্রা ছিল 10^{32} k. (কেলভীন) অর্থাৎ ১০,০০০ কোটি কোটি কোটি কোটি ডিগ্রি কেলভীন। ঐ তাপমাত্রা প্রায় ১৫০০ কোটি বছর পর ২.৭৩ (2.73 k.) কেলভীন-এ নেমে আসে, যে তাপমাত্রায় প্রাণের আবাসযোগ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং আমরা মানুষরূপে পৃথিবী পৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়ে জীবন যাপন করতে সক্ষম হচ্ছি। 'বিগ-ব্যাংগ'-র বেলায় প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির বস্তুভরের সমান আলোকশক্তি অংশ নেয়ায় ঐ ১০,০০০ কোটি কোটি কোটি কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় এবং প্রাণের উপযোগী পর্যায়ে নেমে আসতে সময় নেয় প্রায় ১৫০০ কোটি বছর। কিন্তু বস্তুজগতের প্রান্তসীমায় সঙ্কুচিত

একটি মাত্র ব্যক্তি গ্যালাক্সির বেলায় অবশ্যই হুবহু সেরূপ বিস্ফোরণ ঘটবেনা ও সেরূপ তাপমাত্রাও সৃষ্টি হবে না এবং শত শত কোটি বছরেরও প্রয়োজন হবে না প্রাণ ধারণের উপযোগী পর্যায়ে নেমে আসতে। বিস্ফোরণের মাধ্যমে একটি গ্যালাক্সি বিবর্তিত হয়ে নতুন জগত সৃষ্টি পর্যায়ে পূর্বে আলোচিত 'ব্রাউন ডর্‌ফ'ও (Brown dwarf) বিশাল-বিশাল গ্রহসমূহের মতোই আচরণ প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ প্রায় মিলিয়ন বছরের মধ্যেই নতুন জগতসমূহে তাপমাত্রা জীবন উপযোগী পর্যায়ে নেমে আসবে। আর তাই যদি হয় তাহলে মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় মহাজাগতিক বস্তুদের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় যেখানে পৃথিবীর বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের হিসাব ছাড়া পর্যায়গুলো বুঝানো যায় না, সেখানে পৃথিবীর হিসাবে মিলিয়ন বছরের ঐ বিবর্তন পর্যায়কে মহাবিশ্বের হিসাবে 'মুহূর্ত'ই বলা যেতে পারে।

সুতরাং বর্তমান বিজ্ঞানের বাস্তবতার আলোকে নিত্য নতুন 'সত্য' আবিষ্কারগুলো প্রমাণ করছে মহাকাশে বিশাল-বিশাল গ্রহ ও 'ব্রাউন ডর্‌ফ' নামক বিশাল বিশাল বস্তুপিণ্ড সৃষ্টি হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও সে ধরনের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাব্যতাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। নক্ষত্র ছাড়াও উক্ত গ্রহ ব্যবস্থা পারস্পরিক অভিকর্ষ বলের কারণে নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করে মহাশূন্যে ভাসমান ও গতিশীল অবস্থায় টিকে থাকতে পারে এবং সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে অল্পসময় পরেই ওদের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা (Surface tempara-ture) পৃথিবীর মানবকুলের সহ্যের সীমায় বা তার চেয়ে একটু বেশি থাকতে পারে। উক্ত বিষয়গুলোর কোনোটি-ই অসম্ভব কিছু নয় বরং বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারের আলোকেই প্রায় একশত ভাগ সত্য। আজকের বাস্তবতায় উক্ত বিষয়সমূহ ইহজগত তথা বস্তুজগতে মানব সমাজ দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

এবার অধ্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যালোচনার মূল পয়েন্টগুলোকে পর পর সাজিয়ে নিচ্ছি। যেমন–

১. মহাবিশ্বে মহাজ্ঞানের আপোষহীন অগ্রযাত্রায় মানুষের কল্পনায় তৈরী সকল প্রকার অবাস্তব কাহিনীগুলো সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে বিলিন হয়ে গেছে এবং সেটাই স্বাভাবিক।

২. এ মহাবিশ্বে মহাজাগতিক প্রতিটি বস্তু-ই 'মহাকর্ষ বলের' (Gravity) মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

৩. উক্ত আকর্ষণ নির্ভর করে বস্তু ভর এবং দূরত্বের বর্গের গুণফলের উপর (m_1 x m_2 x d^2)।

৪. পূর্বে বিশ্বাস করা হতো নক্ষত্রসমূহ মহাশূন্যে অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুদেরকে মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে ভাসমান অবস্থায় ধরে রেখেছে। নক্ষত্রবিহীন গ্রহ, উপগ্রহ কিংবা এ জাতীয় বস্তুদের ভাসমান অবস্থায় মহাশূন্যে চলমান হয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয় কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের জ্ঞানপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটনসমূহ সে ধারণার ভিত্তি পাল্টিয়ে দিয়েছে।

৫. আমাদের মিলকি-ওয়ে (Milky-way) গ্যালাক্সিতেই বিখ্যাত 'ওরিয়ান নেবুলা (Orion nebula)-তে 'ট্রাপেজিয়াম গুচ্ছে' (Trapezium cluster) নক্ষত্রবিহীন প্রায় ১৩টি 'মুক্ত ভাসমান গ্রহ' (Free floating planets) ও প্রায় শতাধিক 'ব্রাউন ডর্‌ফ' (Brown dwarf) আবিষ্কৃত হয়েছে। যেগুলো নিজেদের মধ্যে মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে ভারসাম্য সৃষ্টি করে মহাশূন্যে বিরাজ করছে।

৬. এ ছাড়াও জাপানী বিজ্ঞানীগণ মহাকাশে মাত্র দুটি গ্রহকে মহাকর্ষ বলের (Gravity) মাধ্যমে একে অপরকে প্রদক্ষিণ প্রক্রিয়ায় ভারসাম্য আনয়ন করে বিরাজিত থাকাবস্থায় উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হন। যেখানে কোনো নক্ষত্রের হদিস পর্যন্ত নেই। (Two 'free floating planets' were recently found by Japanese astronomers. Astronomy now / may 2000. England).

৭. নক্ষত্রে রূপ নিতে ব্যর্থ হওয়া অথচ পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৪০০০ গুণ বৃহৎ 'ব্রাউন ডর্‌ফ' (Brown dwarf) গুলোর অধিকাংশ-ই তুলনামূলক

"সেদিন পৃথিবীকে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ (বিশাল বড় ও শুধু সমতল বিশিষ্ট) পৃথিবীতে পরিণত করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে ঐ আকাশমণ্ডলীকেও।" (১৪ : ৪৮)
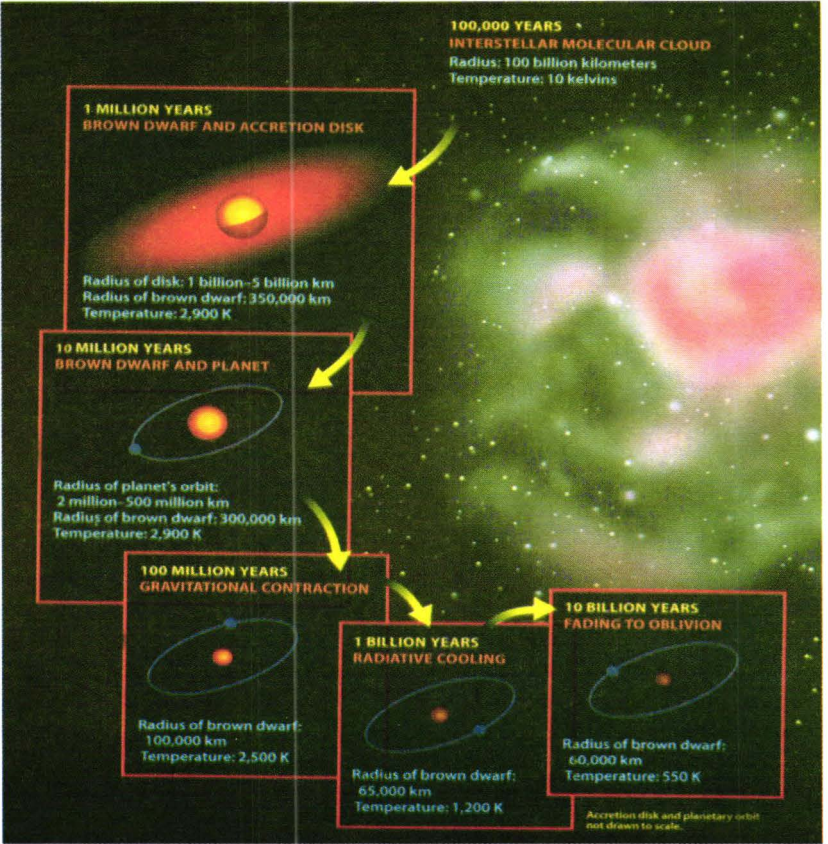
চিত্র-৭৮ (খ)

–হিসাব করে দেখা গেছে 'Orion nebula'-তে আবিষ্কৃত 'ব্রাউন ডরফ'গুলো পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৪০০০ গুণ বড়। অর্থাৎ প্রায় ৪০০০ পৃথিবী একত্রিত করলে ওদের সমান হবে। এই বিশাল বস্তুপিণ্ডগুলোকে বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, এরা অনেকটা শীতল বস্তুপিণ্ডতে পরিণত হয়ে কোন নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ না করে বরং একাকী নক্ষত্রের মতোই মহাশূন্যে ভাসমান ও চলমান অবস্থায় নিজ নিজ কক্ষপথে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং আল কুরআনের দাবী অনুযায়ী পরকালে নক্ষত্রবিহীন শুধু বিচারের মাঠ নামক বিশাল গ্রহ তৈরী হওয়া সম্ভব এবং তাতে তাপমাত্রা ৫০/৬০°C-এ বজায় রাখাও ১০০% সম্ভব। বিজ্ঞান হুবহু তা-ই প্রমাণ করছে।

ঠাণ্ডাবস্থায় কোনো নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ না করে একাকী নক্ষত্রের মতোই মহাশূন্যে ভাসমান ও চলমান অবস্থায় নিজ কক্ষে এগিয়ে যাচ্ছে।

৮. আকাশ ও পৃথিবী সমান প্রায় বিশাল-বিশাল গ্রহ (পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩৫০০ গুণ বৃহৎ) ও সূর্যের ন্যায় প্রকাণ্ড 'ব্রাউন ডরফ' (Brown dwarf) আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে প্রমাণ হয় আরও বৃহৎ 'গ্রহ' ও 'ব্রাউন ডরফ' অসংখ্য পরিমাণে মহাকাশে থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতেও সৃষ্টি হওয়া পুরোমাত্রায় সম্ভব, অসম্ভব কিছুই নয়।

৯. সৃষ্টিক্ষণ মুহূর্ত থেকে পরবর্তী মাত্র মিলিয়ন বছরেই মহাকাশীয় ঐ বৃহৎ বস্তুপিণ্ডগুলোতে পৃষ্ঠদেশ তাপমাত্রা মাত্র ২৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস-এ নেমে আসে, এতে প্রতীয়মান হচ্ছে আর স্বল্প সময় পরেই তা জীবন উপযোগী পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। অতএব নতুন সৃষ্ট জগতে জীবন উপযোগী তাপমাত্রা এত দ্রুত কাঙ্ক্ষিতমানে পৌঁছার সময়কালটি মহাবিশ্বের হিসাবের বিশালতার তুলনায় 'মুহূর্তকাল' বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। কেননা পৃথিবী সৃষ্টির পর ঠাণ্ডা হয়ে বাস উপযোগী হতে প্রায় সাড়ে চার হাজার (৪৫০০) মিলিয়ন বছর লেগেছে।

১০. মহাবিশ্বের মহাকাশে ধূলা-বালি ও গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ থেকে সৃষ্ট নতুন জগতে তাপমাত্রা জীবন উপযোগী পর্যায়ে আগমন করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যদি সেখানে আমাদের মতো কোনো মানবগোষ্ঠীর আগমন ঘটে, তাহলে সেখানে উত্তপ্ততার প্রচণ্ডতা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে মানুষগুলো অসহ্য গরমে বর্ণনাতীত সমস্যায় জড়িয়ে পড়বে এবং শুধু মাত্র নিজ প্রাণ বাঁচার নিমিত্তেই ঐ সময় সকল প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ভুলে যাবে, পাগলের মতো পালিয়ে বেড়াবে এবং কঠিন সেই বিপদ থেকে মুক্তির নেশায় মৃত্যু কামনা করবে।

১১. 'COBE Satellite' ও 'Boomerang project'-কর্তৃক ধারণকৃত 'microwave background radiation'-এর ছবিতে প্রমাণ হয়েছে বিস্ফোরণ

পরবর্তী অবস্থায় উল্লিখিত পশ্চাদপিঠ বিকিরণ বা তাপমাত্রা স্ফীতকরণের (Inflation) কারণে সর্বত্র একইভাবে বিরাজিত না হয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু স্থান বাদ দিয়ে দু'ধরনের পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ছবিতে নীলাভো অংশে ব্যাপক তাপীয় অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে এবং লালচে অংশে অপেক্ষাকৃত কম তাপীয় (ঠাণ্ডা) অবস্থা নির্দেশিত হয়েছে।

সুতরাং যে কোনো বিস্ফোরণ পরবর্তী অবস্থায় তাপমাত্রার তারতম্য (কম-বেশি) হওয়া বাস্তবভাবে প্রমাণিত যা অস্বীকার করা একেবারে বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করার শামিল।

১২. তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে নীলাভো তাপীয় পরিবেশে যদি একদল লোককে ছেড়ে দেয়া যায় তাহলে তারা এক ভয়াবহ পরিবেশে দারুণ দুঃখ-কষ্টে সময় অতিবাহিত করবে, আর লালচে অংশে অপেক্ষাকৃত কম তাপীয় পরিবেশে যদি আরেক দল লোককে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা তুলনামূলক ঠাণ্ডা পরিবেশে সুখেই সময় কাটাবে।

১৩. মহাবিস্ফোরণে প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি জন্ম নিয়েছে, কিন্তু একটি ব্যক্তি গ্যালাক্সি বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমায় বাধ্য হয়ে সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রায় ১০,০০০ কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ বস্তুভর দিয়েই নতুনভাবে নতুন নতুন জগত সৃষ্টি করবে। তবে গ্যালাক্সির পূর্বের কাঠামো অবশ্যই পরবর্তিত হয়ে নতুন আঙ্গিকে রূপ লাভ করবে। ফলে পূর্বের অনেক বৈশিষ্ট্যই আর সেখানে পুনরাবৃত্তির সুযোগ নাও পেতে পারে।

"আদিতে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পরবর্তীতে তার পুনরাবর্তন করবেন।" (২৭ : ৬৪)
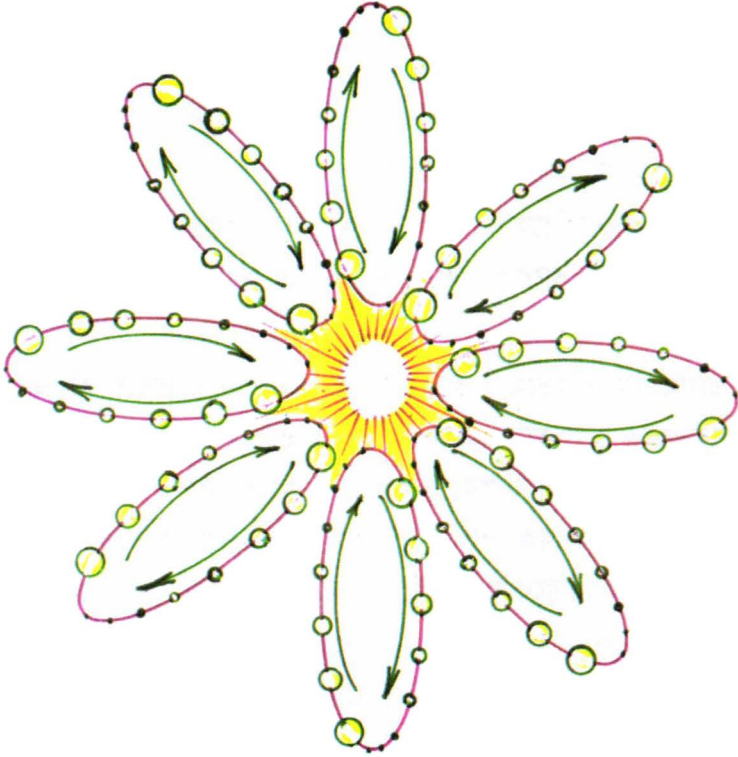
চিত্র-৭৯

–বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে 'Big Bang' নামক মহাবিস্ফোরণ ঘটার পর মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়। তখন মৌলিক উপাদান হিসেবে একমাত্র আলোকশক্তিই বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন তাপমাত্রায় আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) থেকে পদার্থ কণিকা সৃষ্টি হয়ে ক্রমান্বয়েগ্যালাক্সি, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে এ মহাবিশ্ব বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

গ্যালাক্সি সৃষ্টি হয়ে ভাসমান ও চলমান থাকাবস্থায়ই এর ভেতর একদিকে উল্লেখিত মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সৃষ্টি হতে থাকে, অপরদিকে ক্রমান্বয়েউড়ন্ত গতি বৃদ্ধি পাওয়ার গতিমুখের বিপরীত চাপে গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে ভেঙ্গে ছোট হতে থাকে। এক পর্যায়ে আলোর গতির সমান গতিপ্রাপ্ত হয়ে গ্যালাক্সি বাধ্য হয়ে বিন্দুতে (Singularity) প্রবেশ করে এবং পরক্ষণে প্রচণ্ড চাপ ও তাপে আবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে থাকে। কুরআনের বক্তব্যও একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ছবিতে তা দেখানো হয়েছে।

"ওরা কি গবেষণা করে দেখে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন। অতঃপর পুনরাবৃত্তি ঘটান? এটাতো আল্লাহ্র জন্য সহজ।" (২৯ : ১৯)

চিত্র-৮০

–পূর্বে বিভিন্ন সময়ে এক এক বিজ্ঞানী এক এক কথা বললেও বর্তমানে কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষে সবাই একযোগে একই কথা বলে চলছেন। আর সেই বিস্ময়কর কথাটি হল– আমাদের এ মহাবিশ্বটি পুনঃপুন সৃষ্টি (Oscillating) পদ্ধতি সম্পন্ন। অর্থাৎ মহাবিস্ফোরণ ঘটে প্রথম সৃষ্টির পর পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমেএক এক করে গ্যালাক্সি ধ্বংস হয়ে আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়ে আবার ধ্বংস হওয়া, আবার সৃষ্টি হয়ে আবার ধ্বংস হওয়া এই পুনঃপুন পদ্ধতি চালু রেখেছে। যে পদ্ধতির কথাই 'কুরআন' প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে আমাদের অবহিত করেছে। দেখুন না উপরে উদ্ধৃত পবিত্র আয়াতটি!

এতে কি প্রমাণ হয় না যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি আছেন? একবার সৃষ্টি ও আবার ধ্বংস এর ভেতর দিয়ে ইহকাল ও পরকাল সাজানো হয়েছে।

বিশেষ পর্যালোচনা

আমাদের বক্ষমান 'নক্ষত্রবিহীন পরকাল আল্লাহ্র নূর'-এ উদ্ভাসিত হবে অধ্যায়ে 'আল্-কুরআন' ও বিজ্ঞানে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সত্য তথ্যসমূহ আমরা এতোক্ষণ পর্যালোচনার সুযোগ নিয়েছি। এখন আমরা পাঠকের অনুসন্ধিতসু জ্ঞানের পরিধিকে আরও একটু মজবুতভাবে বৃদ্ধি করার জন্য এ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকুনকে পৃথক করে পর্যালোচনা করার প্রয়াস পাবো। আশা করছি নিচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোর মাধ্যমে সম্মানিত পাঠক সমাজ সত্যিকার অর্থেই বোধগম্যের ক্ষেত্রে অধিকতর লাভবান হবেন।

আমরা আল্-কুরআন থেকে আমাদের প্রিয় নবীর (সা) 'মিরাজ' বা উর্ধ্বাকাশে আরোহণ বিষয়ক তথ্য এবং এ সম্পর্কীয় পরকালীন স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান লাভ করেছি। দেখুন এ সম্পর্কে আল্-কুরআনে 'সূরা নাজম' কি ঘোষণা করেছে–

"যা সে (নবী) দেখেছে, তার অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি; সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয় সে তাকে আরেক বার দেখেছিল প্রান্তবর্তী কুল বৃক্ষের নিকট, যার নিকটে অবস্থিত 'জান্নাতুল মাওয়া'। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা ('নূর' দ্বারা) আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্বারা আচ্ছাদিত ছিলো। তার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহা নিদর্শনাবলী দেখেছিল।" (৫৩ ঃ ১১-১৮)

সম্মানিত পাঠক! নিশ্চয় উপরে উদ্ধৃত সূরা নাজম-এর ১১ থেকে ১৮ নং আয়াত পর্যন্ত পড়তে গিয়ে পরকালীন পরিবেশের একটা খণ্ড চিত্র আপনার অন্তর দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে উঠছে। আর তা হচ্ছে– সেখানকার স্থানীয় পরিবেশটি আল্লাহ্ তা'আলার উচ্চমানের এক প্রকার 'নূর' তথা আলোকরশ্মি দিয়ে আলোকিত করা হয়েছে। যে রশ্মির আলোকচ্ছটায়

মানবীয় যে কোনো দৃষ্টি বিস্ময়াভূত হয়ে ঝল্‌সে যেতে পারে, হতবাক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু প্রিয় রাসূল (সা) কে আল্লাহ্‌ তাঁর বিশেষ প্রটেক্‌শানে বা ব্যবস্থায় সফরের আয়োজন করেছিলেন বিধায় তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি এবং যে কারণে তিনি তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তা উপভোগ করেছেন। কুল বৃক্ষটি যে নূরের রশ্মির কিরণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে সমগ্র পরিবেশকে আলো-ঝল্‌মল্‌ করে কল্পনাতীত সৌন্দর্য দান করেছিল, রাসূল (সা) তা প্রাণভরে দেখার সুযেগ লাভ করেছিলেন, যা আল্‌-কুরআন পৃথিবীবাসীকে অবহিত করেছে। এর পাশেই ছিলো 'জান্নাতুল মাওয়া' এবং 'ছিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা', ছিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা হচ্ছে– মহাবিশ্বের দ্বিতীয় পর্যায় পরজগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতের প্রান্তঃসীমা। এরপরই শুরু হয়েছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্র 'আর্‌শ মুয়াল্লা'। যে আরশ মুয়াল্লা শুরু 'নূর'-এ ভরপুর।

আমরা কুরআনের বর্ণনানুযায়ী অনুমান করতে পারছি যে পরকালীন ব্যবস্থাপনার উল্লিখিত– জান্নাত, ছিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা, আর্‌শ মুয়াল্লাসহ অন্যান্য মহাবিস্ময়কর বিষয়াবলী আল্লাহ্‌র 'নূর'-এর ঝল্‌কে কল্পনাতীত আলো ঝল্‌মল্‌ পরিবেশে সাজানো গোছানো। ফলে বস্তুজগতে আলো প্রদানকারী একমাত্র দিশারী বা ব্যবস্থা 'সূর্য' বা 'নক্ষত্রের' সেখানে কোনো ভূমিকা নেই। অর্থাৎ নক্ষত্রের কোনো প্রয়োজন পড়ছে না। এ বিষয়টি কুরআন যেমন স্পষ্ট করেছে তেমনি রাসূল (সা) ও 'মিরাজ' ভ্রমণ শেষে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে মানব সমাজের নিকট বর্ণনা করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন 'মা আয়েশা রাদিআল্লাহু তা'আলা আন্‌হা' যখন রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কি মিরাজে আল্লাহ্‌কে দেখেছিলেন? তখন উত্তরে রাসূল (সা) বলেন, 'হে আয়েশা! তুমি কি বলছো? আমি তো সেখানে দেখেছি শুধু 'নূর আর নূর'। বুখারী শরীফে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে– পরকালীন পুরো ব্যবস্থাই আলোকিত করা হয়েছে আল্লাহ্‌ তা'আলার 'নূর' নামক বিশেষ আলোকরশ্মি দিয়ে, যে কারণে সেখানে ইহ্‌কালীন আলোর উৎস 'নক্ষত্রের' প্রয়োজন নেই।

উল্লিখিত বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান সর্বশেষ যে সকল আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটন দিয়ে মানব জাতির সম্মুখে সত্য প্রতিষ্ঠিত তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তা হলো– আমাদের এ মহাবিশ্বের মহাকাশ পরিপূর্ণ হয়ে আছে অসংখ্য অগণিত 'মহাজাগতিক রশ্মি' (Cosmic-ray) দিয়ে, যে সকল রশ্মির একশত ভাগের এক ভাগও আমরা আমাদের চর্ম চক্ষু দিয়ে কিংবা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দিয়েও দেখতে পাচ্ছি না। অদ্যাবধি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা দিয়ে আবিষ্কৃত রশ্মিগুলো হচ্ছে–

১. গামা-রে (Gamma-ray)

২. এক্স-রে (X-ray)

৩. আল্ট্রাভায়োলেট-রে (Ultraviolet-ray)

৪. দৃশ্যমান আলো (Visible light)

৫. ইনফ্রারেড-রে (Infrared-ray)

৬. মাইক্রো ওয়েভ (Micro wave)

৭. রেডিও ওয়েভ (Radio wave)

৮. মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic-ray)

উপরে উল্লিখিত আবিষ্কৃত আলোকরশ্মিগুলোর মধ্যে 'গামা-রে' (Gamma-ray) ভয়ঙ্কর ধ্বংস সাধন ক্ষমতাসম্পন্ন আলোকরশ্মি। এ রশ্মি প্রাণীদেহের সংস্পর্শে আসা মাত্রই প্রাণী কোষগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস করে দেয়। অধিক মাত্রায় এক্স-রে (X-ray) প্রাণীদেহের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। তবে স্বল্পমাত্রায় 'এক্স-রে' এবং বাকী রশ্মিগুলো মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীদেরও বিভিন্নভাবে উপকার করে থাকে।

বিজ্ঞানীগণ তাদের উন্নত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানাচ্ছেন যে আবিষ্কৃত উল্লিখিত আলোকরশ্মি ছাড়াও আরও অগণিত মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic-ray) দিয়ে মহাকাশ পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারায় উন্নত প্রযুক্তি লাভ করে আগামী দিনগুলোতে যখন মানব সমাজ

"তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন ইতোপূর্বে সে যা জানতো না।" (৯৬ : ৫)
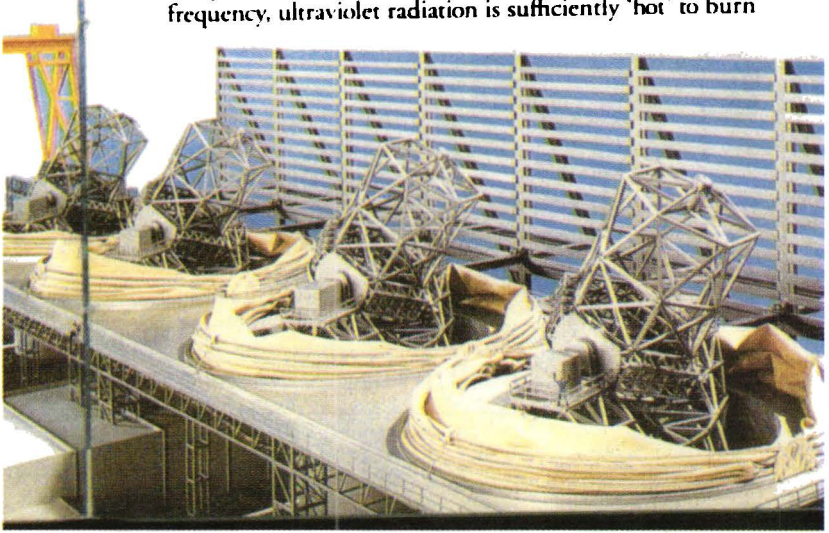
চিত্র-৮১

–প্রথমদিকে বিজ্ঞান যখন জানতে পারলো মহাবিশ্বটি আলো আর আলো'তে ভরপুর। তখন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন আলোকরশ্মিকে চিহ্নিত ও আবিষ্কার করার জন্য বিজ্ঞানবিশ্ব উঠে পড়ে লেগে যায়। ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রপাতি তৈরী করে বিজ্ঞান বিশ্ব বেশ কয়েকটি আলোকরশ্মিকে আবিষ্কার করে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– গামা-রে, এক্স-রে, আল্ট্রাভায়োলেট-রে, দৃশ্যমান আলো, ইনফ্রায়েড-রে, মাইক্রোওয়েভ, রেডিও ওয়েভ, মহাজাগতিক রশ্মি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা আরো জানিয়েছেন, সমগ্র মহাবিশ্বটি মহাজাগতিক বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি সম্পন্ন অসংখ্য আলোকরশ্মি দিয়ে ভরপুর হয়ে আছে। আপেক্ষিকতার কারণে পৃথিবীতে থেকে যার অনেক তথ্যাদি আমাদের জানা হয় না। আমরা যে আলোতে দেখি তা মূল আলোর অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। বাকী অংশ দেখার মতো ক্ষমতা আমাদের চোখের নেই বিধায় আমরা তা দেখি না।

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।" (৬ : ৬৭)
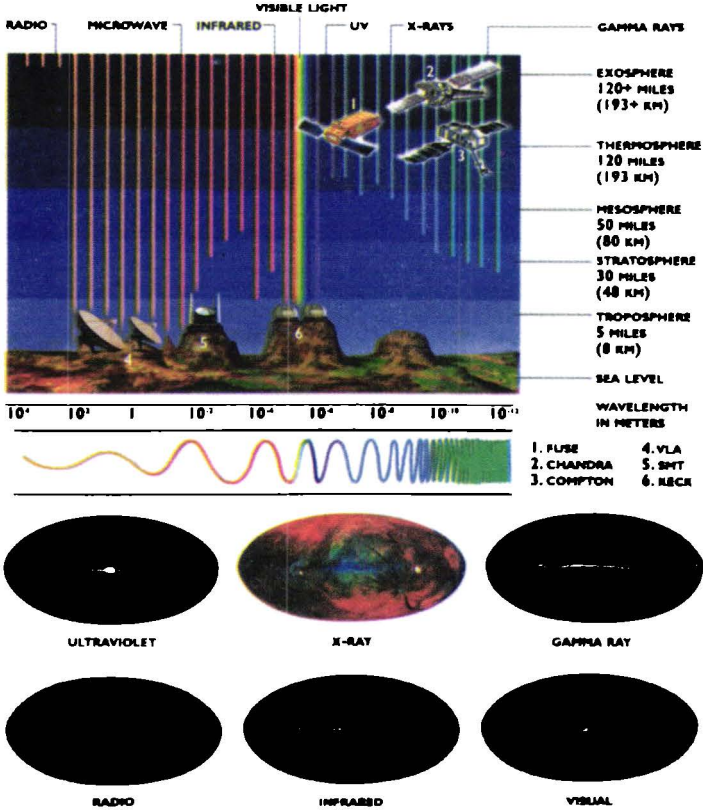
চিত্র-৮২

–বিজ্ঞানের অবদানে আমরা জানতে পেরেছি– মহাকাশে অসংখ্য ফ্রিকুয়েন্সির অগণিত আলোকরশ্মি বিরাজমান। আমাদের পৃথিবীর সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটির ব্যাপারে শুধু আমরা অবগত হয়েছি আমাদেরই প্রয়োজনে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে আছে হাজারো আলোকরশ্মি মহাকাশ জুড়ে। যেহেতু মূলত আলোকশক্তি থেকেই সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব অস্তিত্ব ধারণ করেছে, তাই মহাবিশ্বের সকল স্থানেই কোন না কোন ফ্রিকুয়েন্সির আলো কিংবা সকল প্রকার ফ্রিকুয়েন্সির আলোই বর্তমান থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখানে বড় যে কথাটি মনে রাখতে হবে তা হলো– সকল প্রকার আলোকে একই ক্ষমতার চোখ বা দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাবে না। দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতার উপরই নির্ভর করছে বিভিন্ন প্রকার আলোকশক্তিকে দেখা ও সনাক্ত করা। দুনিয়াবী দৃষ্টি দিয়ে পরকালে অনেক কাজ নাও হতে পারে। পরকালে হয়তো বা প্রয়োজনমতো সবাইকে অনেক ক্ষমতাসম্পন্ন দৃষ্টি প্রদান করা হবে

নতুন নতুন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে সক্ষম হবে, তখন হয়তো বা মহাকাশে বিরাজমান আপাতত আমাদের দৃষ্টিতে অদৃশ্য মহাজাগতিক সেই অসংখ্য-অগণিত আলোকরশ্মিগুলোকে উদঘাটন করতে বিজ্ঞানীগণ সক্ষম হবেন।

বিংশ শতাব্দীর অগ্রসরমান বিজ্ঞান তার আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে সোনালী যুগের আবির্ভাব ঘটানোর কারণে মহাবিশ্বের অনেক গোপন ও মৌলিক বিষয়ের সাথে সাথে আরও আমাদের অবহিত করছে যে, মহাবিশ্বটি মূলতই কল্পনাতীত এক বিশাল 'আলোকশক্তির' উৎস থেকেই পদ্ধতিগতভাবে এবং পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে বিধায় এর প্রত্যেক পরতে পরতে চলছে বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি সম্পন্ন আলোকশক্তির জমজমাট খেলা। খালি চোখে আমরা যার কিছুই দেখতে সক্ষম হচ্ছি না। কারণ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ঐ সকল আলোর আলোক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) ক্ষুদ্র (Short) বিধায় আমাদের চোখের কোষগুলোকে কোনোভাবে প্রভাবিত না করেই প্রস্থান করে থাকে। শুধু দৃশ্যমান আলো (Visible light) আমাদের চোখের কোষগুলোকে আলোড়িত ও প্রভাবিত করে বলেই আমরা ঐ আলোর মাধ্যমে বস্তুজগত ও তার উপাদান এবং বস্তুসমূহকে দর্শন করে থাকি।

সুতরাং উল্লিখিত 'আলোকশক্তি' বা আলোকরশ্মি সম্পর্কে বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্যে প্রমাণ হয়েছে যে মহাবিশ্বে অগণিত মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic-ray) বিভিন্ন মাত্রায় বিরাজমান আছে এবং স্থান-কাল-এর আপেক্ষিকতার কারণে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় পরিবেশে যথাযথভাবে কার্যসম্পাদন করে চলছে। যদিও পৃথিবী থেকে আমরা তা আমাদের দৃষ্টিশক্তির সংকীর্ণতার জন্য সরাসরি দর্শন লাভে সমর্থ হচ্ছি না।

শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান আরও জানাচ্ছে যে, আমাদের মহাবিশ্বে যতো প্রকার শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিটি শব্দই কোনো না কোনো পর্যায়ে এক সময় আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। একইভাবে প্রতিটি বস্তু সত্তার ছবিও প্রতি মুহূর্তে আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। যে কারণে মিলিয়ন

"তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয়, যেন তোমরা (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।" (১৬ : ৭৮)
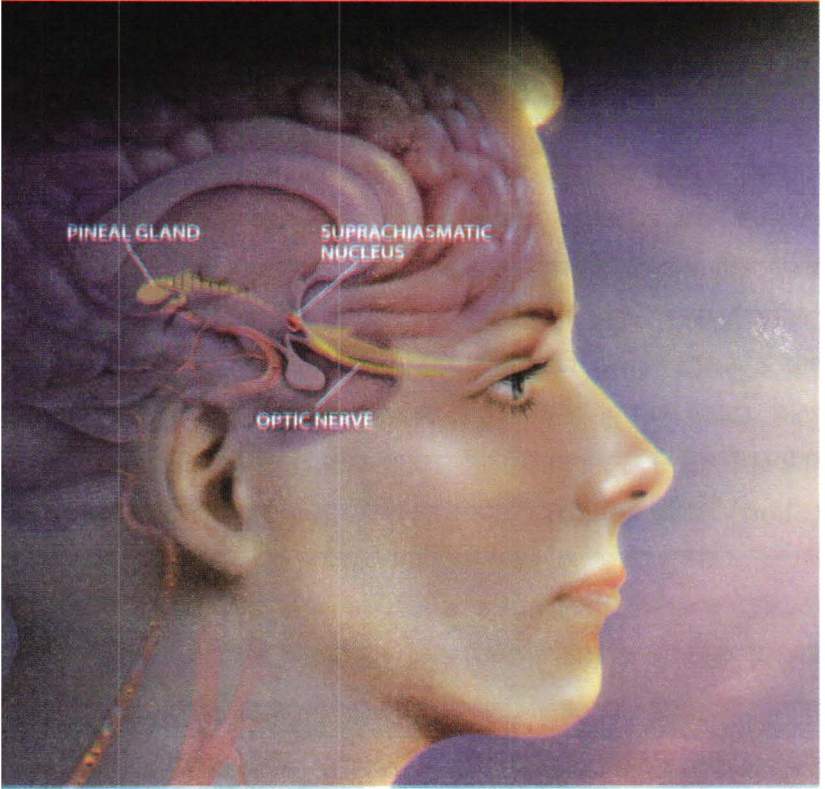
চিত্র-৮৩

–আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য একটি বড় ধরনের নিয়ামত হচ্ছে– তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান। এ দৃষ্টিশক্তি 'চক্ষু' নামক অঙ্গের মাধ্যমে কর্মতৎপরতা সম্পাদন করে থাকে। মানব চক্ষুদ্বয় বিরাজমান আলোক তরঙ্গের মধ্যে 'Visible light'-এর যৎসামান্য যে অংশ আছে, তার মাধ্যমেই দর্শন কার্য চালিয়ে থাকে। প্রথমে বস্তুর উপর আলো পড়ে তা প্রতিফলিত হয়ে যখন মানব চোখে প্রবেশ করে তখন চোখের ভেতর থাকা কোষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরক্ষণে এই আলোড়ন স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়। সংকেত পেয়ে মস্তিষ্ক তাকে বিশ্লেষণ করে সাথে সাথে জানিয়ে দেয় দৃশ্যমান বস্তুটি কি। এভাবেই চোখ দেখার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে।

"তোমরা ধাপে ধাপে অবশ্যই (জ্ঞান-বিজ্ঞান) উন্নতির প্রসার লাভ করবে।" (৮৪ : ১৯)
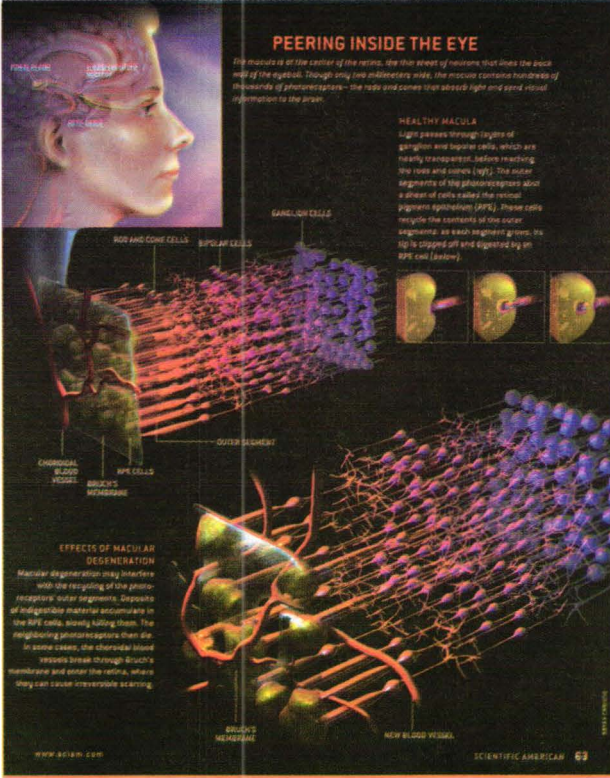
চিত্র-৮৪

–আমাদের দৃষ্টি শক্তির প্রধান অঙ্গটির নাম 'চোখ' এর আছে প্রধান দু'টি অংশ। অর্থাৎ দেখার জন্য যে কোষগুলো কাজ করে তারা দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগের নাম 'কোন' (Cone) আর অপরভাগের নাম 'রড' (Rod), 'কোন' প্রায় একশত ত্রিশ মিলিয়ন কোষ নিয়ে গঠিত। আর 'রড' প্রায় দশ মিলিয়ন কোষের সমন্বয়ে গঠিত। ব্যাপক আলোতে 'কোন' নামক কোষগুলো সাড়া দিয়ে থাকে। আর স্বল্প আলোতে 'রড' নামক কোষগুলো সাড়া দিয়ে দর্শনের কাজ সমাপ্ত করে থাকে। আলো যখন চোখে প্রবেশ করে সোজা পথে চলে যেতে চায় তখন আলোক তরঙ্গ ঢেউয়ের মতো চলে বিধায় কোষগুলোর গায়ের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে কোষগুলো সেনসিটিভ হয়ে উঠে এবং বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরী করে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে নার্ভের মাধ্যমে। নার্ভগুলো কোষ এবং মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। উল্লিখিত প্রায় ১৪০ মিলিয়ন কোষ একটি আরেকটির সাথে খুবই সমপর্যায়ে আন্তঃসংযোগ রক্ষা করে থাকে। শুধুমাত্র চোখের গঠন ও কার্যকারিতার দিকে তাকালেই এক আল্লাহর অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। সত্য নয় কী?

বছর পূর্বের মহাকাশে পরিভ্রমণরত গ্যালাক্সি ও কোয়াসারের ছবি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি অথচ বাস্তবে এখন সেগুলো সেই স্থানে নেই। কিন্তু ওদের ছবি আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত (converted to electromagnetic force) হয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল গতিতে ভ্রমণ করে এখন পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে সক্ষম হচ্ছে আর ঠিক তখনই আমরা তাদের দর্শন করতে পারছি টেলিস্কোপের সাহায্যে।

এছাড়াও বর্তমানে Television programme সম্প্রচার ও Computer- এ অনুষ্ঠানমালা ধারণ ও প্রদর্শন সম্ভব যে হচ্ছে, এর একমাত্র কারণ হচ্ছে– শব্দ ও ছবিকে আলোকশক্তিতে রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে বলেই।

অতএব এ মহাবিশ্বে সকল ব্যাপারেই রয়েছে অগণিত অদৃশ্য আলোর একচেটিয়া খেলা এবং বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির বিভিন্ন প্রকর আলো দিয়ে মহাবিশ্ব রয়েছে ভরপুর। আপেক্ষিকতার কারণে এক এক ধরনের আলোকশক্তি মহাবিশ্বের এক এক স্থানে প্রয়োজনমতো কর্মতৎপরতায় অংশ নিচ্ছে যা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষ জানে না এবং তাদের তা জানার বিষয়ও নয়।

উল্লিখিত আলোর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটির আভ্যন্তরীণ অদৃশ্য কাঠামো বা গঠন অবয়ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞান মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞান জানিয়েছে আমরা যে Visible light-এর আলোতে দেখতে পাচিছ, এতে আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) এর যে ঘনত্ব (density) বিদ্যমান আছে, 'X-ray'-তে সে তুলনায় 'ফোটন' (Photon) কণিকার ঘনত্ব ১০,০০০ গুণ বেশি। আবার 'Gamma-ray'-তে Visible light-এর তুলনায় 'ফোটন' কণিকার উপস্থিতি প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন (40 million times more) গুণ বেশি। ফলে তা প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন আলো যা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এভাবে 'ফোটন' কণিকার তারতম্যের কারণে অগণিত মহাজাগতিক রশ্মি সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের মহাকাশ পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

"সেদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলবো যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর ।"
(২১ : ১০৪)
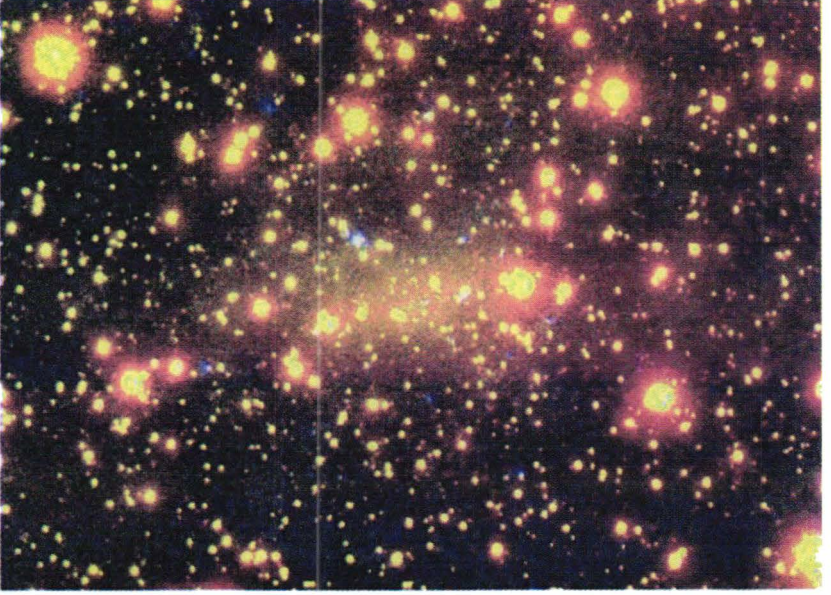
Cepheus 1: Nearby Galaxy Hiding
Credit : R. Walterbos et al. (NMSU), Apache Point Obs.

চিত্র-৮৫

–ছবিতে দৃশ্যমান গ্যালাক্সির ছবিটি আমাদের এ পৃথিবী থেকে প্রায় ১৪০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের । এ ছবিতে যে গ্যালাক্সি দেখা যাচ্ছে সেই গ্যালাক্সি থেকে যে আলো প্রায় ১৪০০ কোটি বছর আগে এ পৃথিবীর দিকে যাত্রা শুরু করেছিল তা এইমাত্র আমাদের নিকট পৌঁছেছে বিধায় আমরা তা এখন টেলিস্কোপে দেখতে পাচ্ছি । অথচ বাস্তবে কিন্তু এখন দৃশ্যমান গ্যালাক্সিগুলো সেখানে নেই । তার চলার পথে এখন বহু বহু দূরে চলে গেছে । এতে প্রমাণ হচ্ছে মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ হয়ে আছে অসংখ্য 'কসমিক-রে' দিয়ে এবং মহাবিশ্বে সকল প্রকার কর্মকাণ্ডই কোন না কোন এক পর্যায়ে গিয়ে আলোতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে । মহাবিশ্বের মাঝে 'আলো' (নূর)-ই একমাত্র মৌলিক উপাদান যা দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং যার মাধ্যমে সমগ্র মহাবিশ্ব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এক মহাবিস্ময়কর পদ্ধতিতে নীরবে সম্পাদিত হয়ে চলেছে । মূলত এটা আল্লাহরই কৃতিত্ব ।

"সমগ্র মহাবিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র-ই । আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ।" (৩ : ১৮৯)

"সমগ্র মহাবিশ্বটি আল্লাহর 'নূর' থেকেই সৃষ্ট ।" (২৪ : ৩৫)

চিত্র-৮৬

–'Big Bang model' গবেষণাকারী বিজ্ঞানীগণ বিংশ শতাব্দির শেষদিকে মানব জাতিকে অবহিত করেছেন যে, কল্পনাতীত এক বিশাল আলোকশক্তির উৎস থেকেই সঙ্কোচন পদ্ধতিতে এ মহাবিশ্ব অস্তিত্ব ধারণ করেছে । মহাবিস্ফোরণের পর নবীন মহাবিশ্বের সর্বত্র তখন শুধু 'আলো আর আলো'-র বন্যা বইতে ছিল এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির (Frequency) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আলো । এই অসংখ্য অগণিত বিভিন্ন গুণাবলী সম্পন্ন আলোর গতিবেগেও ছিল বর্তমান আলোর গতিবেগের তুলনায় কোটি কোটি গুণ বেশি । সেই আলো মহাবিশ্বের মহাকাশে এখনও বিরাজমান আছে । আগামী দিনে বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে মানব জাতিকে একদিন অবশ্যই তাক লাগিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ ।

"তিনি (আল্লাহ্‌) তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন (বিভিন্নভাবে) দেখায়ে থাকেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?" (৪০ : ৮১)

চিত্র-৮৭

–ছবিতে আমরা দু'টি হাতের দশটি আঙ্গুলের এক্স-রে করা ছবি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যাঁর হাতের ছবি তিনি নিজে এ ছবি তোলার সময় 'এক্স-রে; নামক আলোকরশ্মিটিকে দেখেননি। কারণ আমাদের চোখের কোষগুলো 'দৃশ্যমান' (Visible) আলোকে দেখার ক্ষমতাসম্পন্ন করে আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (ঢেউ) লম্বা হওয়ায় তা আমাদের চোখের কোষে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু দৃশ্যমান আলোর তুলনায় 'এক্স-রে'তে প্রায় ১০,০০০ গুণ বেশি আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) বিদ্যমান থাকাতে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায় এবং দ্রুততার সাথে চোখের কোষের সাজানো সারির ভেতর দিয়ে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করেই প্রস্থান করতে পারে। তাই আমরা দেখতে পাই না। অনুরূপভাবে 'গামা-রে'-তেও দৃশ্যমান আলোর তুলনায় প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন (৪০,০০০,০০০) গুণ বেশি 'ফোটন' কণিকা বিদ্যমান থাকায় তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও ছোট, সেজন্য 'গামা-রে'কেও আমরা দেখি না।

এভাবেই মহাকাশে আল্লাহ অসংখ্য আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি করে রেখেছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করার জন্য। সুবহানাল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌র এ শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার উপায় আছে কী?

বিজ্ঞানের অবদানে মানব জাতি আজ সে সকল তথ্য অবহিত হয়ে নিজেদের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে, সাথে সাথে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্পর্কেও ভাবার অবকাশ পাচ্ছে।

সুধী পাঠক! 'নক্ষত্রবিহীন পরকাল আল্লাহ্‌র নূর-এ উদ্ভাসিত হবে' অধ্যায়টিতে প্রথমে 'কুরআনিক' বক্তব্য ও পরে ব্যাপক অগ্রগতিসম্পন্ন বর্তমান 'বিজ্ঞানের' যত সামান্য আবিষ্কৃত আলোকশক্তির রহস্য আলোচনা ও পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে– আল্‌-কুরআনের বক্তব্য ও বিজ্ঞানের সত্য-সঠিক আবিষ্কৃত তথ্য এক ও অভিন্ন। প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে আল্‌-কুরআন আলোকশক্তি সম্পর্কে যে তথ্য মানব জাতির নিকট প্রকাশ করেছে, বর্তমান বিজ্ঞান তার কিছু মাত্র সত্য-তথ্য হিসেবে উদ্‌ঘাটন করেছে।

মহাবিশ্বের মহাকাশে যে বিভিন্ন প্রকার আলোকশক্তি বিরাজমান এবং তার যে কোনো একটি দিয়ে পরকালের ব্যবস্থাপনা আলোক উজ্জ্বল করার যে তথ্য আল্‌-কুরআন ঘোষণা করেছে– বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটিত বর্তমান তথ্য তা স্বীকার করে নিচ্ছে। নক্ষত্র দিয়ে বস্তুজগত আলোকিত করা হলেও পরকালে তার চেয়েও আরও উন্নত আলোর উপস্থিতি বিরাজমান থাকায় নক্ষত্রের প্রয়োজন পরকালে যে হবে না সে কথা কুরআনের সাথে বিজ্ঞানও নতশীরে মেনে নিয়েছে।

আবার ঊর্ধ্বাকাশে 'Orion nebula belt'-এ নক্ষত্রবিহীন 'Free floating planet' একাধিক আবিষ্কৃত হওয়ায় পরকালে নক্ষত্রবিহীন সৃষ্ট নতুন নতুন গ্রহজগৎ যে একাকী এবং কখনও কখনও একাধিক গ্রহের পারস্পারিক 'মহাকর্ষ বলের' টানাটানির মাধ্যমে নক্ষত্র ছাড়াই যে টিকে থেকে যথাযথভাবে কার্যসম্পাদন করে যাবে সে তথ্যও প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান সাফল্যমণ্ডিত বিজ্ঞান নিজেই তা প্রমাণ করে চলেছে।

এভাবে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর বিস্ময়কর বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ বহুমাত্রিক আলোকশক্তির উপস্থিতির প্রমাণের ভেতর দিয়ে এসবের একমাত্র স্রষ্টা যে একজন মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তা 'আল্লাহ্‌' আছেন সে দাবী ভরা দুপুরে দিনের সূর্যের মতোই মজবুত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে। এরপরও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিক পথ আর খোলা আছে কী? জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সত্য তথ্যগুলো হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়ার পরও কি এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে মাথা অবনত না করে বরং অযথা বিদ্রোহিতা প্রদর্শন করে কি পরকালে পার পাওয়া যাবে? যাবে না।

"প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" (৩৫ ঃ ২৮)

"এগুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্‌ সত্য।" (৩১ঃ ৩০)

তাই সমাজের জ্ঞানীদের কর্তব্য হবে এক আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাঁরই নির্দেশ মতো জীবন নির্বাহ করে নিজেদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা।

এখন আমরা পুরো অধ্যায়টিকে এক নজরে সাজিয়ে দেখে নিই!

এক নজরে

আল-কুরআন

১. *"বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (২৯ ঃ ২০)*

"সৃষ্টিকে তিনি-ই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর তার পুনরাবর্তন ঘটান।" (১০ ঃ ৪)

বর্তমান বিজ্ঞান

১. সমগ্র মহাকাশব্যাপী গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ব্ল্যাকহোল, গ্যালাক্সি ইত্যাদি ভাসমান ও চলমান, আবার পৃথিবীতে গাছ-পালা, তরু-লতা, খাল-বিল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর এবং এরই মাঝে গণনাতীত বৈচিত্রময় নানান ধরনের প্রাণের ছড়াছড়ি দেখে দেখে মানব সমাজ দীর্ঘ সময় ধরে ভেবে এসেছে এগুলো কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এবং এদের স্রষ্টা-ই বা কে?

বিংশ শতাব্দিতে এসেই বিজ্ঞান 'পশ্চাদপিঠ বিকিরণ' (Back ground radiation) আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে– এ মহাবিশ্বটি 'Big Bang' নামক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে কল্পনাতীত এক বিশাল আলোকশক্তির উৎস থেকেই পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ ও সৌন্দর্য লাভ করেছে।

বিজ্ঞান আরও প্রমাণ করেছে যে, মহাকাশীয় বস্তুদের মধ্যে গ্রহ, নক্ষত্র, এমনকি সর্ববৃহৎ সংগঠন গ্যালাক্সিরও ধ্বংসস্তূপ থেকে সঙ্কোচন পদ্ধতিতে আবার গ্যালাক্সি, নক্ষত্র

ও গ্রহ পুনঃপুন জন্ম লাভ করছে। এভাবে একবার সৃষ্টি আবার ধ্বংস, আবার সৃষ্টি আবার ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পরিক্রমণ (Cycle) অনুসরণ করে চলেছে। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ এ পদ্ধতিকে 'Oscillating System' বা পুনঃপুন পদ্ধতি নাম দিয়েছে।

২. বিজ্ঞান জগত বর্তমান উন্নতর প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম ও পর্যবেক্ষণ পরিচালনার ফলে বিলিয়ন-বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের মহাকাশীয় বিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সোনালী সুযোগ লাভ করেছে।

বিজ্ঞান উচ্চতর কক্ষপথে 'হাবল টেলিস্কোপ' এবং আরও বহু ক্যামেরা সমৃদ্ধ স্যাটেলাইট স্থাপন করে দূর মহাকাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত অগণিত নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির করুণ পরিণতি এবং পরিক্রমণ (Cycle) অনুসরণে তা থেকে সৃষ্ট নতুন নতুন মহাকাশীয় বস্তুদের দর্শন ও তাদের অবস্থান জানতে পারছে। এছাড়া তাদের থেকে আগত আলোকরশ্মি বিশ্লেষণে জানতে পারছে বস্তুসমূহের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা, প্রকৃতরূপ, তাদের গঠন উপাদান ও তাদের চতুর্দিকের বিরাজমান আবহাওয়ার প্রকৃত অবস্থা।

এতে বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে আপেক্ষেকিতার কারণে প্রতিটি সৃষ্ট নতুন নতুন গ্রহ ও নক্ষত্রের গঠন, রূপ ও তাদের

২. "আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে ওরা সন্দেহ পোষণ করবে?" (৫০ ঃ ১৫)

"সেদিন জমিনকে পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ জমিনে পরিণত করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে আকাশমণ্ডলীকেও।" (৪৯ ঃ ৫৯)

"যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তন হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলীও।" (১৪ ঃ ৪৮)

"আর আমি নিশ্চয় পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে একটি পরিষ্কার ময়দানে পরিণত করবো।" (১৮ ঃ ৮)

পৃষ্ঠদেশের অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন ভিন্ন, পারস্পরিক মিল অনেক ক্ষেত্রেই কম পরিলক্ষিত হচ্ছে, অধিকাংশ গ্রহের পৃষ্ঠদেশ উদ্ভিদশূন্য ও প্রাণশূন্য ধূসর মরুদ্যান। পানি ও বায়ুমণ্ডল নেই বললেই চলে, কোনো কোনোটিতে বায়ুমণ্ডল সামান্য থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণের জন্য পুরোপুরি অনুকূল নয়, সে সকল গ্রহে স্বল্প সময়ের জন্যই শুধু প্রাণের উদ্ভব ঘটানো যেতে পারে। দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য নয়, কেননা পৃথিবীর মতো পরিবেশ যে সেখানে নেই।

৩. *"আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাত তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে, বিশ্ব (নতুন জগৎ) তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত (আলোকিত) হবে।" (৩৯ ঃ ৬৮-৬৯)*

৩. বিজ্ঞানবিশ্ব দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে অবশেষে বিংশ শতাব্দিতে এসে প্রমাণ করেছে যে, 'Big Bang' নামক এক মহাবিস্ফোরণের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে এ মহাবিশ্বের বৃহৎ সংগঠন গ্যালাক্সিসমূহ আলোর গতিতে উড়তে গিয়ে এক পর্যায়ে গতিমুখের বিপরীত বাধার চাপে সঙ্কুচিত হয়ে যখন সম্পূর্ণ গ্যালাক্সিটি এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হচ্ছে তখন আবার চাপ ও তাপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় ঐ বিন্দুটি প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফারিত হয়ে নতুনভাবে জগৎ তৈরী করছে মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে। বিজ্ঞান বিশ্বাস করে ঐ সকল নতুন জগতে পৃথিবীর মতো প্রাণের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ন্যূনতম

পর্যায়ে থাকলে সেখানেও স্বল্প সময়ের জন্য মহাজগতের নিয়মে মানুষের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এতে বিচিত্রতার কিছুই নেই, এটা সম্ভব এবং স্বাভাবিক, তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য মানুষের উদ্ভব ঘটাতে হলে সেখানে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনায় উদ্ভিদ জগতের ব্যবস্থা পূর্বেই সম্পন্ন করতে হবে। নতুবা তখন সৃষ্ট প্রাণী জগৎ স্থায়ী হবে না। খাদ্যাভাবে এক সময় সমস্ত প্রাণ মারা যাবে।

"কেবলমাত্র একটি মহাবিস্ফোরণ হবে (ঘটবে), আর তখনই সৃষ্ট ময়দানে তাদের আবির্ভাব ঘটবে।" (৭৯ ঃ ১৩-১৪)

পূর্বে বিজ্ঞানের ধারণা ছিলো নক্ষত্র ছাড়া গ্রহ ব্যবস্থা মহাবিশ্বের কোথাও টিকে থাকার কথা নয়, কিন্তু অধুনা বিজ্ঞানের সে ধারণা পাল্টে গেছে 'Orion belt'- এ নক্ষত্রবিহীন বহু সংখ্যক গ্রহ এবং কখনোও কখনোও একক গ্রহ ব্যবস্থা ও হোয়াইট ডরফ্ (white dorf) আবিষ্কার হওয়ার ফলে।

সুতরাং বিজ্ঞান এখন স্বীকার করছে যে, মহাবিশ্বে নক্ষত্র ছাড়াও গ্রহ ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং যথাযথভাবে একাকী মহাশূন্যে টিকেও থাকতে পারে। আবার মহাজাগতিক অগণিত আলোকরশ্মির মধ্যে কোন একটি বা একাধিক আলোকরশ্মি আপেক্ষিকতার কারণে সেই নক্ষত্রবিহীন জগতকে স্থানী-য়ভাবে আলোকিতও করতে পারে। মহাজাগতিক নিয়মে এটা অসম্ভব কিছুই নয় বরং খুবই সম্ভব।

৪. "সেদিন মানুষ ভিন্ন-ভিন্ন দলে বের হবে।" (৯৯ ঃ ৬)

৪. বিজ্ঞান জগৎ হাতে কলমে পরকাল সম্পর্কিত কোনো ব্যবস্থা আয়ত্ত করতে না পারায় এখনো সরাসরি মেনে নিচ্ছে না। তবে পরোক্ষভাবে পরকাল সম্পর্কীয় অনেক তথ্যই বিজ্ঞানের হাতে এখন জমা আছে। যেমন– 'গামা-রে বিচ্ছুরণ' (GRBS) মহাবিশ্বের প্রান্তঃসীমানার দিকে গ্যালাক্সি সঙ্কোচন হয়ে নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টির আলামত ও তার ছবি ধারণ প্রান্তঃসীমানার দিকে ইত্যাদি।

"এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে, ডানদিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডানদিকের দল এবং বামদিকের দল; কতো হতভাগ্য বামদিকের দল! আর অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তী, ওরাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।" (৫৬ ঃ ৭-১১)

উল্লিখিত বিষয়গুলোর আলোকে ইচ্ছা করলে বিজ্ঞানী সমাজ যৌথভাবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি প্রদান করে পরকালকে মেনে নিতে পারেন কেননা উল্লিখিত বিষয়গুলো শুধু মাত্র পরকাল বিষয়ক বক্তব্যগুলোকেই এমনভাবে উপস্থাপন করে থাকে, কিন্তু ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক অযৌক্তিক বিভেদের কারণেই বিজ্ঞানীগণ এটা করতে পারছেন না এবং যদি এ ধারা অব্যাহত থাকে তাহলে ভবিষ্যতেও পারবেন বলে মনে হয় না, তবে একথা সত্য যে, মানব জাতিকে পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরকাল সরাসরি দেখার সুযোগ আল্লাহ্ দেবেন না। এর পূর্বেই তিনি পৃথিবীকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। পরকাল বস্তুজগৎ থেকে মানব জাতি স্বচোখে দেখে ফেললে বস্তুজগতে

মানব জাতির কর্মফলের উপর পরীক্ষার গুরুত্ব আর থাকবে না। তাই সরাসরি তা দেখানো হবে না, সরাসরি দেখা যাবে কিয়ামাতের পর। এখন শুধু পরকালের কিছু কিছু আলামত দেখা যাবে এবং ইতোমধ্যেই তা দেখা শুরুও হয়েছে যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

"অপমানে অবনমিত নেত্রে সেদিন ওরা কবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়, ওরা আহ্বানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীতিবিহ্বল হয়ে। অবিশ্বাসীরা বলবে 'বড় কঠিন এ দিন।" (৫৪ : ৭-৮)

বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আমাদের এ মহাবিশ্বের প্যারালালে আরেকটি মহাবিশ্ব বিরাজমান আছে বলে যে অনুমান করছেন– মূলত তা আলাদা মহাবিশ্ব নয় বরং তা হচ্ছে বস্তুজগতের সমান্তরালে পরকালের জগৎ। আমাদের এ মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে আছে বস্তুজগৎ, আর বস্তুজগতের চতুর্দিকে আছে পরজগৎ। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ চর্মচক্ষু দিয়ে তা দেখতে না পেরে অনুমান করছেন 'parallel universe' বলে, আসলে তা-ই পরকালের জগৎ।

৫. "যেদিন ওরা ফেরেশতাদের প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং ওরা বলবে, 'রক্ষা করো, রক্ষা করো।" (২৫ : ২২)

৫. বিজ্ঞান জগৎ সাধারণত পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, শয়তান বা জ্বীন জাতিকে বিশ্বাস করে না। কারণ উল্লিখিত বিষয়গুলোকে এখনও হাতে-কলমে প্রমাণ করতে পারেনি। তবে 'গামা-রে বার্স্ট' এর মাধ্যমে পরকালের সূচনা, প্রায় ৩৫০০ পৃথিবীর সমান নতুন গ্রহসহ এ পর্যন্ত প্রায় তিন'শ-এর মতো গ্রহ আবিষ্কার এবং জাহান্নামের চিত্র-

চরিত্র সম্পন্ন 'কোয়াসার' আবিষ্কার বিজ্ঞান বিশ্বকে ইতোমধ্যেই ভাবিয়ে তুলেছে। অচিরেই হয়তো বা বিজ্ঞান উল্লিখিত বিষয়াবলীর স্বীকৃতিস্বরূপ সবুজ সংকেত প্রদান করতে পারে।

এছাড়াও 'নূর' বা বিশেষ আলোর কণা 'ফোটন' (Photon) দিয়ে সৃষ্ট ফিরিশতাদের ব্যাপারেও স্বীকৃতি আসবে যা ইতোমধ্যে 'God Particles' নামে বিজ্ঞান বিশ্বকে গবেষণায় নিয়োজিত রেখেছে। বিজ্ঞানীগণ হন্যে হয়ে ছুটছেন এক পার্টিক্যালস ল্যাব থেকে অন্য পার্টিক্যালস ল্যাবে। কারণ তাঁরা ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি প্রদান করেছেন যে, আমাদের এ মহাবিশ্বটি মূলত মৌলিক কণিকা 'God particles' দিয়েই সৃষ্ট ও পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

"ওদের সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে যখন দুঃখ কষ্টে ওদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।" (৪০ ঃ ১৮)

"বন্ধুরা হয়ে পড়বে সেদিন একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।" (৪৩ ঃ৬৭)

তাই, যদি 'God Particles' কে বিজ্ঞানীগণ 'Particles collider' এ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন, তাহলে ফিরিশতা জগতকে বিশ্বাস করতে বিজ্ঞান জগতকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। আর ফিরিশতা জগতকে পরকালে মানব চক্ষু দর্শন লাভ করতে যে সক্ষম হবে তাও বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে না। সাথে সাথে ফিরিশতাদের নিয়ন্ত্রণে পরকালের শাস্তি ও শান্তির ব্যবস্থাকেও বিশ্বাস করবে দৃঢ়ভাবে। হয়তো সেদিন বেশি দূরে নয়।

৬. "বিচার দিবস সম্পর্কে তুমি কি জানো? সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলা-ধূসর, তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা, এরাই অবিশ্বাসী ও পাপাচারী।" (৮০ ঃ ৩৮-৪২)

(৬) বিজ্ঞানবিশ্ব হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে যতোই কণা পদার্থ বিজ্ঞানে (Particle physics-এ) অগ্রসর হচ্ছে ততোই যেনো পরকালের ব্যবস্থাপনা ও বিষয়াদির একটা একটা করে পর্দা উন্মোচন করছে মানব জাতির সম্মুখ থেকে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এক সময় মানব জাতির পরকাল বিষয়ক জ্ঞানের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি ঘটায় তখন বিজ্ঞানীগণ অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন ইহকাল ও পরকালের অস্তিত্ব এবং পরকালের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা তথা পরম শান্তি ও চরম শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে যা আল-কুরআন বার বার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

আঠারো শতকের বিজ্ঞান পরকাল বিষয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বিরোধিতা করেছিল, আজকে বিজ্ঞান সেই অবস্থানে নেই। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান সেই বিন্দু থেকে বহু বহু দূরে সরে এসে আল-কুরআনের একেবারে নিকটে অবস্থান নিয়েছে। বেশি না হোক অন্তত বর্তমান ধারাও যদি বিজ্ঞান 'Particles physics'-এ ধরে রাখতে পারে তাহলে আশা করা যায় অচিরেই বিজ্ঞান সরাসরি আল্লাহর কুদরতের অনেক কিছুই বিশ্ববাসীর সম্মুখে মুক্তভাবে মেলে ধরতে সক্ষম হবে। যা মানব জাতির কল্যাণে ইহজগত ও পরজগতকে বাস্তবতায় রূপ দিতে সহায়তা করবে।

৭. *"যেদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করবেন, সেদিন ওদের মনে হবে যে ওদের অবস্থিতি (পৃথিবীতে) দিবসের মুহূর্তকাল ছিলো মাত্র।" (১০ ঃ ৪৫)*

৭. বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন 'Special theory of relativity' এবং 'General theory of relativity' প্রকাশ করে বিজ্ঞান বিশ্বে মর্যাদার শ্রেষ্ঠ আসনটি অলঙ্কত করে আছেন।

আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রমাণ করে যে, মহাবিশ্বে 'স্থান-কাল' পাত্রভেদে ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণে পৃথিবীর হাজার বছর অন্য কোনো গ্রহে হয়তো বা তা মাত্র কয়েক দিনের সমান। আবার আমাদের পৃথিবী মাত্র ২৫০০০ মাইল পরিধি বিশিষ্ট একটি গ্রহ মাত্র, কিন্তু আপেক্ষিকতার কারণে পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ৩৫০০০ গুণ বড় সৃষ্ট গ্রহ মহাকাশে বিরাজমান আছে, যা নিকট অতীতে বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেছেন। অর্থাৎ আবিষ্কৃত গ্রহটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃথিবীর সমান।

তাই পরকাল বিষয়ক আল-কুরআনে 'স্থান ও কাল (Space & Time) সম্পর্কীয় যে বাস্তবতা উল্লিখিত হয়েছে বিজ্ঞানবিশ্ব তা স্বীকার না করে পারছে না। 'স্থান ও সময়' (Space & Time) পদার্থ বিদ্যার বেলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় আল-কুরআন বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছে বিজ্ঞানের প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে, যা প্রমাণ করতেও বিজ্ঞানকে সর্বোচ্চ জ্ঞানে সমৃদ্ধ

"আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই, এটা এক মহাসাফল্য।" (১০ : ৬৪)

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে কাজে প্রয়োগ করতে হয়েছে। কুরআনের এ জাতীয় জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে সর্বদা অগ্রবর্তী অবস্থান গ্রহণ বিজ্ঞানের চোখে রীতিমতো বিস্ময়কর ও হতবাক করার মতো ব্যাপার।

অতএব, নক্ষত্রবিহীন হাশরের মাঠ নামক নতুন গ্রহ (জগৎ) সৃষ্টি, এর ভাসমান ও চলমান অবস্থায় একাকী মহাশূন্যে টিকে থাকা এবং পরকালে উক্ত গ্রহ থেকে শুরু করে জান্নাত, জাহান্নামসহ সকল কিছুই যে আল্লাহর বিশেষ 'নূর'-এর মাধ্যমে আলো ঝলমল পরিবেশে সর্বোচ্চ মানে সাজানো-গোছানো হয়েছে, আল-কুরআনের প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বের সেই বলিষ্ঠ ও অকাট্য দাবী বর্তমান চরম উৎকর্ষিত বিজ্ঞান তার উচ্চতম জ্ঞানের ব্যাপক সমারোহের মাধ্যমে প্রকাশ্য স্বীকৃতি প্রদানের ভেতর দিয়ে মানব জাতির জন্য এক বিরাট কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সত্য নয় কী?

হংধী পাঠক! আল-কুরআন তাই আপনাকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেথ "আল্লাহ্‌ যে মহাবিশ্বের (ইহজগৎ ও পরজগতের) একমাত্র স্রষ্টা, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ আছে কী?" (১৪ : ১০)

'শিঙ্গায় ফুৎকার'

আল-কুরআন

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (সমগ্র মহাবিশ্ব) এবং ওদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (৪৬ ঃ ৩)

"এর জ্ঞান (সেই নির্দিষ্ট করা কিয়ামাত সম্পর্কে) কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে।" (৬৭ ঃ ২৬)

"হে মানুষ! ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে, কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।" (৯২ ঃ ১)

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র একটি ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।" (৬৯ ঃ ১৩-১৬)

"যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে আল্লাহ্‌ যাদেরকে পছন্দ করবেন তারা ব্যতীত এবং সকলেই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়।" (২৭ ঃ ৮৩)

"যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং যেদিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করবো।" (২০ ঃ ১০২)

"সেদিন প্রথম শিঙ্গা ধ্বনি প্রকম্পিত করবে, তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গা ধ্বনি।" (৭৯ ঃ ৬-৭)

"আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া, সেদিন শাস্তির দিন– যার ভয় তোমাকে দেখানো হতো, সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সঙ্গে থাকবে চালক ও সাক্ষী, তুমি এ দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, এখন আমি তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। আজ তোমার দৃষ্টি শক্তি খুবই প্রখর।"
(৫০ ঃ ২০-২২)

"এরাতো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাতে কোনো বিরতি থাকবে না। (৩৮ ঃ ১৫)

"তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ এ সম্পর্কে যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথরের ঝাঁক প্রেরণ করবেন? তখন তোমরা বুঝতে পারবে কিরূপ ছিলো আমার সতর্ক বাণী।" (৬৭ ঃ ১৭)

"যখন গ্রহাণু বিক্ষিপ্তভাবে স্থানচ্যুত হবে।" (৮২ ঃ ২)

"শপথ আকাশের এবং আঘাতকারীর, তুমি কি জানো সেই আঘাতকারী বস্তুটি কি? ওটি একটি প্রজ্জ্বলমান জ্যোতিষ্ক।" (৮৬ ঃ ১-৩)

"সূর্যকে যখন বিপর্যস্ত করে দেয়া হবে। যখন নক্ষত্রসমূহ স্থানচ্যুত হয়ে বিপর্যয় ঘটাবে।" (৮১ ঃ ১৩২)

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে)।" (৭৭ ঃ ৯)

"যখন আকাশের ছাদ (আবরণ) বিপর্যস্ত হবে।" (৮১ ঃ ১১)

"যখন চন্দ্রও হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে, সেদিন মানুষ বলবে আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, আজ কোনো আশ্রয়স্থল নেই।" (৭৫ ঃ ৮-১০)

'আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাত ওরা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (৩৯ ঃ ৬৮)

সুধী পাঠক! উপরে উল্লিখিত আল্-কুরআনের আয়াতগুলোর মর্মকথা উপলব্ধির পূর্বেই 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটি বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। নতুবা আমরা আল-কুরআনের সঠিক বার্তাটি হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হবো। চলুন তাহলে!

'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাক্যটি একটি 'বাগধারা'। শিঙ্গায় ফুৎকার বলতে শাব্দিক অর্থে বুঝায় টেকনিক বা কৌশল অবলম্বনে ক্ষুদ্রস্থান থেকে বৃহৎ স্থানের দিকে বাতাসকে শব্দসহ প্রবলভাবে প্রবাহিত করা। শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া বাতাস অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উৎসস্থল হতে ক্রমান্বয়ে যতোই সম্মুখ পানে এগুতে থাকে, ততোই প্রশস্ততর এলাকায় বিকট শব্দসহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

শিঙ্গার শুরুতে মুখের সাহায্যে অধিক পরিমাণ বাতাসকে চাপ দিয়ে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ বা সরু পথে প্রবাহিত হতে বাধ্য করায় সেখানে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয়। এই শব্দকেই সঙ্গীতানুষ্ঠানে কিংবা সেনাবাহিনীতে বিউগল বাজাতে ব্যবহার করা হয়।

এখন এই শিঙ্গায় ফুৎকার কথাটি কুরআনের বেলায় ব্যবহার হয়েছে দৃশ্যমান জগৎ ধ্বংস ও সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে পরক্ষণে পুনরায় নতুনভাবে জগৎ সৃষ্টি বিষয়ক বক্তব্যগুলোতে। কুরআনের আয়াতগুলোতে, স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে এই শিঙ্গায় ফুৎকার এক মহানাদ বা এক মহাবিস্ফোরণ-এর সাথে সরাসরি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কুরআনের ভাষ্য মতে মহানাদ বা বিকট শব্দ এবং মহাবিস্ফোরণ আগে কার্যকর করা হবে এবং পরক্ষণে তার প্রতিক্রিয়ায় শিঙ্গায় ফুৎকারের ন্যায় ঘটনা প্রবাহ এগিয়ে নেয়া হবে। ধ্বংসের বেলায় যেমন এ পদ্ধতিই ঘটবে তেমনি নতুন সৃষ্টির বেলায়ও একইভাবে তাই ঘটবে। এর কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ঘটবে না।

আমাদের সমাজে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বিষয়টি বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে কল্পনার জালে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমাদের মাঝে অধিকাংশ মানুষই মনে করেন যে, হযরত ইস্রাফিল (আ) ফিরিশতা মুখে শিঙ্গা লাগিয়ে আকাশে দাঁড়িয়ে আছেন আল্লাহ্র আদেশের অপেক্ষায়, যখনই আল্লাহর আদেশ আসবে, তখনই তিনি শিঙ্গা বাজিয়ে 'কিয়ামাত' ঘোষণা করবেন। আর অমনি মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে। এরপর আবার তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করবেন, সাথে সাথে তখন পরকালের নতুন জগৎ তৈরী হয়ে যাবে এবং মানুষ দলে দলে জীবন্ত হয়ে উঠে আসবে বিচারের মাঠে। মূলত মহাবিশ্ব এবং এর সৃষ্টি ও ধ্বংস বিষয়ক সঠিক জ্ঞান ও এ সম্পর্কীয় কোন

গবেষণা আমাদের মাঝে না থাকায় আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী উল্লিখিতভাবে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক তথ্যটিকে ভিন্নভাবে চিত্রিত করেছি।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ মহাবিশ্বকে ও তার ভেতরকার সমস্ত কিছু নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি আবার প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস সাধনের জন্যও তিনি নিজে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। খুঁটিবিহীন ভাসমান অবস্থায় সম্পূর্ণ মহাবিশ্বকে এবং মহাবিশ্বের ভেতরকার প্রতিটি বস্তুগত সত্তাকে আল্লাহর নির্দেশ মতো যথাস্থানে যথাযথভাবে টিকিয়ে রাখা আবার আল্লাহ্র নির্দেশ মতো তাঁরই পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ধ্বংস করা ও পুনরায় সৃষ্টি করার সহযোগিতা প্রদানের দায়িত্ব (Law of gravitation-এর মাধ্যমে ভারসাম্য তৈরী করার দায়িত্ব) হযরত ইস্রাফিল (আ) এর উপরই ন্যস্ত। কুরআন এবং হাদীস থেকে আমরা তা জানতে পেরেছি।

আল্লাহ্ যখন তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী এ পৃথিবীর কিয়ামাত ঘটাতে চাইবেন তখন পূর্বমুহূর্তে তিনি হযরত ইস্রাফিল (আ) কে তা ঘটাবার আদেশ প্রদান করবেন, ফলে তখনই আদেশ মতো ইস্রাফিল (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে এই জগতের অর্থাৎ পৃথিবীর ধ্বংস সাধন ঘটাবেন। এ ধ্বংস সাধন প্রক্রিয়াশুরু হবে এক বিকট শব্দসহকারে যার মাঝে কোনও প্রকার বিরতি থাকবে না, ফলে ভয়ঙ্কর মহাজাগতিক বিপর্যয়ের কারণে পৃথিবীর দিকে প্রবল থেকে প্রবলতর বেগে বাতাস ও ভাসমান হাজার হাজার পাথর খণ্ড, ধূমকেতু ও উল্কাখণ্ডসহ অগণিত বস্তু ধাবিত হয়ে পৃথিবীকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে, যা 'শিঙ্গায় ফুৎকার' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

আমরা আমাদের গ্রামের পরিবেশেও দেখতে পাই খড়ি-কাঠ কিংবা শুকনো লতা-পাতা দিয়ে জ্বালানো চুলোতে অগ্নিকে উত্তেজিত করার জন্য দূর থেকে সরু পাইপের ভেতর দিয়ে জোরে 'ফুৎকার' অর্থাৎ 'ফুঁ' দিতে হয়। এতে চুলোর ভেতর স্তিমিত অগ্নি ফুৎকারের প্রচণ্ড প্রভাবে আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। যেহেতু পৃথিবীর বাইরের পরিবেশ হতে একযোগে ব্যাপক

(ক) "যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র একটি ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।" (৬৯ : ১৩-১৫)
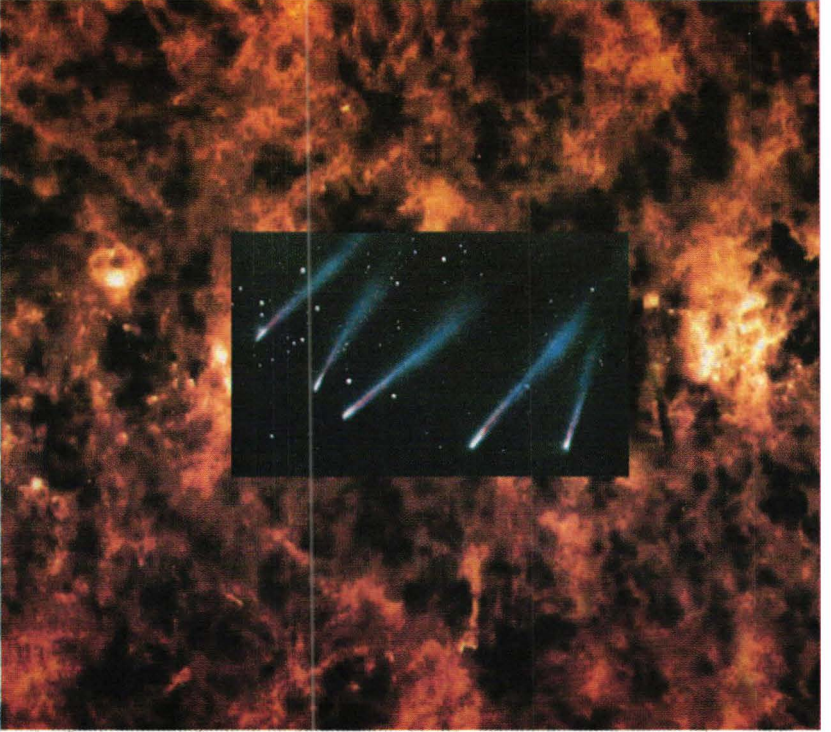
চিত্র-৮৮ (ক)

–কিয়ামাতের দিন পৃথিবীর বাইরের পরিবেশ হতে একযোগে ব্যাপক আকারে মহাজাগতিক পাথরখণ্ড, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, ঝড়, অগ্নি ও বিভিন্ন মাত্রার তেজস্ক্রিয় শক্তি প্রবাহিত করে ও আঘাত করে পৃথিবীর ধ্বংস ঘটানো হবে, তাই কুরআনে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নানা বিপর্যয়ের কথা বলার সাথে সাথে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটিও ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কিয়ামাতের ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকটি প্রকট থেকে প্রকটতরভাবে ধরা দিয়েছে। মূলত শিঙ্গায় ফুৎকারে একদিকে ক্ষুদ্র পরিসর হতে বৃহত্তর পরিবেশে প্রবলভাবে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরী হয় অপরদিকে ঐ টেকনিকের কারণে বাতাসের চাপে প্রচণ্ড শব্দও তৈরী হয়। কিয়ামাতের দিন পৃথিবীর বেলায়ও অনুরূপ ঘটবে বিধায় আল্লাহ্ শিঙ্গায় ফুৎকার বাগধারাটি ব্যবহার করেছেন।

(খ) "যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে।" (২৭ : ৮৩)
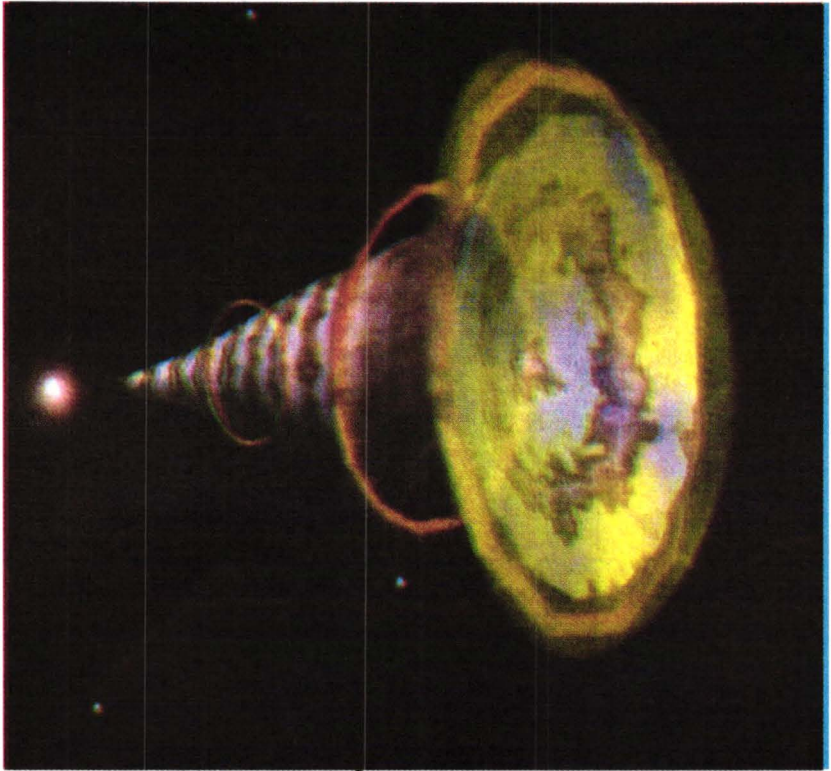
চিত্র-৮৮ (খ)

–'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটি বুঝার জন্য উপরের ছবিতে একটি মাত্র বিস্ফোরণ স্থান হতে– শব্দ, তেজস্ক্রিয়তা, ধূলা-বালি ও শক-ওয়েভ এবং 'কসমিক-রে' ইত্যাদি কিভাবে শিঙ্গার আকৃতি ধারণ করে মহাশূন্যে এগিয়ে যাচ্ছে তা ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই পাঠক সমাজ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন।

কিয়ামাতের দিন পৃথিবীর বাইরের পরিবেশ থেকে একযোগে লক্ষ-লক্ষ গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কা, কসমিক ডাস্ট (Cosmic dust) তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) কসমিক-রে (Cosmic-rays) ইত্যাদি প্রচণ্ডগতিতে উড়ে এসে পৃথিবীকে আঘাত করে করে সার্বিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলবে। ফলে পৃথিবী সমস্ত কিছুকে সাথে নিয়ে ধ্বংসের মধ্যে তলিয়ে যাবে। জ্বলে-পুড়ে, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে পৃথিবী।

আল্লাহ্ এই মহাবিপর্যয়কে স্বল্প কথায় প্রকাশার্থেই 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটি ব্যবহার করেছেন।

আকারে মহাজাগতিক ঝড়, পাথর খণ্ড, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, অগ্নি ও বিভিন্ন মাত্রায় তেজস্ক্রিয় শক্তি প্রবাহিত করে কিয়ামাতের দিন পৃথিবীকে আঘাত হানার মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে, তাই কুরআনে বিভিন্ন ভঙ্গিতে নানা বিপর্যয়মূলক শব্দ ব্যবহারের সাথে সাথে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটিও ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকটি প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে। শিঙ্গায় ফুৎকারে একদিকে প্রচণ্ড শব্দ হয় অপরদিকে প্রবলভাবে বাতাস প্রবাহিত হয় বিধায় পৃথিবীর কিয়ামাতের বেলায়ও ঠিক তেমনটি ঘটবে বলেই এখানে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার সৃষ্টির বেলায়ও প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পরপরই সৃষ্টির উপকরণকেও (উপাদানসমূহকে) চতুর্দিকে বৃহৎ পরিবেশে প্রবল থেকে প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হওয়াকে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। কর্মতৎপরতার দিক থেকে আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটি প্রকাশ করে ক্ষুদ্র পরিসর হতে ক্রমান্বয়ে বৃহৎ পরিসরে শব্দসহ কাজের সামগ্রিক পরিণতির গমনকে বুঝানো হয়েছে, যার সাথে সাথে থাকবে ভয়াবহতা, ভয়ঙ্কর ও বিপর্যয়মূলক অবস্থার সংশ্লিষ্টতা। এটাই হচ্ছে কুরআনিক 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটির বৈজ্ঞানিক মৌলিক ব্যাখ্যা।

এখন আমরা শুরুতে উল্লিখিত আল-কুরআনের পবিত্র আয়াতসমূহের মর্মকথা উপলব্ধির চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

সর্বপ্রথম উদ্ধৃত ৪৬ ঃ ৩ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সমগ্র মানবমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে অবহিত করেছেন এই বলে যে, দৃশ্যমান এ বিশাল মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ব্ল্যাক হোল, নেবুলা, গ্যালাক্সি, আলো, বাতাস, পানি ও পদার্থ কণিকাসহ সমস্ত কিছুই তিনি একটি নিখুঁত পরিকল্পনার অধীনে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকটি বস্তুগত সত্তাকে আবার পৃথক পৃথকভাবে জীবনকাল (Life time) নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাতে করে প্রতিটি বস্তুই একটা নির্দিষ্ট সময় পর ধ্বংস হয়ে যায়, অর্থাৎ গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, গ্যালাক্সিসহ এমনকি এক সময় পূর্ণাঙ্গ মহাবিশ্বটিও যেনো তার সমগ্র অস্তিত্বের বিলোপ সাধন

শেষে দৃশ্যমান অবস্থা থেকে বিলীন হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লাহ্ একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে নিরঙ্কুশভাবে যেমন তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি আবার নিরঙ্কুশভাবে তিনি সমস্ত কিছুকে তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা সময়ে এক এক করে ধ্বংস করার কাজটি যথাযথভাবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে না শুরুতে, না শেষে, আর না মধ্যবর্তী পর্যায়ে কেউ বাধা দিতে পারে, না কোনো প্রকার সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারে। সমগ্র মহাবিশ্বে আল্লাহ্কে বাধাদানকারী কিংবা তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী না থাকায় তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি কাজ সংঘটিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও নিরঙ্কুশভাবে যথাসময়ে সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

৬৭ ঃ ২৬ আয়াতে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, মহাবিশ্ব এবং এর ভেতরকার প্রতিটি বস্তু ধ্বংসের যে সময় তিনি নির্ধারণ করেছেন তা সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তাঁর প্রিয় নবী-রাসূল (সা) গণও সে সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখেন না। এ ব্যাপারে সকল প্রকার জ্ঞান একমাত্র তিনি নিজেই সংরক্ষণ করেন। যতো প্রকার চেষ্টা-সাধনা করা হোক বা পার্থিব জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন করা হোক না কেন অন্তত এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান আর কেউ লাভ করার কোন প্রকার সুযোগ নেই।

২২ ঃ ১ আয়াতে মানব জাতিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবী ধ্বংসের নির্দিষ্ট সময়টি জানার চেয়ে মানব জাতির এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে যথাযথভাবে ভয় করা। কারণ যখন তিনি পৃথিবীর ধ্বংস সাধন শুরু করবেন, তখন কল্পনাতীত চতুর্মুখী ধ্বংসীয় ব্যবস্থা এমনভাবে পৃথিবীকে আঘাত করবে যে, তাণ্ডবের প্রচণ্ডতায় পৃথিবী অসহায়ভাবে থর-থর করে কাঁপতে থাকবে। ভয়াবহ ভূমিকম্পে ও ভূমি ধ্বসে পৃথিবী নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।

৬৯ ঃ ১৩-১৬ এই কয়টি আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর কিয়ামাত ঘটাবার সময় এর বাইরের পরিবেশ থেকে প্রবলভাবে বাতাস ও মহাশূন্যে

ভাসমান পাথর খণ্ড, ধূমকেতু, গ্রহাণু, বিপর্যস্ত উপগ্রহ ও গ্রহ নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ, জ্বলন্ত অগ্নি, প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তাসহ অন্যান্য ভয়ঙ্কর পদার্থ ও বস্তু প্রবল গতিতে এসে পৃথিবীকে যে আঘাত করবে, তাতে পৃথিবী পৃষ্ঠে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ পাহাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হবে এবং পৃথিবীও তখন তার কক্ষপথে সুষমভাবে এগিয়ে যেতে পারবে না। প্রচণ্ড ধাক্কায় এদিক-ওদিক হেলে-দুলে এগিয়ে যাবে কক্ষপথে। ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে ঘটবে ওলট-পালটসহ বিপর্যয়কর এক মহাপ্রলয়।

পৃথিবীর বাইরের পরিবেশ থেকে প্রবলবেগে আসা মহাজাগতিক দুর্যোগপূর্ণ বাতাস-বস্তু ও পদার্থের কারণে পৃথিবীর নিরাপত্তামূলক আবরণ বা বায়ুমণ্ডল তছনছ হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে এবং মহাকাশীয় ক্ষতিকর বস্তু ও পদার্থের সরাসরি আঘাতে পৃথিবীর আকাশ ও পরিবেশ ধ্বংসের গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

এরপর ৩৯ ঃ ৬৮ আয়াতে বলা হয়েছে 'শিংগায় ফুঁৎকার' তথা মহাজাগতিক প্রবল বায়বীয় ঝড় ও প্রবলবেগে ধাবমান কঠিন বস্তু ও পদার্থের এবং ক্ষতিকর প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণে দিশেহারা মানব সমাজ তাণ্ডবের ভয়াবহতা দর্শনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, তবে আল্লাহ্ যাদেরকে এ মহাবিপদ থেকে রক্ষা করতে চাইবেন তারা ব্যতীত। তারা কিয়ামাতের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা যতোই ভয়ঙ্কর হোক না কেন এর কিছুমাত্র তারা টের পাবে না। আল্লাহ্ নিজে তাদের নিরাপদ হিফাযতের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২৭ ঃ ৮৩ আয়াতে উপরের তথ্যেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে শেষ দিকে বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের ভয়াবহতায় বিপর্যস্ত হওয়া মানুষগুলো খুবই কাতর, অসহায়, হত-বিহ্বল ও করুণার পাত্র হয়ে বিনীত গোলামের মতো আল্লাহ্র সম্মুখে হাজির হবে। পৃথিবীর জীবনে উদ্ধত অহঙ্কারী, বেপরোয়া, দুধর্ষ ও খোদাদ্রোহিতার যে উগ্রমূর্তি তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল তার সবটুকুই তখন উধাও হয়ে যাবে।

২০ ঃ ১০২ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিন উল্লিখিত অপরাধীদের অন্ধ অবস্থায় আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। কারণ তারা যখন দুনিয়ায় দৃষ্টিমান ছিলো তখন সমগ্র মহাবিশ্ব দর্শন করেও স্রষ্টার প্রতি ঈমান পোষণ করতে পারেনি, স্রষ্টাকে অস্বীকার করেছিল, পরকালীন ব্যবস্থাকে

অস্বীকার করেছিল। তাই পরকালের ব্যবস্থাকে বাস্তবভাবে দৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করার সকল প্রকার সুযোগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে।

এরপর ৭৯ ঃ ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথম 'শিঙ্গায় ফুৎকার' তথা ব্যাপক ধ্বংসীয় বিপর্যয় পরিচালিত হওয়ার পর অর্থাৎ পৃথিবীর পরিপূর্ণভাবে কিয়ামাত ঘটানোর পর সময় আসবে দ্বিতীয় 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর।

এরপর ৫০ ঃ ২০-২২, ৩৮ ঃ ১৫, ৬৭ ঃ ১৭, ৮২ ঃ ২, ৮৬ ঃ ১-৩, ৮১ ঃ ১ ও ২, ৭৭ ঃ ৯, ৮১ ঃ ১১, ও ৭৫ ঃ ৮-১০ এই কয়টি আয়াতেও কিয়ামাতের ধ্বংসলীলার বেশ কতগুলো ভয়াবহ অবস্থার চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সেদিন ধারণাতীত বিকট-বিকট শব্দসহ মহাজাগতিক প্রবল ঝড়, কঠিন বস্তু ও পদার্থ, নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ, গ্রহ-উপগ্রহের ধ্বংসাবশেষ, পাথরের ঝাঁক, জ্বলন্ত অগ্নি, প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মিসহ ইত্যাদি ক্ষতিকর বিষয় ব্যাপকভাবে পৃথিবীর চতর্দিকে অবস্থানরত মানব সমাজকে আক্রান্তকরবে। ফলে মানুষেরা তখন শুধুমাত্র প্রাণে বাঁচার জন্যই পাগলের মতো দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে হন্যে হয়ে ছুটতে থাকবে আর চিৎকার দিয়ে বলতে থাকবে– 'পালাবার কোন স্থান আছে কী? আত্মরক্ষার জন্য কোন নিরাপদ স্থান কি পাবো না?' তখন জবাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলা হবে– 'না, আজ পালাবার কোন স্থান নেই, আত্মরক্ষার কোনো স্থান নেই। আজ শুধু এক আল্লাহ্র সম্মুখে লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হওয়ার দিন।

সর্বশেষ ৩৯ ঃ ৬৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী কিয়ামাতে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হওয়ার পর আবার যখন 'শিঙ্গায় ফুৎকার' দেয়া হবে অর্থাৎ প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে, তখন ঐ বিস্ফোরণে সৃষ্ট প্রবল চাপযুক্ত বাতাস ও পদার্থ কণিকা তুলনামূলক ক্ষুদ্র স্থান থেকে চতুর্দিকে ব্যাপক-বিশাল স্থানের দিকে প্রচণ্ড ধাক্কায় ছুটে যেতে থাকবে, ফলে তখন ঐ অবস্থায় ছুটে চলা পদার্থ কণিকা থেকে মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে সৃষ্ট নতুন নতুন জগতে, ভূমি থেকে নতুনভাবে সৃষ্ট মানুষগুলো আশ্চর্য হয়ে চতুর্দিকে তাকাতে থাকবে। আর ভাবতে থাকবে এ কি যাদু-মন্ত্র! কোথা থেকে কি ঘটে গেলো! 'আমরা ছিলাম পৃথিবীতে আনন্দঘন পরিবেশে। হঠাৎ প্রচণ্ড বিপর্যয়

আমাদেরকে আঘাত হেনে সব তছনছ করে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এখন আবার বিশাল মরুদ্যানে কে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলো? জবাবে বলা হবে, 'তোমরা যে বিচার দিবসকে অস্বীকার করেছিলে, এটা সেই বিচার দিবসের হাশর ময়দান। আল্লাহই তোমাদের বিচারের জন্য এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আজ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় সবাইকে পৃথিবীর জীবনের পরিপূর্ণ হিসাব দিতে হবে।'

'শিঙ্গায় ফুৎকার' বিষয়ে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন থেকে পর্যালোচনা করেছি। এবার আমরা একই বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান কি বক্তব্য প্রদান করেছে, তা আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে আগ্রহী। চলুন তাহলে!

বিজ্ঞান

বর্তমান একবিংশ শতাব্দির গোড়াতে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালে দেখা যায় প্রতিনিয়ত অগ্রসরমান বিজ্ঞান বিগত কয়েক শতাব্দিতে এ মহাবিশ্বের অগণিত বিষয়ে গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালিয়ে আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের পাহাড় সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। এ সাফল্য বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই সমভাবে কার্যকর হয়েছে।

বিজ্ঞানবিশ্ব মহাকাশ বিজ্ঞানে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে বিগত বিংশ শতাব্দিতে। এ সময় আমাদের এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি, এর ভেতরকার সকল প্রকার বস্তুদের আকার, আকৃতি, গঠন ও শেষ পরিণতি, বিভিন্ন প্রকার শক্তির রহস্য উন্মোচনসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই মানব জাতিকে অবহিত করতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের এ সুন্দর সবুজ শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ, হাজারো প্রকার প্রাণের সমারোহে ধন্য ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কোলে জড়ানো এ পৃথিবীর সৃষ্টি এক সময় করুণ এক পরিণতির ভেতর দিয়ে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীকে ম্লান করে দিয়ে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, সে বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণ হাজির করে মানব জাতির চিন্তার রাজ্যকে ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা সাধিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আবিষ্কৃত উন্নতর প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞান 'টেলিস্কোপ' (Telescope) -এর কল্পনাতীত উন্নতি ঘটাতে যেমন সক্ষম হয়েছে তেমনি পৃথিবীর চতুর্দিকে কক্ষপথে বহু 'কৃত্রিম উপগ্রহ' (Satellite) স্থাপন করে মহাবিশ্বের গভীরে পর্যবেক্ষণের সুযোগ লাভ করেছে। ফলে মহাবিশ্বের অভ্যন্তরে লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সির কর্মকাণ্ড ও শেষ পরিণতি এবং বিশেষ ক্ষেত্রে নক্ষত্র, গ্রহ ও ব্ল্যাকহোলসহ মহাজাগতিক বস্তুদের জীবন পরিক্রমণ (Life cycle) ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে ইতোমধ্যে বিজ্ঞান মহাবিশ্বে ঘটে যাওয়া অনেক মহাজাগতিক বস্তুর ধ্বংসযজ্ঞ বা শেষ পরিণতির অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মানব জাতিকে যথাযথভাবে অবহিত করেছে। এরই আলোকে আমাদের এ পৃথিবীর শেষ পরিণতি বা ধ্বংস সাধন কি কি পদ্ধতিতে ঘটতে পারে তারও একটি অগ্রিম তালিকা প্রকাশ করেছে। বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে এ পৃথিবীর কিয়ামত বা ধ্বংসযজ্ঞ ভবিষ্যতে ঘটতে পারে মোট আট (৮) টি পদ্ধতিতে।

যেমন–

১. সৌরজগতের প্রাণ নামক 'সূর্য'-র ধ্বংসের কারণে।

২. ধূমকেতুর পতনের কারণে।

৩. বড় আকারের 'গ্রহাণু' পতনের কারণে।

৪. সুপারনোভা বিস্ফোরণের কারণে।

৫. ব্লাকহোলের কারণে।

৬. একাধিক নক্ষত্র সংঘর্ষের কারণে।

৭. একাধিক গ্যালাক্সি সংঘর্ষের কারণে।

৮. গ্যালাক্সি আলোর গতিতে উড়তে গিয়ে সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে।

আমাদের সৌরজগতের প্রাণ নামক জ্বলন্ত ঐ সূর্যটি যদি তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে এক পর্যায়ে অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজ দেহকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয় তাহলে তার ঐ জ্বলন্ত অগ্নিময় ও তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন দেহের বিরাট

(ক) "যখন সূর্যকে বিপর্যস্ত করে দেয়া হবে। যখন নক্ষত্রসমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মহাবিপর্যয় ঘটাবে।" (৮১ : ১৩২)
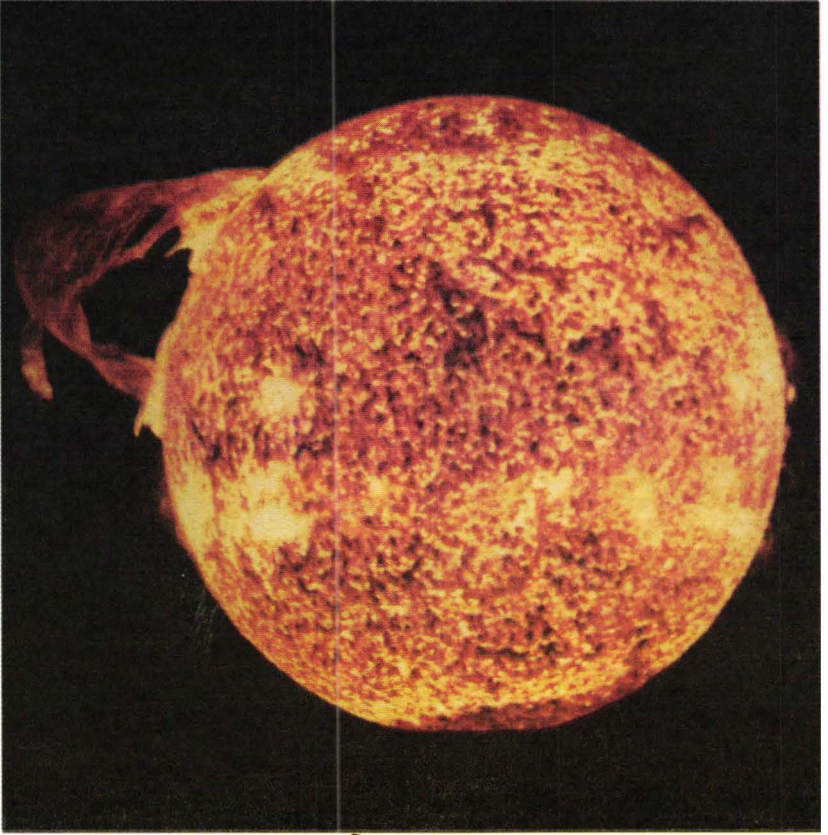
চিত্র-৮৯ (ক)

–আমাদের এই নয়নাভিরাম প্রিয় পৃথিবীর কিয়ামাত ঘটার জন্য বিজ্ঞান বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বেশ কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে একটি অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে– আমাদের প্রকাণ্ড সূর্যটি ধ্বংসের মাধ্যমে। সৌরজগতে প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে– সূর্য, সূর্য তার চতুর্দিকে মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে গ্রহসমূহকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘূর্ণন ও পরিভ্রমণ অবস্থায় ধরে রেখেছে। এখন কোন কারণে যদি সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্যটি ধ্বংস হয় তাহলে সমস্ত গ্রহ ব্যবস্থাও সাথে সাথে বন্ধনমুক্ত হয়ে এবং সূর্যের বিক্ষিপ্ত খণ্ড-বিখণ্ড ও কসমিক ডার্স্ট, প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা, বিভিন্ন 'কসমিক-রে' ইত্যাদির আঘাতে এ পৃথিবীসহ সবাই ধ্বংসের মধ্যে নিপতীত হবে। সূর্য ধ্বংস মানেই সমগ্র সৌরপরিবারই ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাওয়া।

(খ) "যখন সূর্যকে ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে, সেদিন মানুষ বলবে আজ পালাবার স্থানটি কোথায়? না, আজ পালাবার কোন আশ্রয়স্থল নেই।" (৭৫ : ৮-১০)
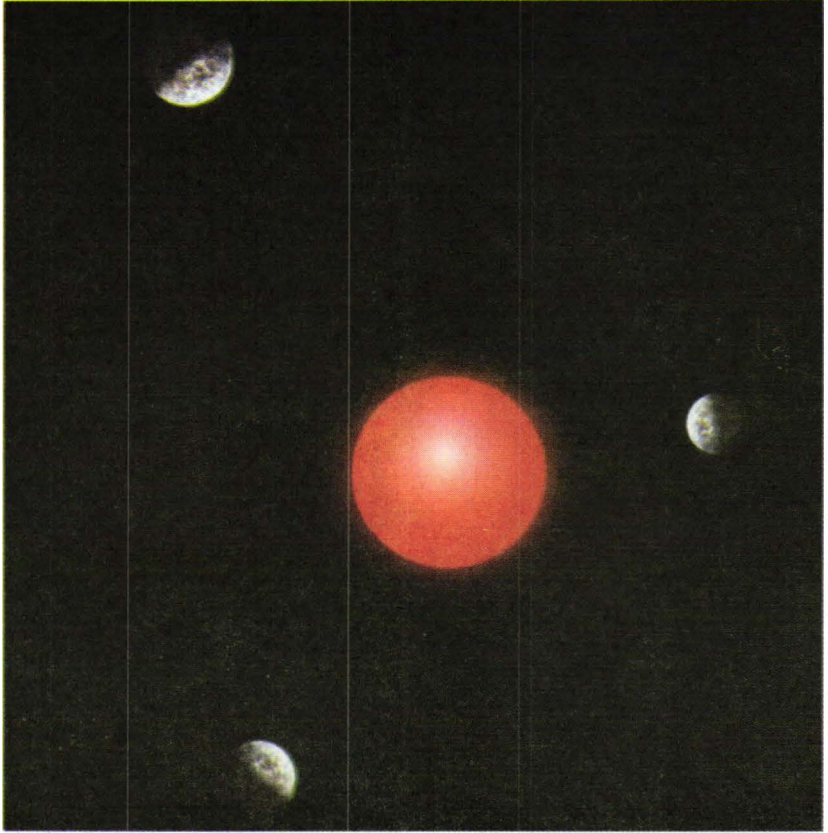
চিত্র-৮৯ (খ)

–একটি নক্ষত্র ধ্বংস হয় তখন, যখন তার ভেতরকার জ্বালানী পারমানবিক চুল্লীতে পুড়ে-পুড়ে, নিঃশেষ হয়ে যায়। জ্বালানী নিঃশেষ হলে ভেতরের পারমানবিক চুল্লী আর পূর্বের মতো জ্বলতে না পারায় শক্তি উৎপাদনেও ব্যাঘাত ঘটে। এ অবস্থায় স্বল্প মাত্রার উৎপাদিত শক্তি বাইরের দিকে নির্গমন না করে নক্ষত্র কেন্দ্র নিজেই গ্রহণ করতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে দেখা যায় গোটা নক্ষত্র দেহ লাল রং ধারণ করে, ফুলে আকৃতিতে অনেক বড় হয়ে উঠে, বিজ্ঞানের ভাষায় নক্ষত্রের এ অবস্থাকে বলা হয় 'Red Giant' এ 'রেড জিয়ান্ট' অবস্থা প্রাপ্ত নক্ষত্র তখন অনেক গ্রহের কক্ষপথ পর্যন্ত বিশাল দেহের অধিকারী হয়ে যায় এবং একাধিক গ্রহ ধ্বংসের কারণ হয়, 'রেড জিয়ান্ট' অবস্থা বেশি দিন বিরাজমান থাকে না, অতি অল্প সময়ে এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে যায়।

"যখন সূর্য জ্যোতিহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, যখন জ্যোতিষ্কসমূহ বিস্ফারিত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।" (৭৭ : ৮)
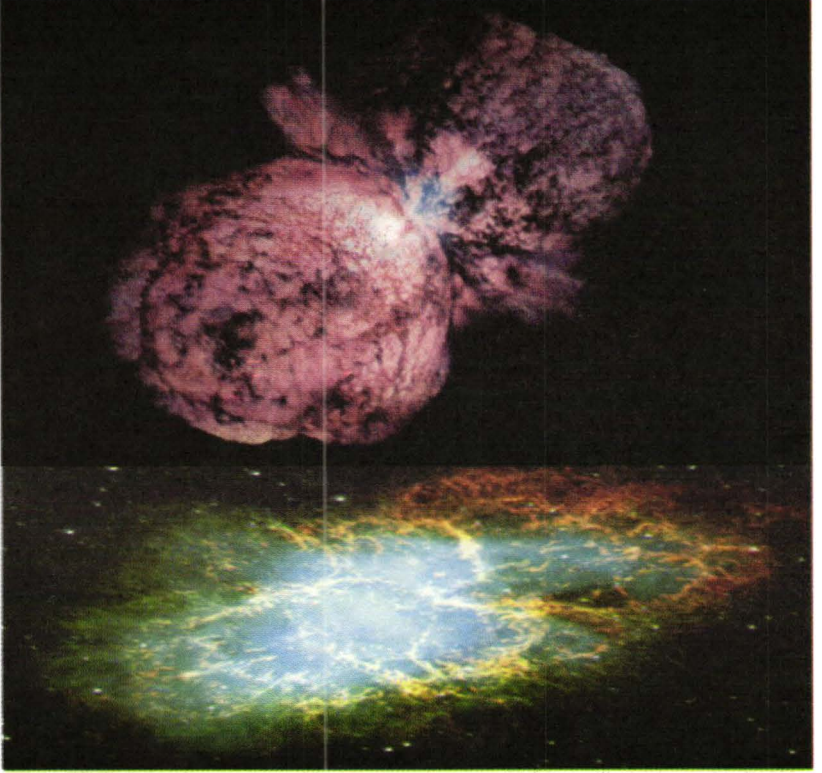
চিত্র-৯০

—যখন কোন নক্ষত্র মৃত্যুপথযাত্রী হিসেবে 'রেড জিয়ান্ট' (Red Giant) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তার কেন্দ্র তৎপন্ন তাপ নির্গমন না করে নিজেই গ্রহণ করতে থাকে। ফলে সমগ্র নক্ষত্র দেহ ফুলতে থাকে। এক পর্যায়ে উৎপন্ন তাপশক্তি আর গ্রহণ করতে না পেরে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এ অবস্থায় নক্ষত্রদেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে চতুর্দিকে তেজস্ক্রিয়তাসহ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০,০০০ মাইল গতিতে ছুটতে থাকে। উত্তপ্ত আগুন, কসমিক ডার্স্ট, তেজস্ক্রিয়তা ও 'কসমিক-রে'সহ ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের সমস্ত কিছুই গ্রহদের দিকে তখন উল্লিখিত গতিতে ছুটে আসতে থাকায় দূর মহাশূন্য থেকে তখন 'শিঙ্গায় ফুৎকার' এর মতোই দেখা যায়। আর তাই কুরআন এই বাগধারাটি ব্যবহার করেছে অবস্থার ভয়াবহতা বুঝাবার জন্য।

"যখন (প্রাণীকুলের) কর্ণবিদারী মহানিনাদ উপস্থিত হবে।" (৮০ : ৩০)

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে (কর্ণবিদারী মহানাদে) মুর্ছিত হয়ে যাবে।" (৩৯ : ৬৮)
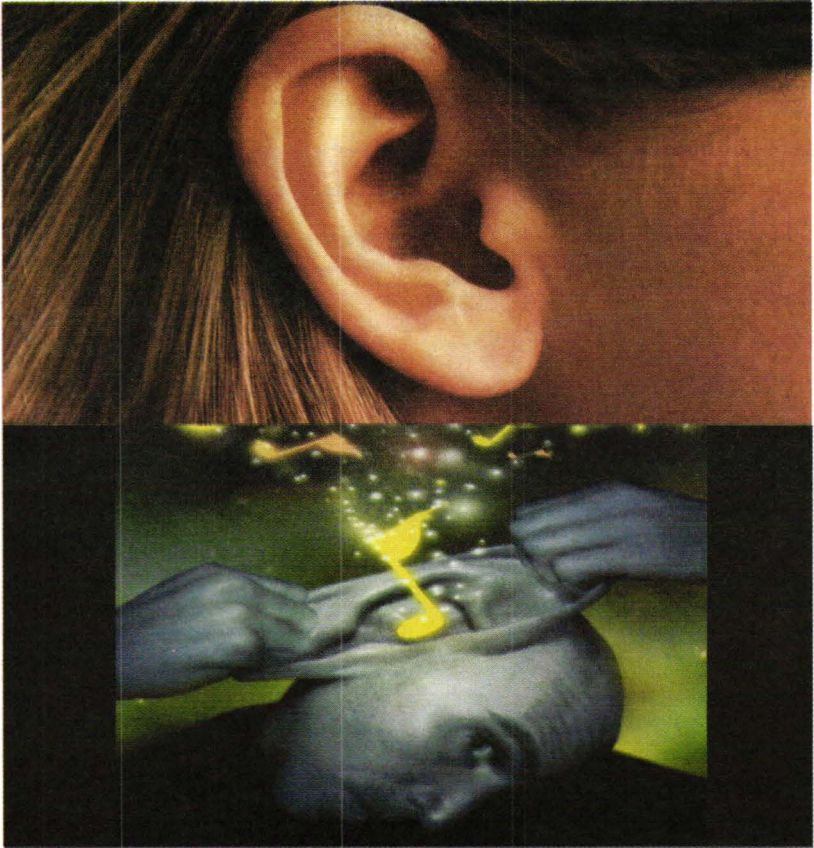
চিত্র-৯১

–'শিঙ্গা' যে আকৃতিতে তৈরী করা হয় তা অনেকটা মানব কানের আকৃতির মতোই দেখায়। উপরের ছবিতে ভালো করে তাকালে বিষয়টি বুঝতে পারা যাবে। এ আকৃতির সাথে বায়ু প্রবাহের গতিও উৎপন্ন শব্দের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'শিঙ্গা' বাতাসের গতি ও শব্দের তীব্রতা বহু-বহুগুণে বৃদ্ধি ঘটায়। আর আমাদের 'কান' বাইরের দিক থেকে আগত বাতাস ও শব্দের গতি এবং আওয়াযকে উচ্চ পর্যায় থেকে একেবারে নিম্নপর্যায়ে নিয়ে আসে। কিয়ামাতের দিন ধ্বংসের তাণ্ডবে বাতাসের গতি থাকবে সর্বোচ্চ আর প্রচণ্ড শব্দের উৎপত্তি ঘটবে বিধায় কুরআন 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারা ব্যবহার করেছে।

বিরাট ভগ্নাবশেষ সরাসরি পৃথিবীকে আঘাত করার কারণে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' এর মতো প্রবল মহাজাগতিক অগ্নি ঝড়ে পৃথিবী জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে। সূর্যের ধ্বংসের মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যে শব্দ হবে এবং তাতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে মহাজাগতিক বস্তুসমূহের প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসায় বায়ুমণ্ডল ফেটে গিয়ে মহাশূন্যে যে বিকট বিকট শব্দের সৃষ্টি হবে তাতে পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে যাবে। কারণ মহাজাগতিক ঐসব উচ্চগ্রামের শব্দ গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা প্রাণী জগতের নেই। এভাবে পৃথিবীর প্রাণ এক পর্যায়ে ধ্বংসের মাঝে হারিয়ে যাবে।

'ধূমকেতু' প্রতি বছর গড়ে ৫/৬ টি আমাদের সৌরজগতের প্রান্তসীমানা থেকে সূর্যের টানে ছুটে এসে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। এখন মহাজাগতিক কোন কারণে যদি কোন 'ধূমকেতু' পৃথিবীর একই তলে চলে আসে তাহলে, ঐ ধূমকেতু তার বিশাল প্রভাবসহ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের কারণে বায়ুমণ্ডল দ্রুত ফেটে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হবে এবং প্রবল ঝড়ো-তুফান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে ভয়ঙ্কর করে তুলবে, যা 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর মতোই মনে হবে। এর কয়েক মুহূর্ত পরে ধূমকেতু পৃথিবীর মাটিতে ভয়ঙ্কর রুদ্ররোষে যখন আছড়ে পড়বে তখন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ভয়াবহ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে এবং সাথে সাথে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটিয়ে পৃথিবীকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই-ভস্মে পরিণত করবে। সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণের চিরদিনের জন্য প্রস্থান ঘটবে।

'গ্রহাণু' সম্পর্কেও বিজ্ঞানীগণ মানব জাতিকে সাবধান-সতর্ক করেছেন। তারা বলেছেন মাত্র এক কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন একটি গ্রহাণুর আঘাতেও পৃথিবীর ধ্বংস সম্পন্ন হতে পারে। পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে পৃথিবীর চারপাশে মার্বেল আকৃতি থেকে শুরু করে প্রায় এক হাজার (১০০০) কিলোমিটার ব্যাসসহ অসংখ্য পাথরও ভেসে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে বড় আকৃতির প্রায় পাঁচ হাজার (৫০০০) 'গ্রহাণু' এমন নাজুক অবস্থায় পৃথিবীর

"শপথ আকাশের এবং আঘাতকারীর তুমি কি জান সেই আঘাতকারী বস্তুটি কি? ওটি একটি প্রজ্জ্বলমান জ্যোতিষ্ক" (৮৬ : ১-৩)

চিত্র-৯২

—সৌরজগতের বাইরে থেকে প্রতি বছরই প্রায় ৫/৬টি ধূমকেতু সৌরজগতে প্রবেশ করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। কখনো যদি কোন ধূমকেতু পৃথিবীর কক্ষপথে একই তলে এসে যায় তাহলে মুখোমুখী সংঘর্ষের কারণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন ধূমকেতু একেবারে নিকটবর্তী হয়ে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার আগ মুহূর্তে মহাশূন্য থেকে দেখা যাবে যেন 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর মতো ব্যাপক বিপর্যয় প্রবল বেগে ও প্রচণ্ড শব্দে পৃথিবীকে আঘাত করছে। ধ্বংসীয় অবস্থার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা প্রকাশের জন্যই 'শিঙ্গায় ফুৎকার' এই তথ্যটি পরিবেশিত হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু কোন প্রকার শিঙ্গার ব্যবস্থা কিয়ামাতের দিন রাখা হয়নি। যা মানব সমাজ কল্পনায় স্থান দিয়ে রেখেছে। 'শিঙ্গায় ফুৎকার' একটি আরবী 'বাগধারা' মাত্র যা ভয়াবহ তাকে প্রকাশ করছে।

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হবে।" (৭৭ : ৯)
"যখন আকাশের ছাদ (আবরণ ব্যাপক আকারে ধূমকেতু আগমনে) বিপর্যস্ত হবে।" (৮১ : ১১)
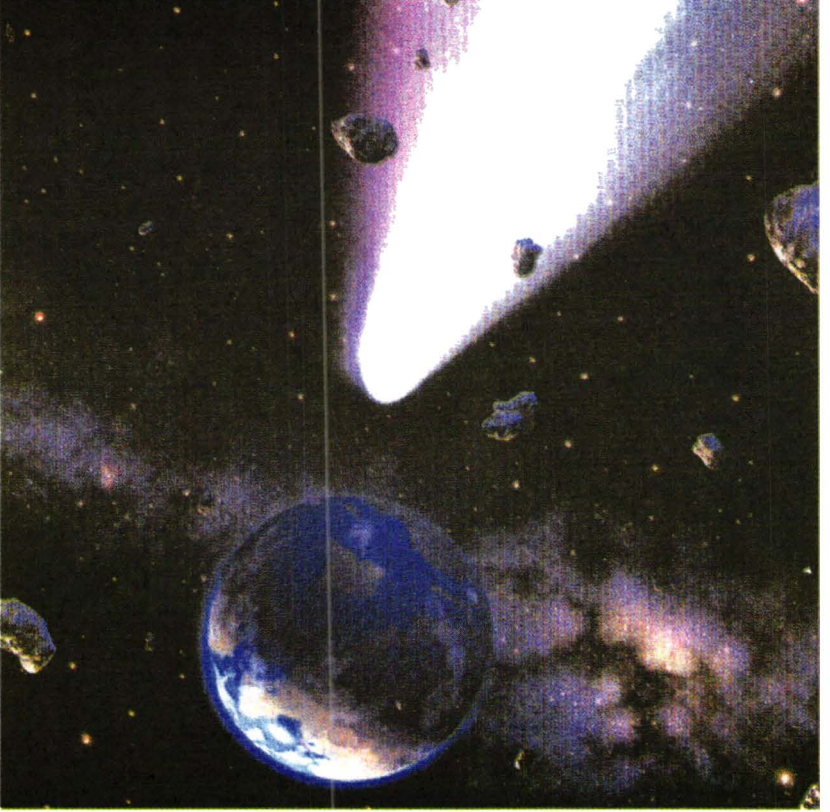
চিত্র-৯৩

—আমাদের সৌরজগতের বাইরের দিকে আছে পাথরময় 'কুইপার বেল্ট'। যেখানে আছে অসংখ্য-অগণিত ধূমকেতু। প্রতি বছর সেস্থান থেকে ৫/৬টি ধূমকেতু সৌরজগত প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। কিয়ামাতের দিন মহাজাগতিক কারণে কুইপার বেল্টের লক্ষ-কোটি ধূমকেতু স্থানচ্যুত হয়ে সৌরজগতে ব্যাপকভাবে হানা দেবে। ফলে পৃথিবীতেও আঘাত করবে লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু একই সাথে। এতে পৃথিবীর আকাশ প্রকম্পিত হবে তীব্র ধূলি-ঝড়ে ও বিরামহীন প্রচণ্ড শব্দে। পৃথিবী ধূমকেতুর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ও ছিন্ন-ভিন্ন— তুলা-তুলা হয়ে যাবে। পাহাড়সমূহ ধূলি-কণায় পরিণত হবে। দূর মহাকাশ থেকে দেখলে মনে হবে যেন বিশাল 'শিঙ্গায় ফুৎকার' করা হচ্ছে। এ কারণেই 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

"যখন গ্রহাণুসমূহ ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত আকারে স্থানচ্যুত হয়ে (পৃথিবীর আকাশে) হানা দেবে।" (৮২ : ২)
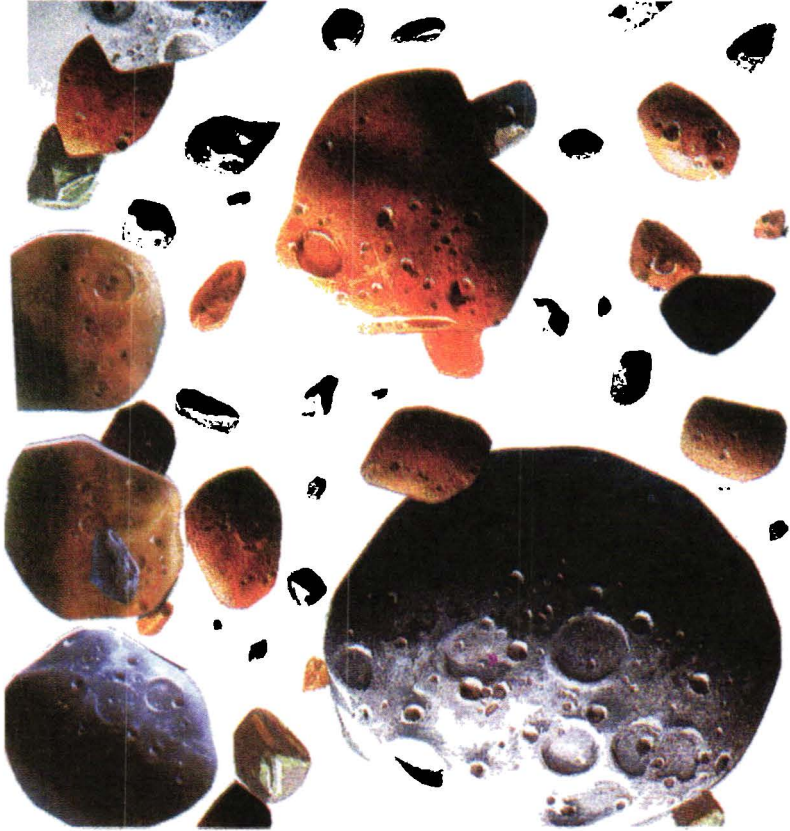
চিত্র-৯৪

–বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে পৃথিবীর চারপাশে সংলগ্ন মহাশূন্যে প্রায় পাঁচ হাজার (৫০০০) উড়ন্ত পাথর বা গ্রহাণুর সন্ধান লাভ করেছেন। এদের মধ্যে ছোট মার্বেল পাথর থেকে শুরু করে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন পাথর বা গ্রহাণুও বিরাজমান আছে। বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেছেন এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রহাণু বেশ নাজুক অবস্থায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। যে কোন সময় এদের এক বা একাধিক পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের কারণে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আছড়ে পড়তে পারে। আর যদি সত্যি তা-ই হয় তাহলে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশে পৌঁছামাত্র বায়ুমণ্ডলে বিকট শব্দের সৃষ্টি করবে, ব্যাপক অগ্নুৎপাত ঘটাবে এবং অগ্নিময় উত্তপ্ত বাতাসের ঝাপটায় সব পুড়িয়ে ছাই-ভস্ম করে দেবে, যা শিঙ্গায় ফুৎকারের মতই মনে হবে।

"তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর পাথরের ঝাঁক প্রেরণ করবেন? তখন তোমরা বুঝতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী।" (৬৭ : ১৭)
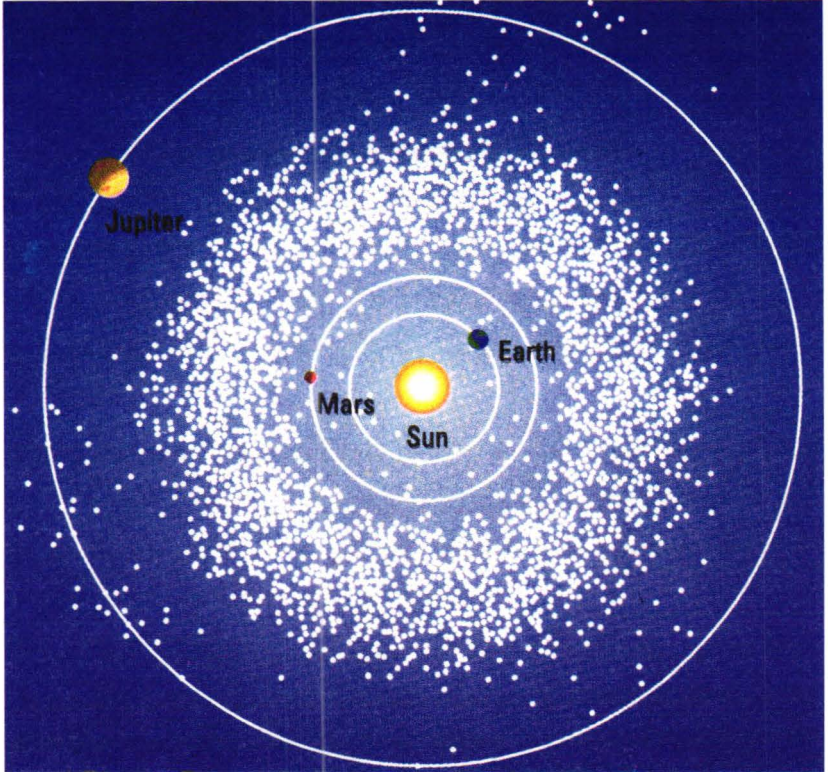
চিত্র-৯৫

–আকাশে অর্থাৎ সৌরজগতে পাথরের বহর বা ঝাঁক আছে মঙ্গলগ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী স্থানে। আছে শনি গ্রহের চারদিকেও বিশাল গ্রহাণু বেল্ট। এসকল স্থানে গ্রহাণুর সংখ্যা সঠিকভাবে গণনা করা কখনই সম্ভব হবে না। কিয়ামাতের সময় মহাজাগতিক নিয়মে উল্লেখিত গ্রহাণুসমূহ একযোগে স্থানচ্যুত হয়ে গ্রহসমূহকে আঘাত হানবে। ফলে পৃথিবীর আকাশে প্রবেশ করা মাত্র বিপুল গতিতে চলার কারণে প্রচণ্ড ভয়ানক শব্দের সৃষ্টি করবে এবং সমগ্র বায়ুমণ্ডলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অগ্নিময় ধোঁয়ার পরিবেশ তৈরী করবে। বিপর্যস্ত এই বায়ুমণ্ডল ভীষণ গতিতে ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটতে থাকবে। ভয়ঙ্কর এই দুর্যোগকে মহাশূন্য থেকে দেখলে 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর বাস্তব এ্যাকশান-ই মনে হবে। আল-কুরআন তাই এই বাগধারাটি ব্যবহার করেছে এক কঠিন অবস্থা বুঝাবার জন্যই।

চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে যে, যে কোন সময় পৃথিবীর দিকে প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসতে পারে। মহাজাগতিক কোনো কারণে যদি কখনও ঐ সকল পাথর খণ্ডের মধ্য থেকে মাত্র এক কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন 'গ্রহাণু' পৃথিবীর একই তলে চলে আসে তাহলে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা মাত্র প্রচণ্ড অগ্নুৎপাত সৃষ্টি করে বিকট শব্দে বায়ুমণ্ডলকে কাঁপিয়ে তুলবে এবং ব্যাপক ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করবে। যে কারণে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশ হয়ে উঠবে ধ্বংসোন্মুখ, পরক্ষণে গ্রহাণুটি যখন প্রচণ্ডবেগে পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানবে ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে, তখন সাথে সাথে সর্বত্র ব্যাপক আকারে ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, ঝড়-তুফান ও প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের অবস্থা তখন 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর মতোই ভয়াবহ মনে হবে। সেই মহাবিপর্যয়ে পৃথিবীর সকল কিছুই ধ্বংসের মাঝে হারিয়ে যাবে।

'সুপার নোভা বিস্ফোরণ' ও পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হতে পারে বলে বিজ্ঞানীগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন আমাদের সূর্য ছাড়াও নিকটবর্তী অন্যান্য নক্ষত্রের কোন একটিও যদি তাদের অন্তিম মুহূর্তে বিস্ফারিত হয়ে তার ভেতরকার অসংখ্য মৌলিক পদার্থ, ধূলা-বালি, অগ্নি ও তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীর দিকে নিক্ষিপ্ত করে, তাহলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০,০০০ মাইল থেকে ২০,০০০ মাইল গতিবেগে ঐ সকল নিক্ষিপ্ত ধ্বংসীয় ক্ষতিকর বস্তুসমূহ (Super nova ramnent) প্রবলবেগে প্রচণ্ড শব্দে ধাবিত হয়ে পৃথিবীকে আঘাত করবে এবং পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলবে। এর ফলে প্রচণ্ড চাপে ও তাপে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মুহূর্তের মধ্যেই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে এবং প্রচণ্ড তাপে পৃথিবী পৃষ্ঠ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চিরতরে পৃথিবী থেকে জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণের সকল প্রকার স্পন্দন। সৌরজগতের বাইরে থেকে ঐ দৃশ্য দেখলে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' এর মতোই ভয়ঙ্কররূপে দেখা যাবে।

বিজ্ঞানবিশ্ব এ ব্যাপারে একমত যে, অন্যান্য কারণের মতো 'ব্লাক হোল' (Black hole) ও পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হতে পারে, যদি কোনো 'ব্লাক

"যখন নক্ষত্রসমূহ (ধ্বংস হয়ে) তাদের আলো নির্বাপিত হয়ে যাবে। (৭৭ : ৮)
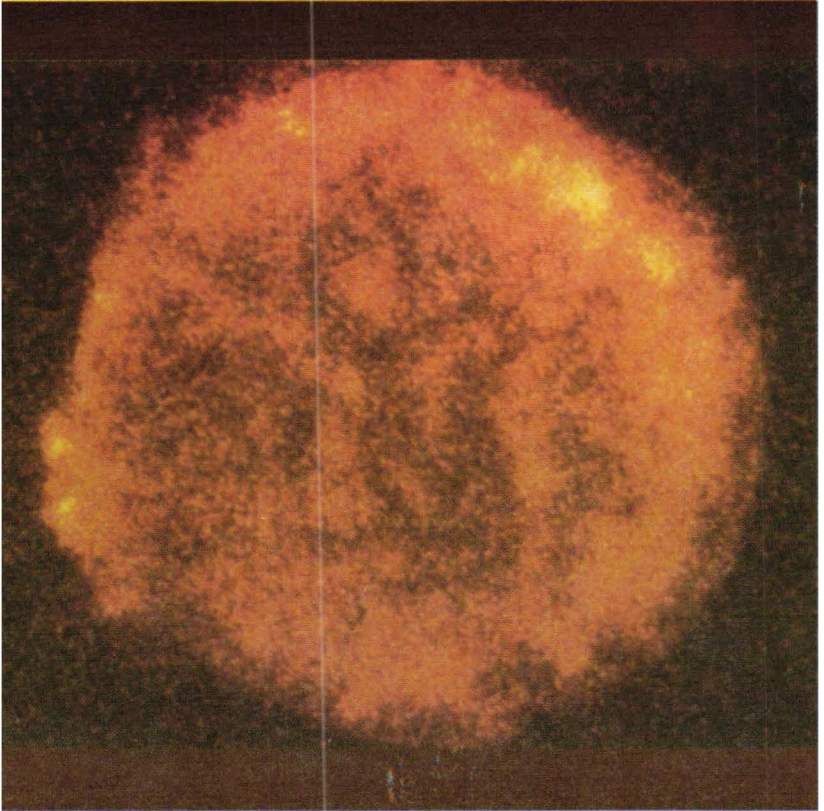
চিত্র-৯৬

—আমাদের সৌরজগতের নিকটবর্তী অন্য কোন নক্ষত্রও যদি সুপার নোভা বিস্ফোরণ ঘটায় এবং তার ভেতরকার মৌলিক পদার্থ, ধূলা-বালি, অগ্নি, তেজস্ক্রিয়তা, কসমিক-রে, ইত্যাদি পৃথিবীর দিকে নিক্ষিপ্ত করে, তাহলে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১০,০০০ মাইল থেকে ২০,০০০ মাইল গতিবেগে ঐ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত ক্ষতিকর বস্তুসমূহ প্রবলবেগে ও প্রচণ্ড শব্দে ছুটে গিয়ে পৃথিবীকে আঘাত করবে ও তার ধ্বংস সাধন ঘটাবে। ভয়ঙ্কর এক ধ্বংসীয় প্রলয়ে নিশ্চিহ্ন হবে প্রাণময় আমাদের এ সুন্দর পৃথিবী। দূর আকাশ থেকে দেখলে মনে হবে যেন 'শিঙ্গায় ফুৎকার' দিয়ে এ মহাপ্রলয় ঘটানো হয়েছে। সুতরাং কুরআনে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটিতে ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে। এতে কিয়ামাতের ভয়াবহতা মানুষ কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে।

"সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ– ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে বিপর্যস্ত হবে।"
(৬৯ : ১৬)

চিত্র-৯৭

–উপরের ছবিতে একটি যুদ্ধ বিমানকে প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্ট করে এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। বাস্তবে যখন এ ঘটনা আমরা সরাসরি পর্যবেক্ষণ করি তখন দেখতে পাই বিমানটি খুবই দ্রুতগতিতে প্রস্থান করছে আবার সাথে সাথে শক ওয়েব-এর মাধ্যমে বিকট শব্দেরও সৃষ্টি করছে। যা কানের পর্দা ফাটানোর মতো বেগতিক অবস্থা। এটিতো একটি মাত্র বিমানের কারণে পৃথিবীর আকাশে সৃষ্টি হওয়া কঠিন অবস্থা, অথচ কিয়ামাতের সময় লক্ষ-কোটি ধূমকেতু, গ্রহাণুসহ ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুসমূহ সমগ্র আকাশ জুড়ে একইভাবে শব্দ ও গতিবেগসহ পৃথিবীকে আঘাত করতে থাকবে তখন যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে তাকে যথাযথভাবে বোধগম্য হয় এমনভাবে বলতে গিয়েই আরবী বাগধারা 'শিঙ্গায় ফুৎকার' ব্যবহার করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী। সুবহানাল্লাহ।

"আমি শপথ করছি নক্ষত্র ধ্বংস স্থানের অবশ্যই এটা এক মহাশপথ যদি তোমরা বুঝতে পারতে?" (৫৬ : ৭৫, ৭৬)
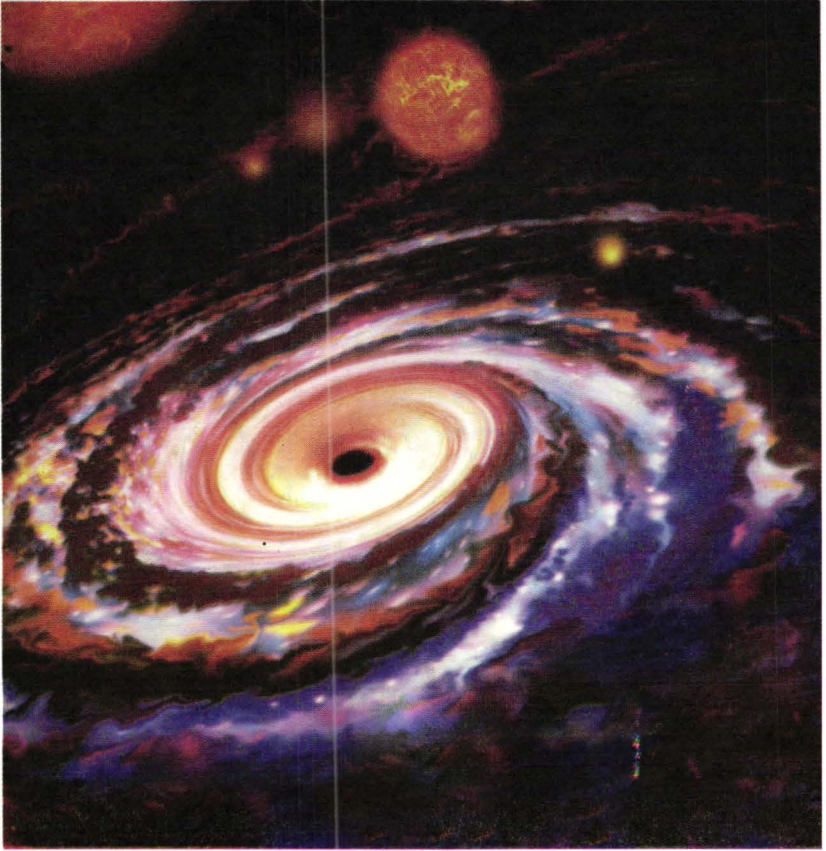
চিত্র-৯৮

–বিজ্ঞানের ভাষ্যমতে 'Block hole' ও পৃথিবীর কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। তাই কোন কারণে যদি কখনো পৃথিবী ব্ল্যাক হোলের আওতায় পড়ে যায় তাহলে সেই ব্ল্যাক হোলের রাক্ষসী, প্রচণ্ড টানে ভূ-পৃষ্ঠের গাছ-পালা, তরু-লতা, ঘর-বাড়ি সমস্ত কিছুই টেনে-ছিড়ে ছিন্ন-ভিন্ন করে গলাধকরণ করতে থাকবে। অপরদিকে পৃথিবীর বাইরের পরিবেশ থেকে উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূলা-বালি যা আওতায় পাওয়া যাবে তাকেই প্রবল টানে গ্রাস করতে চাইবে, ফলে সমস্ত কিছুই তখন হুমড়ি খেয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়বে প্রচণ্ড শব্দে অতঃপর Block hole-এ পড়বে। মহাশূন্য থেকে তখন তাকাতে পারলে দেখা যাবে 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর প্রতিক্রিয়া যেন কাজ করছে।

"মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" (১০ : ১০১)
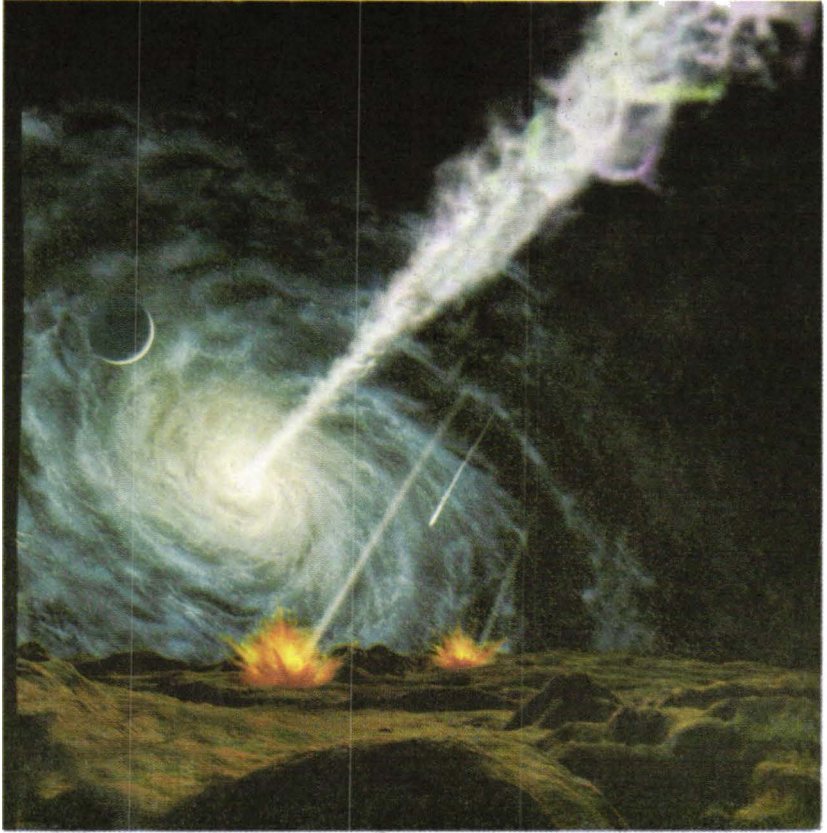
চিত্র-৯৯

– Block hole- অর্থ অন্ধকার কূপ। যেহেতু ঐ কূপে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটে তা সরাসরি দেখা যায় না। তাই তাকে ব্ল্যাক হোল বলা হয়। বস্তুসমূহ যখন টুকরো টুকরো ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ব্ল্যাক হোলে প্রবেশ করে তখন বাস্তবে কিন্তু প্রচণ্ড এক ঘূর্ণির স্রোতে গিয়ে মিশে যায়। ফলে যে কোন বস্তুই তখন তার বস্তুগত গঠনে আর টিকে থাকতে পারে না। তখন সমস্ত কিছুই তাদের মৌলিক গঠন উপাদান আলোর কণা 'ফোটন' (Photon)-এ রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই দশা ঘটে আভ্যন্তরীণ প্রচণ্ড ঘূর্ণির মহাসঙ্কোচনে পতিত হওয়ার কারণে। সাধারণত মহাকাশে ব্ল্যাক হোল দেখা যায় না। কিন্তু বস্তু আলোতে রূপান্তরিত হওয়ায় ঐ 'আলোর বীম' (Light beam) দেখেই সনাক্ত করা হয় 'Block hole' কে। যাই হোক এক্ষেত্রেও শিঙ্গায় ফুৎকার-এর ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া ভেসে উঠে।

হোলে'র আওতায় পৃথিবী কখনো এসে যায়। ইতোমধ্যেই পৃথিবীর অনেকটা নিকটেই প্রায় মাত্র ১৫০০ আলোকবর্ষ দূরত্বেই 'ব্ল্যাক হোল' আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন কোন কারণে যদি পৃথিবী সেই 'ব্ল্যাক হোলে'র আওতায় চলে যায়, তাহলে দেখা যাবে শুধু পৃথিবীই নয় আশ-পাশের উপগ্রহসহ সকল কিছুকে প্রচণ্ড টানে ছিন্ন-ভিন্ন করে গ্রাস করে গিলে খাচ্ছে প্রচণ্ড রাক্ষসী 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole)। ফলে পৃথিবীর বাইরের পরিবেশ থেকে ছিন্ন-ভিন্ন ও টুকরো-টুকরো হওয়া মহাজাগতিক বস্তুদের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ ও ধূলা-বালিসহ অগণিত বস্তু পৃথিবীকে আঘাত করবে প্রচণ্ড শব্দ ও গতিতে। ব্ল্যাক হোলের রাক্ষসী টানে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকেও ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, পশু-পাখি, ধূলা-বালিসহ সবকিছুই ছুটে গিয়ে প্রবলবেগে ব্ল্যাক হোলে পড়তে থাকবে। আর সাথে সাথে প্রচণ্ড ঘনায়নে তাদের আকৃতির বিলুপ্তি ঘটিয়ে আলোতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। উল্লিখিত বর্ণনানু-যায়ী পৃথিবীর কিয়ামাত সংঘটিত হলে দূর থেকে দেখতে ভয়ঙ্কর কাল্পনিক দৃশ্য 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটির মতোই ভয়াবহ মনে হবে। প্রকৃতপক্ষে ঘটবেও তাই।

অতি সম্প্রতি মহাকাশে পর্যবেক্ষণ চালাতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ দুটি নক্ষত্রের মাঝে সংঘর্ষের কারণে যে মহাধ্বংসলীলা ঐ দুটি নক্ষত্রের স্থানীয় পরিবেশে ঘটে চলেছে, তার বাস্তব ছবি সরাসরি ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। এতে বিজ্ঞানীগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদি আমাদের সূর্যের সাথে নিকটবর্তী নক্ষত্রের মহাজাগতিক কারণে কখনো সংঘর্ষ লেগে যায় তাহলে উভয় নক্ষত্রের সৌরপরিবার দু'টি সংঘর্ষের তাণ্ডবে বিকট শব্দের সৃষ্টি করে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হবে। গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রসহ সমস্ত কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ধূলা-বালিতে, প্রচণ্ড অগ্নিতে, ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয়তাসম্পন্ন আলোতে রূপান্তরিত হবে এবং প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি করবে। 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বলতে যে মহাবিপর্যয় প্রকাশ পায় তখন পরিস্থিতি অনুরূপই ঘটবে। ফলে জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণের চিহ্ন পৃথিবীর কোথাও আর অবশিষ্ট থাকবে না।

(ক) "মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" (১০ঃ১০১)
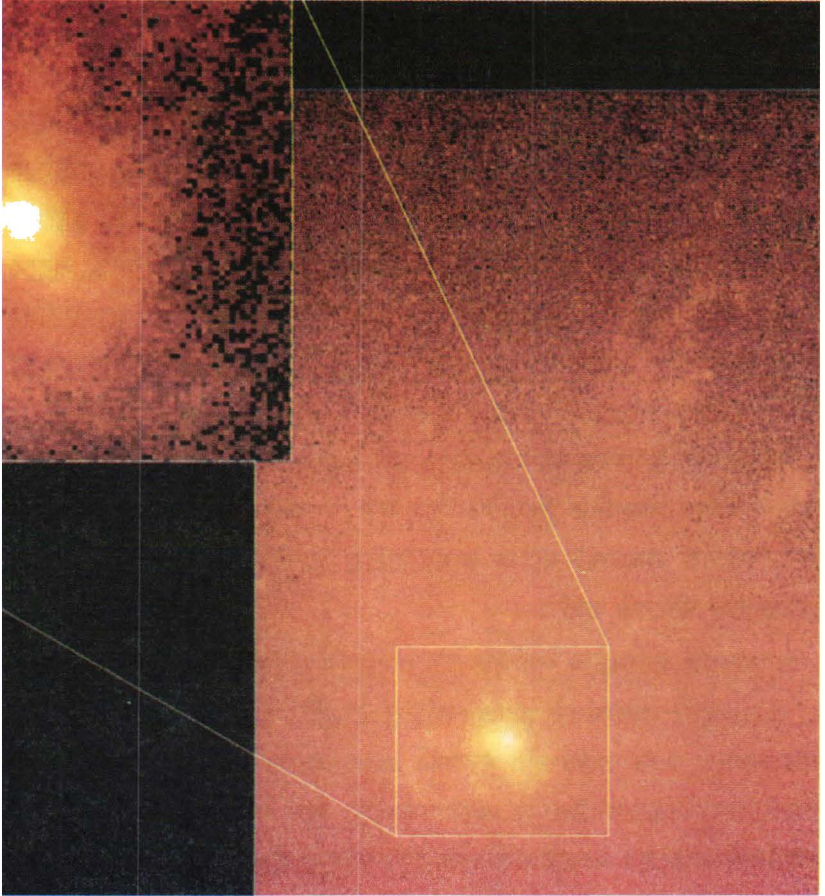
চিত্র-১০০ (ক)

– অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সির কেন্দ্রে বিশাল বিশাল 'ব্ল্যাক হোল' আবিষ্কার করেছেন। এ জাতীয় ব্ল্যাক হোলগুলো কেন্দ্রে অবস্থান করে অগণিত অসংখ্য নক্ষত্র ও তাদের সৌরপরিবারকে গলাধঃকরণ করে করে বৃহদাকৃতি ধারণ করেছে। একই সাথে অনেক নক্ষত্রকে ভক্ষণ করতে গিয়ে ব্ল্যাক হোলের চতুর্পার্শ্বে যে ভয়ঙ্কর শব্দ ও বস্তু এবং বায়ুপ্রবাহের প্রবল স্রোত সৃষ্টি হয়, তা শিঙ্গায় ফুৎকার-এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট পরিস্থিতির সাথেই কেবল তুলনা হতে পারে। তাই কিয়ামাত সম্পর্কে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাক্যটির ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে।

(খ) :"যাদের চক্ষু ছিলো অন্ধ আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিলো অক্ষম।" (১৮ ঃ ১০১)
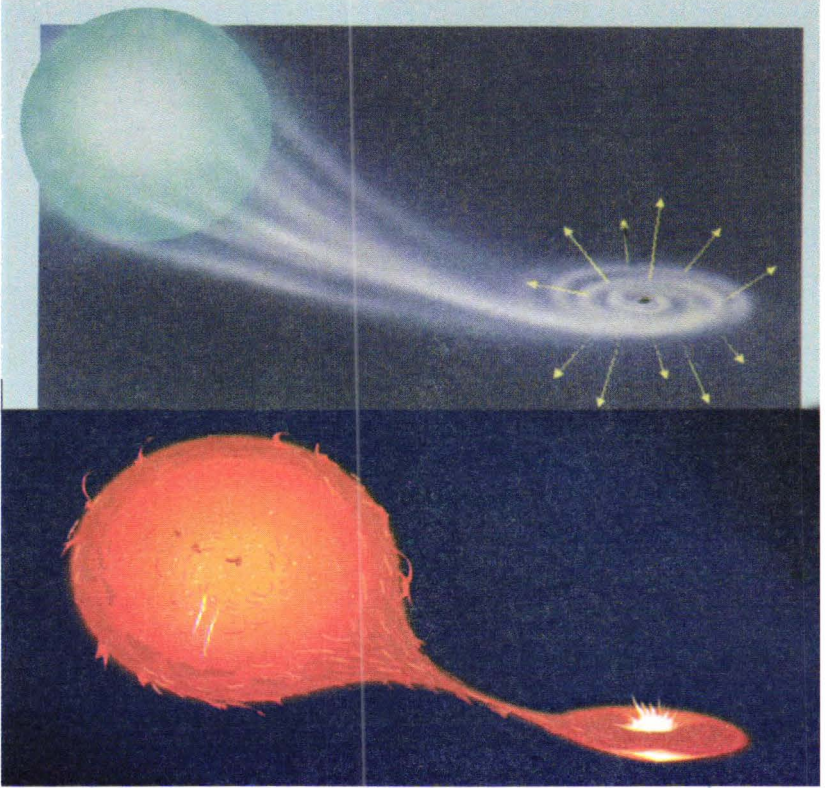
চিত্র-১০০ (খ)

উপরের ছবিতে একটি 'ব্ল্যাক হোল' (Black hole) তার নিকটবর্তী মহাশূন্যে একটি নক্ষত্রকে কিভাবে টেনে-হিচড়ে, ছিঁড়ে ফেলে প্রবল গতিতে টেনে নিয়ে গলাধঃকরণ করছে, তা দেখা যাচ্ছে। এভাবে ব্ল্যাক হোল একই সাথে চতুর্দিক হতে অসংখ্য বস্তুকে একইভাবে টেনে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে থাকে। এতে প্রচণ্ড শব্দ ও প্রবল গতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিয়ামাতের দিন এ জাতীয় বিপর্যয়ও ঘটবে বিধায় স্বল্প কথায় অধিক ভয়াবহতা বুঝাবার জন্যই 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে আল্লাহ সর্বশক্তিমান এক ও একক সত্তা, যিনি যখন যা চান তাই করেন। তিনি কিয়ামাতের ব্যবস্থা এক কঠিন ও রূঢ় পদ্ধতির ভেতর দিয়ে ঘটাবেন বিধায় ঐ কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়াকে যথাযথভাবে বুঝাবার জন্যই 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটি ব্যবহার করেছেন।

"আল্লাহ্ মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু বলেন 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়।" (২ ঃ ১১৭)
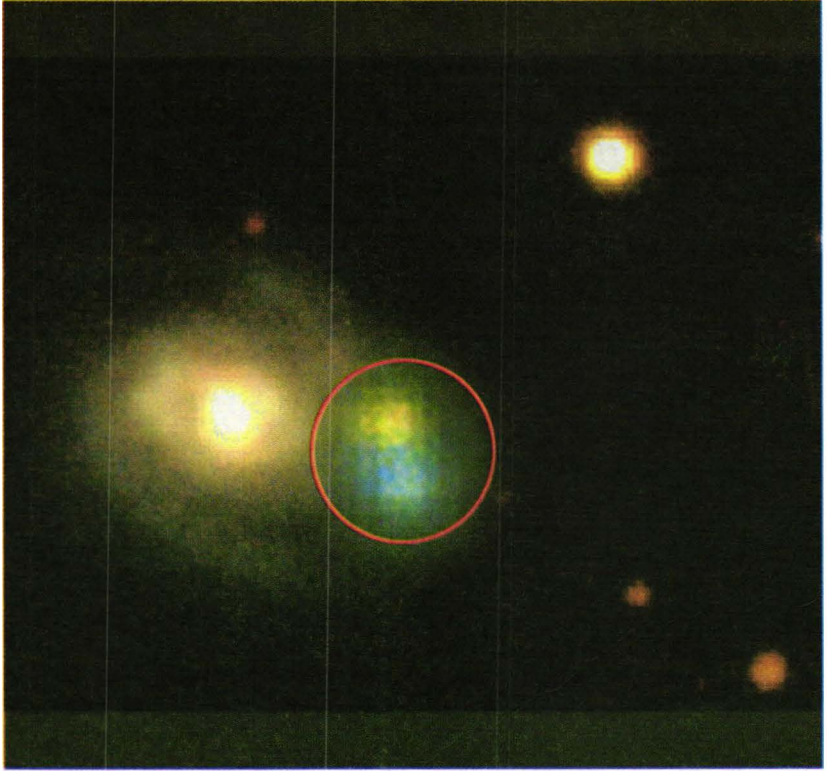
চিত্র-১০১

– মহাবিশ্বের মহাকাশে বিজ্ঞানীগণ অতি সম্প্রতি আরো একটি নতুন আবিষ্কার সংযোজন করেছেন, যা প্রচুর আগ্রহের জন্ম দিয়েছে বিস্তারিত জানার জন্য। তাঁরা দু'টি নক্ষত্রের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষ অবলোকন করে তার ছবি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করেছেন, এতে দেখা যাচ্ছে– দু'টি নক্ষত্রের মুখোমুখী সংঘর্ষের ফলে তাদের সম্পূর্ণ দেহসহ পারিপার্শ্বিক সকল গ্রহ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। এতে সেখানে যেমন সৃষ্টি হয়েছে বিকট বিকট শব্দ তেমনি সৃষ্টি হয়েছে অগ্নি, তেজস্ক্রিয় (Radiation), মহাজাগতিক ধূলা-বালি (Cosmic dust), নক্ষত্রের অগ্নিময় ভগ্নাংশ ইত্যাদি, যা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০,০০০ মাইল প্রচণ্ড গতিবেগে চতুর্দিকে ছুটে যাচ্ছে। উক্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটির ব্যবহার যথার্থ হবে।

পৃথিবীর কিয়ামাত বা মহাপ্রলয়ের ব্যাপারে একাধিক গ্যালাক্সির মাঝে সংঘর্ষও একটি কারণ হতে পারে বলে বিজ্ঞানবিশ্ব বিশ্বাস করে। কেননা একাধিক গ্যালাক্সির মাঝে সংঘর্ষ মহাজাগতিক নিয়মে মহাকাশে একটি নিয়মিত ঘটনা। অনেক সংঘর্ষের ঘটনা ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছে। টেলিস্কোপ (Telescope) এর সাহায্যে মহাকাশে বিজ্ঞানীগণ একাধিক গ্যালাক্সির মাঝে সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন তাদের ভেতরে কল্পনাতীত ধ্বংসলীলা ঘটে চলেছে। সংঘর্ষে লিপ্ত সংশ্লিষ্ট গ্যালাক্সিদের আয়ত্তাধীন লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাপী এলাকায় কোন কিছুর অস্তিত্বই কল্পনা করা যাচ্ছে না। একেকটি গ্যালাক্সিতে বর্তমানে গড়ে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র অন্য গ্যালাক্সির সমপরিমাণ নক্ষত্র ও তাদের পরিবারের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কারণে যে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে, তাকে ব্যাখ্যা করার মতো ভাষা মানব জাতির জানা নেই। একযোগে কোটি কোটি 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর চেয়েও বিকট শব্দ ও প্রবল মহাজাগতিক ঝড়ের তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হচ্ছে সেখানে প্রতি মুহূর্তে। তাই আমাদের মাতৃ গ্যালাক্সির অর্থাৎ 'মিলকি-ওয়ে' গ্যালাক্সির সাথে যদি পার্শ্ববর্তী গ্যালাক্সি 'এন্ড্রোমিডা' (Andromida)-র সাথে কখনও সংঘর্ষ লেগে যায় তাহলে পৃথিবীও অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুদের সাথে স্বল্প সময়ে বিপর্যস্ত হয়ে ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাবে।

আমাদের এ পৃথিবীর কিয়ামাত বা মহাধ্বংসের ব্যাপারে বিজ্ঞান যে ৮টি পদ্ধতিকে বাস্তবতার নিরিখে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, তার মধ্যে সর্বশেষ পদ্ধতিটি হচ্ছে– গ্যালাক্সি ক্রমান্বয়ে গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে উড়ে চলার সময় সঙ্কুচিত হয়ে বিন্দুতে (Singularity) গমন।

আমাদের গ্যালাক্সিটি বর্তমানে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার গতিতে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র পরিবার, বিশাল পরিমাণে নেবুলা, অগণিত ব্লাকহোল, সুপার নোভা, গ্রহাণু, ধূমকেতু, ইত্যাদি সাথে নিয়ে মহাশূন্যে উড়ে যাচ্ছে। প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পথ অতিক্রম করার সাথে সাথে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৫ কিলোমিটার হারে গতির বৃদ্ধি ঘটছে। এভাবে গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে গ্যালাক্সিটি মহাকাশে এগিয়ে যেতে থাকায়

"ওরা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না, কিয়ামাতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে এবং মহাবিশ্ব থাকবে তাঁর করায়ত্ত।" (৩৯ ঃ ৬৭)

চিত্র-১০২)

–Telescope-এর সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ মহাকাশে গ্যালাক্সিদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন তাদের ভেতর কল্পনাতীত ধ্বংসলীলা সংঘটিত হচ্ছে। এতে সংঘর্ষে লিপ্ত গ্যালাক্সিদের আয়ত্তাধীন লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাপী এলাকায় ভয়াবহ তাণ্ডবে কোনো কিছুর অস্তিত্বই কল্পনা করা যাচ্ছে না। মূল সংঘর্ষের এলাকায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুসমূহ (ramnent), উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, তেজস্ক্রিয়তা, গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কাসহ ইত্যাদি প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ৫০,০০০ মাইল গতিতে ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় চতুর্দিকে কেবলই ছুটে যাচ্ছে। এ এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে মহাশূন্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে, যার সাথে তুলনা করার মতো কোন ভাষা মানুষের জানা নেই। শুধুমাত্র আরবী বাগধারা 'শিঙ্গায় ফুৎকার' ব্যবহার করে যার যৎসামান্য জ্ঞানই মানব জাতিকে প্রদান করা হয়েছে।

"শপথ তাদের, যারা নির্মমভাবে ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায় (মহাবিশ্বব্যাপী আল্লাহ্‌র আদেশে)।"
(৭৯ : ১)

চিত্র-১০৩

– আমাদের এ মহাবিশ্বের মাঝে কোন প্রকার মহাধ্বংস বলতে যদি কিছু বুঝায় তাহলে একাধিক গ্যালাক্সির মাঝে সংঘটিত দুর্ঘটনাই হবে একমাত্র মহাধ্বংস, যার সাথে আর কোন ধ্বংসের কোনো তুলনাই হতে পারে না। একটি গ্যালাক্সি গড়ে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাপী মহাশূন্যে স্থান দখল করে পরিভ্রমণ করছে। এ অবস্থায় একাধিক গ্যালাক্সি যখন একযোগে পারস্পরিক সংঘর্ষে জড়ায়ে পড়ে তখন তাদের আভ্যন্তরীণ গড় নক্ষত্র প্রায় ৪০,০০০ কোটি (প্রতিটিতে) করে কি বিপুল সংখ্যক নক্ষত্রই না ধ্বংসীয় তাণ্ডবে অংশগ্রহণ করে ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করছে মহাকাশে, ভাবতে গেলে জ্ঞানের চাকা স্থির হয়ে যায়। কিয়ামাতের দিন এ জাতীয় মহাদুর্যোগের কথা বর্ণনা করতে কুরআন 'শিঙ্গায় ফুৎকার' তথা ভয়ঙ্কর মহাধ্বংসের আভাস দিয়েছে। সুতরাং বলা যায় উক্ত বাগধারাটির ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে।

গতির বৃদ্ধির সাথে সাথে গতিমুখের বিপরীতে চাপ বৃদ্ধির কারণে গ্যালাক্সিটির মূল আকৃতিও চাপের কারণে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। গ্যালাক্সির উড়ার গতি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রচণ্ড চাপে কিন্তু প্রথমে প্রান্তঃদেশের নক্ষত্র ও তাদের পরিবার কিয়ামাতের বিপর্যয়ে পতিত হতে শুরু করবে। ফলে ঐ সৌরপরিবারগুলো চাপের মুখে কক্ষচ্যুত হয়ে পারস্পরিক সংঘর্ষে ভেঙ্গে-চুরে গ্যালাক্সির ভেতরের দিকে প্রচণ্ড শব্দে প্রবলবেগে ধাবিত হতে থাকবে। এতে পর্যায়ক্রমে ভেতরের দিকের নক্ষত্র পরিবারগুলোর সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর মহাধ্বংস ডেকে আনবে। মূল গ্যালাক্সির গতি এভাবে যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকবে, ততোই অধিক থেকে অধিক সংখ্যক নক্ষত্র পরিবার চাপের কারণে অন্যান্য নক্ষত্র পরিবারের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে। যার কারণে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' এর মতো বিকট বিকট শব্দ ও প্রবলবেগে মহাবিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে বিরামহীনভাবে চলতে থাকায় গ্যালাক্সি ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হতে থাকবে এবং প্রবল উড়ন্ত গতির কারণে গতি মুখের বিপরীত প্রচণ্ড চাপে সঙ্কুচিতও হতে থাকবে। ফলে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র ও তাদের পরিবার এক এক করে কিয়ামাতের ধ্বংসীয় তাণ্ডবে বিলীন হয়ে যাবে এবং এক পর্যায়ে প্রচণ্ড চাপে সমগ্র গ্যালাক্সিটির সমস্ত বস্তুভর (mass) সঙ্কুচিত হয়ে একক একটি মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity)-তে প্রবেশ করবে।

অবশ্য পরবর্তীতে বিন্দুটি চাপে ও তাপে নিজকে ধরে রাখতে না পেরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নতুন নতুন জগৎ তৈরী করতে থাকবে।

সুতরাং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহসহ মহাজাগতিক বস্তুদের ধ্বংস বা বিপর্যয় ঘটার মুহূর্তে বিভিন্ন কারণে যে মহাপ্রলয় সংঘটিত হচ্ছে বা হবে, তাতে বিপর্যয় উৎপত্তি হওয়ার সময়, প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ার সময়, প্রচণ্ড আঘাত হানার সময় ও পারস্পরিক সংঘর্ষ চলার সময় যে ভয়ঙ্কর রুদ্ররোষসম্পন্ন শব্দ ও প্রচণ্ড গতিবেগের সৃষ্টি হয় তা 'শিঙ্গায় ফুৎকার' এর সময় সৃষ্ট শব্দ ও বাতাস প্রবাহিত হওয়ার মতোই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। উল্লিখিত মহাদুর্যোগ ও প্রলয়ঙ্কারী ধ্বংসলীলা প্রকাশের

"আমি (আল্লাহ্) আকাশে সৃষ্টি করেছি গ্যালাক্সিসমূহ এবং তাদের করেছি সুশোভিত দর্শকদের (প্রকৃত গবেষকদের) জন্য।" (১৫ ঃ ১৬)
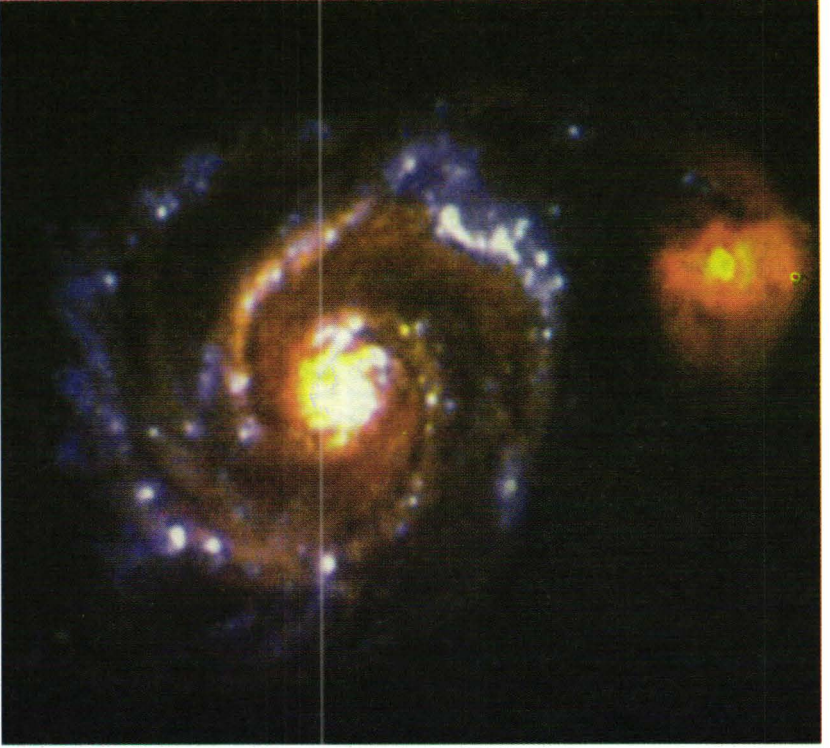
চিত্র-১০৪

– আমাদের এ মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সংগঠন হচ্ছে– 'গ্যালাক্সি'। একটি গ্যালাক্সিতে গড়ে প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র বিদ্যমান থাকে। সাথে নক্ষত্রের গ্রহ-ব্যবস্থা, নেবুলা ও অন্যান্য আরো অনেক মহাজাগতিক বস্তুও থাকে। এ সমস্ত কিছুকে সাথে নিয়ে মহাবিশ্বের মহাকাশে গ্যালাক্সিগুলো পরিভ্রমণেরত আছে। উড়তে গিয়ে গ্যালাক্সিগুলোর গতি একদিকে যেমন প্রতি সেকেণ্ডেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি গতিমুখের বিপরীতে প্রবলভাবে চাপ পড়ায় গ্যালাক্সির মূল আকৃতি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ভেতরের দিকে সর্বক্ষণ চাপ দিতে থাকে। ফলে গ্যালাক্সি চাকতির প্রান্তদিকের নক্ষত্রও তাদের গ্রহ-ব্যবস্থাসহ কক্ষচ্যুত হয়ে ভেঙ্গে-চুরে কিয়ামাতের মধ্যে পর্যায়ক্রমেপ্রবেশ করতে থাকে। এভাবে গ্যালাক্সিতে কিয়ামাত প্রান্তদিক হতে ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আর তখন ঐ এলাকাগুলোতে পূর্বে বর্ণিত 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর কার্যকারিতা প্রদর্শিত হতে থাকে।

"শপথ করছি গ্যালাক্সিসমূহের যারা পশ্চাদগমণেরত এবং যারা ভেসে বেড়ায় ও অদৃশ্য হয়ে যায়।" (৮১ ঃ ৫, ৬)
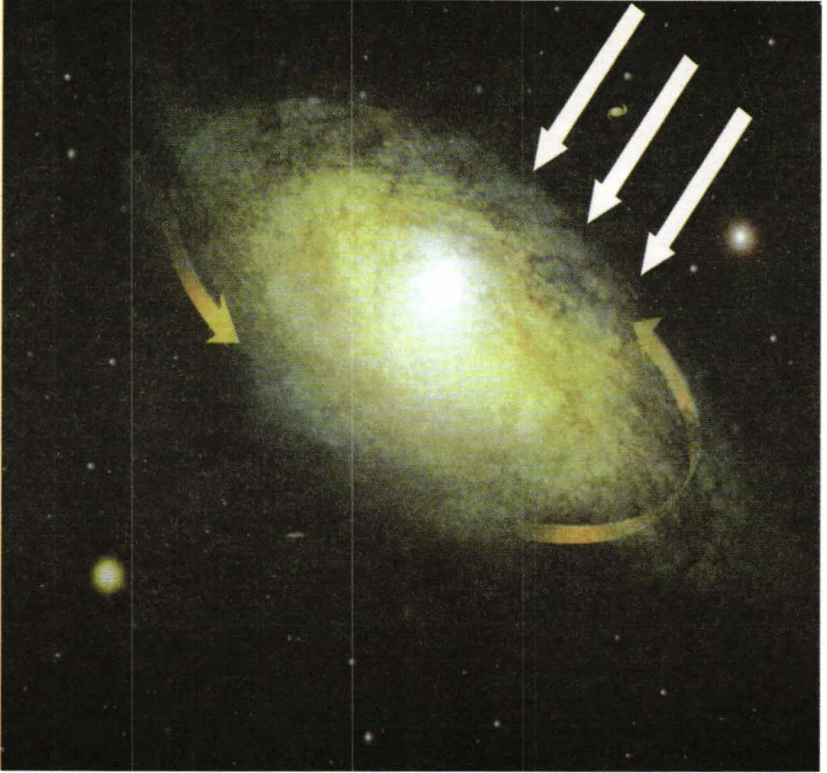
চিত্র-১০৫

– গ্যালাক্সি উড়তে গিয়ে যখনই গতিবেগের বিপরীতে চাপে সঙ্কুচিত হতে শুরু করে তখন প্রথম প্রান্তদের জগতগুলোতেই কিয়ামাত আঘাত হানতে শুরু করে। তখন প্রান্তদের নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু, উল্কা ইত্যাদি সবাই পর্যায়ক্রমে কক্ষচ্যুত হয়ে এলোমেলোভাবে ভেতরের দিকে ছুটতে থাকে এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংস হতে থাকে। এ অবস্থায় গ্যালাক্সির গতিবেগ যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততোই তার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা চাকতির ভেতরে চতুর্দিক হতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ফলে গ্যালাক্সি এক পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে মহাসূক্ষ্ম একটি বিন্দুতে উপনীত হয়। অবশ্য এজন্য আলোর গতিবেগে তখন উড়তে থাকে গ্যালাক্সি। উল্লিখিত মহাধ্বংসকে বুঝাবার জন্যই 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটি কুরআনে ব্যবহার হয়েছে।

"সেদিন আকাশকে গুটায়ে ফেলবো যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর।" (২১ ঃ ১০৪)

চিত্র-১০৬

– উপরের ছবিতে প্রায় চৌদ্দশত কোটি আলোকবর্ষ (১৪০০০,০০০,০০০ light years) দূরের অর্থাৎ মহাবিশ্বের প্রান্তসীমার দিকে ভাসমান ও চলমান গ্যালাক্সিসমূহ দেখা যাচ্ছে। ঐ দূরত্বে গ্যালাক্সিগুলো প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে ছুটে যেতে থাকায় গতিমুখের বিপরীতে প্রচণ্ড বাধার কারণে মূল আকৃতি ছোট হতে হতে বর্তমান ক্ষুদ্র পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরই মধ্যে গ্যালাক্সিগুলোর প্রান্তসীমানা হতে ভেতরের দিকে অগণিত জগৎ কিয়ামাতের নির্মম আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকবে। আরও কিছু দূর এগুবার পথে গ্যালাক্সিগুলো কঠিন চাপে আরো ক্ষুদ্র হয়ে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হয়ে সমগ্র গ্যালাক্সির অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করবে। বর্ণিত অবস্থায় পৌঁছুতে গ্যালাক্সিগুলোতে অবশ্যই 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক 'বাগধারাটি' ব্যাপকভাবে কার্যকর হয়ে থাকবে, নতুবা প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত গ্যালাক্সি সঙ্কুচিত হয়ে কিভাবে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) প্রবেশ করছে? সত্যিই এক ও একক স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ মহান, মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, সুব্হানাল্লাহ্।

জন্য 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটি এক্ষেত্রে অর্থাৎ আল-কুরআনে' ব্যবহার সঠিক ও যথোপযুক্ত হয়েছে। নতুবা কিয়ামাত তথা মহাজাগতিক মহাধ্বংস বা মহাবিপর্যয়ের ধ্বংসলীলা যথাযথভাবে এক কথায় প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার ছিলো।

আবার প্রায় ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র ও তাদের আয়ত্তাধীন গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু ও নেবুলাসহ সকল কিছুকে চাপের মুখে ধ্বংস করে সম্পূর্ণ গ্যালাক্সিকে একটি মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity-তে) কোণঠাসা করে জমিয়ে আনা এবং এ অবস্থায় এক পর্যায়ে কল্পনাতীত চাপ ও তাপে বিন্দুটি নিজকে আর সামাল দিতে না পেরে প্রচণ্ড এক মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে চতুর্দিকে মহাসম্প্রসারণ-এর মাধ্যমে প্রতিনিয়তই আয়তনে বৃদ্ধি ঘটতে থাকবে। এ পর্যায়ে মূল বিস্ফোরণ বিন্দু থেকে বস্তুভর (Mass) প্রচণ্ড শব্দে ও বিস্ফোরণজনিত ধাক্কায় (Thrust-এ) কল্পনাতীত গতিতে মহাকাশের চতুর্দিকে যে প্রবল বিস্তৃতি ঘটাতে থাকবে, একেও একটি 'বাগধারা' দিয়ে প্রকাশ করলে 'শিঙ্গায় ফুৎকার'ই বলা যথোপযুক্ত বলে মেন হয়, কারণ 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে সকল আলামত প্রকাশ পায়, উপরে উল্লিখিত মহাবিস্ফোরণের বেলায়ও তেমনি ঘটনা ও অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছে।

অতএব আল-কুরআনে এ পৃথিবীর ধ্বংস ও পরকালে নতুন করে আবার জগত সৃষ্টির বেলায় যে 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ এমনটি করা সঠিক হবে না যে, হযরত ইস্রাফিল (আ) নামক আল্লাহ্‌র ফিরিশতা মুখে 'শিঙ্গা' লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আদেশ হওয়া মাত্র তিনি 'শিঙ্গা ধ্বনি' দিয়ে পৃথিবীর কিয়ামাত ঘোষণা করবেন এবং কিয়ামাতের পর আবার আল্লাহ্‌র আদেশ লাভ করে তিনি 'শিঙ্গা ধ্বনি' করে নতুন জগৎ তৈরীর ঘোষণা প্রদান করবেন। বরং আল্-কুরআন এবং অগ্রসরমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের পর্যালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে যে, 'শিঙ্গায় ফুৎকার' একটি বাগধারা। এর সঠিক অর্থ হবে– আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন

তাঁর নিজস্ব একক পরিকল্পনায় এ পৃথিবী ধ্বংসের এবং ধ্বংসের পর আবার নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে যে 'সময়' তিনি নিজ থেকেই নির্ধারণ করেছেন, সেই নির্দিষ্ট সময়টি আগমন করা মাত্র– তিনি যখন 'হও' বলবেন, ঠিক তখনই পৃথিবীর প্রলয় শুরু হয়ে যাবে, এমন প্রচণ্ড তোড়ে পৃথিবীর চতুর্দিক হতে মহাজাগতিক বিপর্যয় শুরু হবে যে, বিকট-বিকট শব্দ ও প্রবল ঝড় ও ভূমিকম্পে সমস্ত কিছুই ছিন্ন-ভিন্ন ও লণ্ড-ভণ্ড হয়ে একাকার হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণের সকল প্রকার স্পন্দন। এক পর্যায়ে ধ্বংসের গভীরে নিমজ্জিত হবে এ পৃথিবী এবং সমগ্র গ্যালাক্সির সাথে মহাসঙ্কোচনে পড়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হবে। আবার একইভাবে ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন করে জগত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ যখন 'হও' বলবেন, তখনই সাথে সাথে সঙ্কুচিত ধ্বংসস্তূপ নামক চাপে ও তাপে উত্তপ্ত মহাসূক্ষ্ম বিন্দুটি মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে যে প্রচণ্ড শব্দ ও প্রবল থেকে প্রবলতর গতির বিস্তৃতি ঘটিয়ে বস্তু ও শক্তির মহাসম্প্রসারণ সৃষ্টি করবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বিবর্তনের ভেতর দিয়ে তা থেকে নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি হতে থাকবে, যে জগতগুলোই পরকালের বিচারের মাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেই 'প্রচণ্ড শব্দ' ও 'প্রবলতর গতি' সম্পন্ন কর্মকাণ্ডকেই আল্-কুরআন ঘোষিত 'শিঙ্গায় ফুৎকার' হিসেবে বুঝতে হবে।

আল-কুরআন এবং বর্তমান সাফল্যে ভরা বিজ্ঞান 'শিঙ্গায় ফুৎকার' নামক বাগধারাটির উল্লিখিত বক্তব্য ছাড়া আর কোনো বক্তব্যকে সমর্থন করে না।

সুতরাং "এগুলোই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩৪)

"আল্লাহ্ যে এ মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা তাতে আর কোন সন্দেহ আছে কী? (১৪ ঃ ১০)

"প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" (৩৫ ঃ ২৮)

এবার আমরা পুরো অধ্যায়টি এক নজরে দেখে নিই।

এক নজরে

আল্-কুরআন

বর্তমান বিজ্ঞান

১. "মহাবিশ্ব ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (৪৬ : ৩)

"কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে।" (৬৭ : ২৬)

"হে মানুষ ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে, কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।" (৯২ : ১)

১. আমাদের সম্মুখে দৃশ্যমান এ বিশাল মহাবিশ্ব ও তার ভেতরকার সমস্ত শক্তি ও বস্তু এক মহাপরিকল্পনার অধীন এক সময় সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু সৃষ্টি হয়েছে তাই এর ধ্বংস যে একদিন ঘটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান বিভিন্নভাবে তা প্রমাণও করেছে। তবে কখন কোন্ জিনিস ধ্বংস হবে সে সম্পর্কে পূর্বেই নির্দিষ্ট সময়টি বলা মানব জাতির বা বিজ্ঞান বিশ্বের আয়ত্তের বাইরে, এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কেউ কিছু জানে না। যখন এ পৃথিবীর ধ্বংস সাধন শুরু হবে তখন প্রচণ্ড ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, জলোচ্ছ্বাস, জ্বলন্ত অগ্নি, উড়ন্ত পাথরের আঘাত, সর্বত্র তেজস্ক্রিয়তা ও ধূয়া ছড়িয়ে পড়া এবং বিকট বিকট শব্দে এক মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে।

২. "যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র একটি ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে

২. পৃথিবীর কিয়ামাতের সময় তার চতুর্দিকে অসংখ্য ভাসমান পাথর খণ্ড, গ্রহাণুর বহর, ধূমকেতু, উল্কাখণ্ড ইত্যাদি ব্যাপক হারে কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর আকাশে প্রবেশ করবে বিকট শব্দ সৃষ্টি করে। সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি করবে উত্তপ্ত অগ্নিশিখা ও গাঢ়

মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হবে।" (৬৯ : ১৩-১৬)

ধোয়া। অতঃপর সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস এবং ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে পৃথিবীকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করবে। এতে কোন প্রকার প্রাণ ও উদ্ভিদ জগৎ অক্ষত থাকবে না, সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে।

৩. "এরাতো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের যাতে কোন বিরতি থাকবে না।" (৩৮ : ১৫)

৩. বর্তমান বিজ্ঞান ব্যাপক গবেষণা করে পৃথিবীর ধ্বংসকে যে কয়টি পদ্ধতির মাধ্যমে হতে পারে, তার সব কয়টি পদ্ধতিরই বিস্তারিত পর্যালোচনা পেশ করেছে। বিজ্ঞান বলেছে– আমাদের সূর্য নামক নক্ষত্রটির মাধ্যমেই পৃথিবীর ধ্বংস ঘটতে পারে, যখন নক্ষত্রের জ্বালানী শেষ হওয়ার কারণে ভেতরের প্রজ্জ্বলিত পারমানবিক চুল্লী বন্ধ হয়ে গিয়ে সূর্যের সমগ্র দেহ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে ব্যাপকভাবে বর্ধিত হলে, তখন সূর্যদেহ বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথকেও ছাড়িয়ে যাবে এবং তাতে গ্রহ-উপগ্রহ ব্যবস্থাগুলো সূর্যদেহের সাথে মিশে যাবে, ফলে তাদের ধ্বংস সাধন ঘটবে।

"সূর্যকে যখন বিপর্যস্ত করে দেয়া হবে। যখন নক্ষত্রসমূহ স্থানচ্যুত হয়ে বিপর্যয় ঘটাবে।" (৮১ : ১৩২)

এছাড়া ধূমকেতুর মাধ্যমেও পৃথিবীর কিয়ামাত ঘটে যেতে পারে, যদি কখনও কোন কারণে একটি ধূমকেতুও পৃথিবীতে আঘাত হানে তাহলে উপরে উল্লিখিত বিপর্যয়গুলোতে পৃথিবী নিমজ্জিত হবে এবং ধ্বংস হবে সার্বিকভাবে।

বড় বড় পাথর খণ্ডের এমনকি মাত্র এক কিলোমিটার ব্যাসের একটি পাথর খণ্ড বা গ্রহাণুর আঘাতেও পৃথিবীর কিয়ামাত ঘটে যেতে পারে। পৃথিবীর চারপাশে প্রায় ৫০০০ পাথর খণ্ড সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের থেকে কিংবা মহাশূন্যে প্রদক্ষিণরত বিভিন্ন পাথরের বেল্ট থেকেও কোন কারণে উড়ন্ত পাথর পৃথিবীর উপর আঁছড়ে পড়ে কয়েক লক্ষ পারমানবিক বোমার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ব্যাপক ধ্বংসীয় পরিবেশের মাধ্যমে প্রাণ ও উদ্ভিদকে চিরদিনের জন্যই বিলীন করে দিতে পারে। এতে পৃথিবীর আকাশও চিরতরে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

"যখন চন্দ্রও হয়ে পড়বে বিপর্যস্ত। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।" (৭৫ : ৮, ৯)

"শপথ আকাশের এবং আঘাতকারীর, তুমি কি জানো সেই আঘাতকারী বস্তুটি কি? ওটি একটি প্রজ্জ্বলমান জ্যোতিষ্ক।" (৮৬ : ১-৩)

এছাড়া উপরে উল্লিখিত যে কোন পদ্ধতিতেই পৃথিবীর কিয়ামাত ঘটুক না কেন মূল কথা হলো তখন কল্পনাতীত বিপর্যয়ে পৃথিবী আচ্ছন্ন হবে, যা বর্ণনা করা সত্যিই এক দুরূহ ব্যাপার। তাই স্বল্প কথায় বলতে গেলে 'শিঙ্গা ধ্বনি' কিংবা 'শিঙ্গায় ফুৎকার' বাগধারাটি ব্যবহার করা সঠিক ও যথার্থ হয়েছে বলা যায়।

"যখন গ্রহাণুসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে স্থানচ্যুত হবে।" (৮২ : ২)

পৃথিবীর ধ্বংসের বেলায় সার্বিকভাবে মহাবিপর্যয় সম্পন্ন হয়ে গেলে অতঃপর সমগ্র গ্যালাক্সি মহাজাগতিক এক কঠিন নিয়মে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) প্রবেশ করবে। তখন ঐ বিন্দুতে প্রচণ্ড চাপ ও

"তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ এ সম্পর্কে যে, যিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথরের ঝাঁক প্রেরণ করবেন? তখন তোমরা বুঝতে পারবে কিরূপ ছিলো আমার সতর্ক বাণী।" (৬৭ : ১৭)

"যখন আকাশের ছাদ (আবরণ) বিপর্যস্ত হবে।" (৮১ : ১১)

"আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাত ওরা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।" (৩৯ : ৬৮)

তাপের কারণে পরক্ষণে আবার এক বিস্ফোরণ ঘটে জমানো শক্তি ও বস্তু মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত হবে। বিস্ফোরণ বিন্দু থেকে সমস্ত শক্তি ও বস্তু প্রবল থেকে প্রবলতর গতি ও শব্দে চতুর্দিকে ছুটতে থাকবে। ঐ অবস্থায় আবার তার মধ্যে পূর্বের ন্যায় নতুন নতুন জগৎ আবির্ভাব হতে থাকবে (যে জগতগুলো পরকালের বিচারের জন্য ব্যবহার হবে)। সুতরাং দেখা গেল ধ্বংসের বেলায় যেমন 'শিঙ্গায় ফুৎকার'-এর মতো অবস্থার সৃষ্টি হবে ঠিক তেমনি আবার ধ্বংসের পরে যখন নতুন নতুন জগৎ সৃষ্টি হবে তখনও অনুরূপ পূর্বের মতোই 'শিঙ্গা ধ্বনি' (বিস্ফোরণ ও তার প্রতিক্রিয়া) স্বরূপ এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। বিজ্ঞান বিশ্ব এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করছে না বরং একশতভাগ সমর্থন জ্ঞাপন করছে।

সম্মানিত সুধী পাঠক! এতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের এই সুন্দর নয়ন জুড়ানো, মনমাতানো সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা পৃথিবীর কিয়ামাত বা ধ্বংসের ব্যাপারে এবং বিচারের জন্য আবার নতুনভাবে জগতকে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্-কুরআন থেকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়কর অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে আরবী বাগধারা 'শিঙ্গা ধ্বনি' বা 'শিঙ্গায় ফুৎকার' কথাটি শুনে আসছি। এতে প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তাধারায় বিভিন্ন রকম কাল্পনিক ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যা মূলতই কল্পনা মাত্র। আমরা বক্ষমান অধ্যায়ে বিষয়টি বিজ্ঞানের নব্য আবিষ্কার আর উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে ব্যাপক পর্যালোচনা করে

চরম বাস্তবতার আলোকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, আসলে পৃথিবীর ধ্বংস এবং আবার বিচারের জন্য নতুন পৃথিবীসহ মানব জাতির পুনরুত্থান উভয় বিষয়টির সাথেই এক মহাবিপর্যয়কর পরিবেশ ও পরিস্থিতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা আল্-কুরআনে সেই যুগান্ত কারী বাগধারা 'শিঙ্গা ধ্বনি' বা 'শিঙ্গায় ফুৎকার' ব্যবহার করেছেন। আজকের উন্নত বিজ্ঞানও তার আবিষ্কৃত সার্বিক তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করে আল্-কুরআনকে নির্দ্বিধায় পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে।

তাই আসুন! আমরা সবাই এক সাথে সমস্বরে দৃঢ়কণ্ঠে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করি– "আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই। এ এক মহাসাফল্য।" (১০ : ৬৪)

শেষ কথা

প্রথমে আল্-কুরআন থেকে পরে কুরআনের সাথে ক্রম অগ্রসরমান বিজ্ঞানের মাধ্যমেও আমরা আজ যথার্থভাবে জানতে পারছি যে, এ পৃথিবীতে প্রথম মানব জাতির আবির্ভাব যখন ঘটে, তখন তাদের সার্বিক পরিস্থিতি এতই সাদামাটা ছিলো যে অন্যান্য প্রাণীর মতোই একই মানে তাদের নিত্যদিনের জীবন অতিবাহিত হতো। তাদের মাঝেও ছিলো না কোনো সমাজ ব্যবস্থা, ছিলো না কোন সভ্যতা, ছিলো না জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো আলোকবর্তিকা। গাছ-গাছালি, ফল-মূল কিংবা বনের লতা-পাতা খেয়ে তারাও জীবন ধারণ করতো।

এভাবে চলতে চলতে ক্রমান্বয়ে তাদের মাঝে একটু একটু করে জ্ঞানের আলো ঝল্‌ক দিতে থাকে এবং মাঝে মাঝে বিকশিত হয়ে মানব জাতির সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে যৎসামান্য করে হলেও উন্নতির প্রসার লাভ ঘটতে থাকে। উল্লিখিত ক্রমোন্নতির ধারা বিগত প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে একটানা চলে আসার কারণে ভূ-পৃষ্ঠের সকল প্রকার প্রাণীদের পেছনে ফেলে এককভাবে মানব জাতি আজ সমস্ত সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সাথে সাথে সৃষ্টির মধ্যে সেরা সৃষ্টির খেতাবও নিজেদের পক্ষে ছিনিয়ে এনেছে। মানব জাতির আজকের এই গৌরবময় অবস্থান সমগ্র বিশ্বব্যাপী চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অথচ শুরুতে মানব জাতির যে অবস্থা বিরাজমান ছিলো সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পাহাড়ের গুহায়, গাছের কুঠরে, মাটির গর্তে কিংবা ভাসমান যাযাবররূপে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে, তখন তাদের মন-মস্তিষ্কে রক্ষিত সকল প্রকার তথ্য ও তত্ত্ব এবং তাদের আচরণে প্রতিফলিত ধ্যান-ধারণা, পরবর্তীকালে যখন তারা ক্রমোন্নতির বলে কয়েক ধাপ এগিয় যায় তখন পূর্বের ঐ সকল তথ্য ও তত্ত্বকে শুধু ছুঁড়ে দূরে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয়নি সাথে সাথে তারা

"কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না (বরং বন্য ১০০টি প্রাণীর মতোই শুধুই প্রাণী ছিলো)।" (৭৬ ঃ ১)
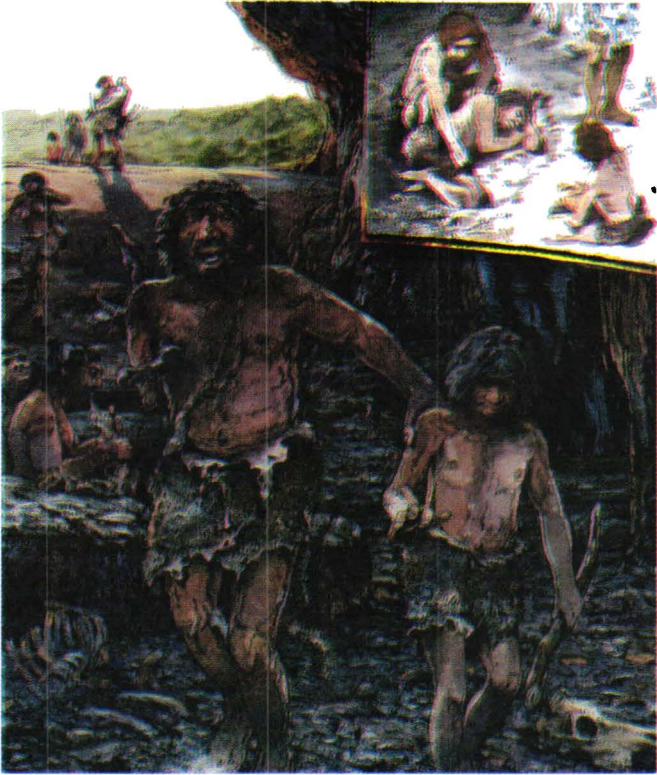
চিত্র-১০৭

– বিগত প্রায় ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) বছর আগ থেকে নিয়ে প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) বছর আগ পর্যন্ত মানব জাতির অবস্থা অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় কোন দিকেই উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না, তখন বন্য প্রাণীর মতো মানব সন্তানরাও বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহায়, গাছের কোঠরে কিংবা ধুঁ-ধুঁ প্রান্তরে যে যার মতো জীবন নির্বাহ করতো। তাদের মাঝেও ছিলো না সমাজ ব্যবস্থা বা সভ্যতার কোন আলো, এমনকি কাঁচা রক্ত-মাংস, লতা-পাতা ফল ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতো। আগুনের ব্যবহার জানতো না, অস্ত্র তৈরী ও ব্যবহারও তাদের জানা ছিলো না। গাছের পাতা বা ছাল ও পশুর চামড়া স্বল্পমাত্রায় ব্যবহার করতো। বেশির ভাগ সময় উলঙ্গ বা বস্ত্রহীনভাবে চলাফেরা করতো। শিক্ষার কোন প্রকার আলোই তাদের মাঝে ছিলো না। বন্য প্রাণীদের মতোই তাদের জীবন তারা পরিচালিত করতো।

"নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) উন্নতির প্রসার লাভ করবে ।" (৮৪ ঃ ১৯)
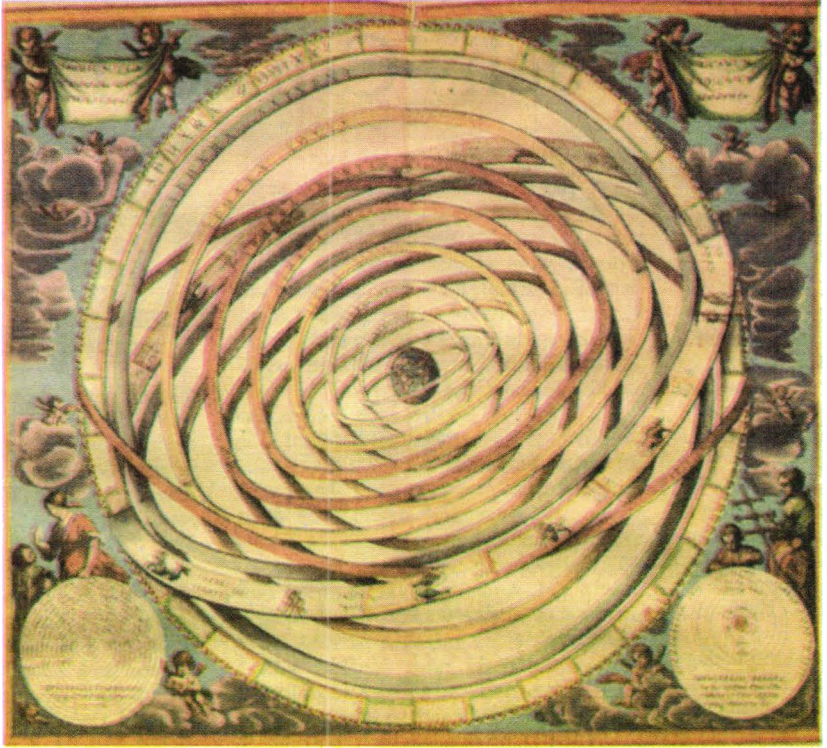
চিত্র-১০৮

– প্রায় বিগত ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) বছর পূর্ব হতে সম্ভবত হযরত আদম (আ)-এর আগমন মুহূর্ত থেকেই মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সমাজ ব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা, সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার আলো একটু করে ছড়িয়ে দিতে থাকলেন বিভিন্নভাবে। ফলে তারা নিজেদের অজান্তেই সকল ক্ষেত্রে বন্য প্রাণীকুল থেকে নিজেদের পৃথক করে নিতে থাকলো এবং নতুন আলোতে ভাবতে, চিন্তা-গবেষণা করতে শুরু করলো। সৃষ্টিকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে এক পর্যায়ে দৃশ্যমান জগতকেই মহাবিশ্ব হিসেবে ভাবলো এবং পৃথিবীকেই এই দৃশ্যমান জগতের কেন্দ্র বলে ধরে নিলো। তারা মনে করলো চন্দ্র-সূর্য ও তারকাসমূহ সবাই পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই এর চারদিকে অনবরত ঘুরছে এবং তার ফলেই রাত ও দিন পর্যায়ক্রমে আগমন করছে। যদিও পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে তাদের সেই ধারণা মূলত ভ্রান্ত ছিলো। এভাবে প্রতিটি যুগেই প্রাথমিক ধারণাগুলো প্রকৃত সত্য থেকে অনেক দূরে ছিলো।

"তিনিই (আল্লাহ্) মানুষকে অবহিত করেছেন, ইতোপূর্বে সে যা জানতো না।" (৯৬ ঃ ৫)
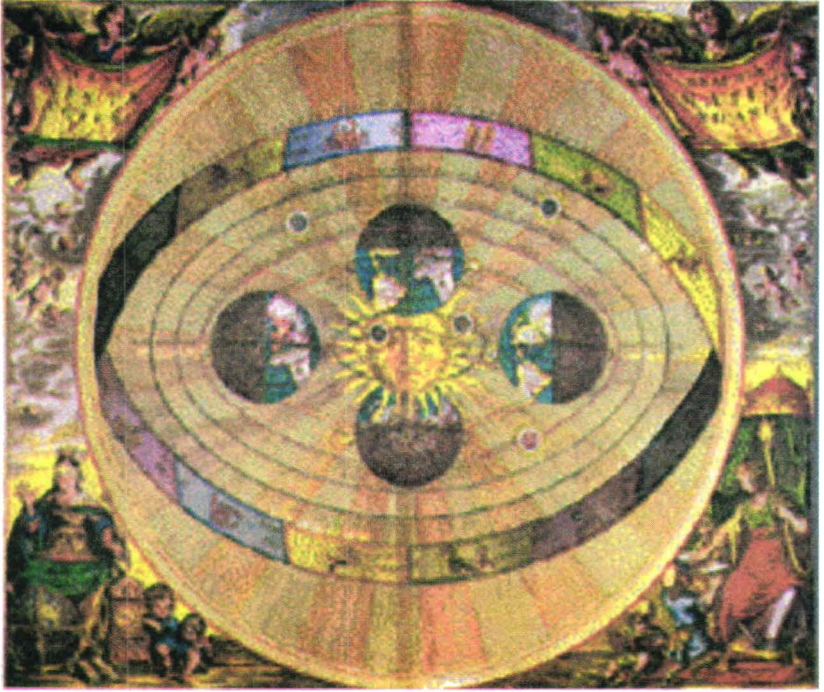
চিত্র-১০৯

– মানব সমাজ পা-পা করে সভ্যতা ও উন্নতির পথে এগিয়ে চলার পর্যায়ে এক সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিছুটা অগ্রগতি লাভ করে বুঝতে সক্ষম হয় যে, তাদের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐ দৃশ্যমান জগত মূলত মূল মহাবিশ্ব নয়। মহাবিশ্ব আরো অনেক বড় হবে। পৃথিবীও সেই মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয় বরং সূর্য কেন্দ্রিক একটি সৌরপরিবারের সদস্য 'গ্রহ' আমাদের এ সুন্দর পৃথিবী। এ সৌরপরিবারে সূর্যকে কেন্দ্র করেই সকল গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণু ইত্যাদি চতুর্দিকে ঘুরছে। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘুরপাক খাচ্ছে বলেই দিন রাত্রির পরিবর্তন ঘটছে। আবার সূর্যের চারদিকে পৃথিবী একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগছে তা-ই বছর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এভাবে মানব সমাজ ধাপে ধাপে মূল সত্যের দিকে এগিয়েছে।

নিজেদের প্রতি নিজেরাই ধিক্কার দিয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানের অগ্রযাত্রা ঘটায় তাদের মাঝে এ পরিবর্তন এসেছিল। আবার দেখা যায় এ মধ্যবর্তী অবস্থায় তারা তাদের চারপাশের অগণিত বিষয়ে নিজেদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এমন এমন কতগুলো সিদ্ধান্ত দিয়ে বসেছিল যে তখন মনে হয়েছিল তাদের এ জাতীয় সিদ্ধান্ত সর্বকালে সর্বযুগে একইভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কখনো তা পরিবর্তন হবে না বা পরিবর্তনের প্রয়োজনও পড়বে না। কারণ মানব জাতি পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে তখন খুবই ভালো ও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই মানব জাতির, বিগত প্রায় কয়েক শতাব্দি ধরে তাদের মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন অভাবিত প্রসার আর উন্নতি ঘটলো সকল ক্ষেত্রেই যে, পূর্বের তাদের প্রতিষ্ঠিত অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক আবিষ্কার, অনেক মতামত ও ধ্যান-ধারণা ক্রমোন্নতির বানের তোড়ে তা বালির বাধের মতোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। অগ্রযাত্রার বলিষ্ঠতা এতই মজবুত ও প্রভাবশালী ছিলো যে, বিজ্ঞান জগতের আগের নাম করা অনেক বিজ্ঞানী রীতিমত হতবাক হয়ে গেলেন। তারা খেই হারিয়ে ফেললেন নব নব আবিষ্কার আর উদ্ঘাটনের মহাবিস্ময়কর কেরামতি ও নবরূপে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের উপস্থিতি দর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

১. আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল চূড়ান্ত নয়, বরং মহাবিশ্বে আছে এর চেয়েও বহু বহুগুন বেশি গতিসম্পন্ন অনেক আলোকরশ্মি যা ইতোমধ্যেই আমেরিকার এক ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

২. মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানার দিকে প্রায় ১৫০০ কোটি আলোকবর্ষ থেকে ২০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে 'গামা-রে' বার্স্ট (GRB) সংঘটিত হয়ে প্রমাণ করছে– বহু বহু জগতের নির্দিষ্ট করা সময় ও অবস্থা অতিক্রমের সাথে সাথেই তাদের কিয়ামাত সংঘটিত হচ্ছে এবং পরক্ষণে পরকালের বিচারের মাঠ তৈরী হচ্ছে হিসাব প্রদান করার জন্য। বহু প্রাণময় জগতে পূর্ণ এ মহাবিশ্ব বর্তমান বিজ্ঞানীদের Gamma-ray burst-এর মাধ্যমে সে মহাসত্যই জানিয়ে দিয়েছে।

"তোমাদের নিকট পৌঁছেছে অতীত ইতিহাস, পূর্ণতাপ্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান যা সাবধান-সতর্ক হওয়ার দাবীকে পূর্ণমাত্রায় পূরণ করেছে।" (৫৪ : ৪, ৫)
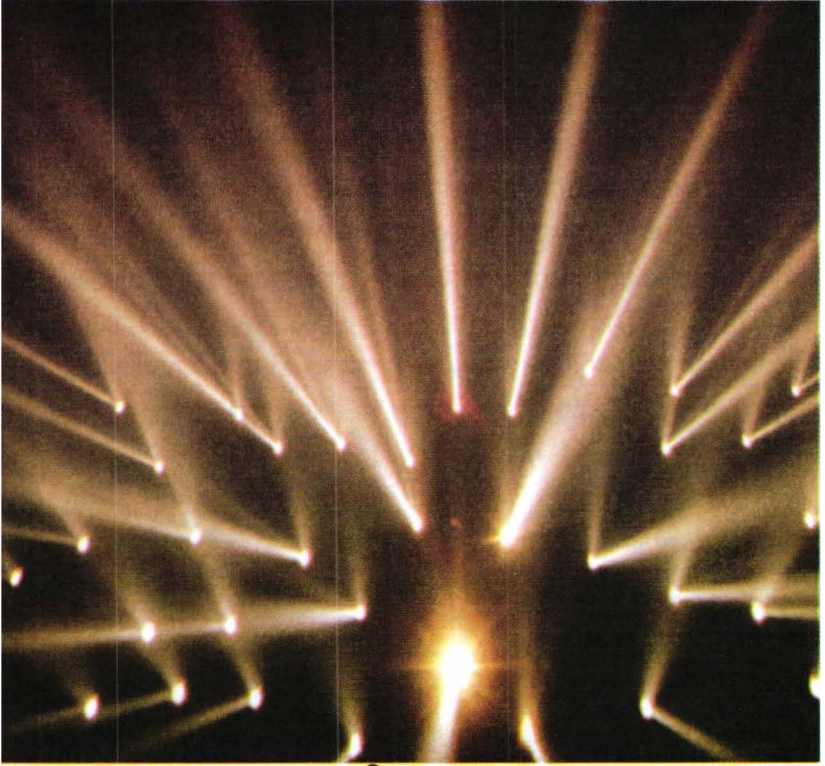
চিত্র-১১০

– জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকশিত হওয়ার পথে মধ্যবর্তী পর্যায়ে (Intermediate period-এ) বিজ্ঞানবিশ্ব আলোর গতি চূড়ান্তভাবে প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বলে ধরে নিয়েছিল এবং এর চেয়ে বেশি গতি এ মহাবিশ্বে নেই বলে সিদ্ধান্তও পেশ করেছিল। কিন্তু বর্তমান সর্বশেষ চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজ্ঞান জানাচ্ছে যে, আলোর গতি ১,৮৬,০০০ মাইল/সেকেণ্ড-ই চূড়ান্ত নয়। মহাবিশ্বে আছে অজানা অনেক অনেক আলোকরশ্মি যাদের গতি বর্তমান জানা গতির তুলনায় হাজার লক্ষ গুণ বেশি গতি সম্পন্ন।

আমেরিকায় অতিসম্প্রতি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাকালে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন পৃথিবীতেই জানা আলোর গতির তুলনায় সৃষ্ট ইলেক্ট্রিক পাল্‌স (Electric Pulse)-এর গতি অনেক বেশি। মহাবিশ্বের মাঝেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির ভিন্ন ভিন্ন অনেক আলো বর্তমান আছে যাদের গতিও অনেক অনেক বেশি।

"পরকাল! এতো কেবল এক 'মহাবিস্ফোরণ' সাথে সাথে (সৃষ্ট নতুন) ময়দানে (গ্রহে) তাদের আবির্ভাব ঘটবে।" (৭৯ : ১৩, ১৪)
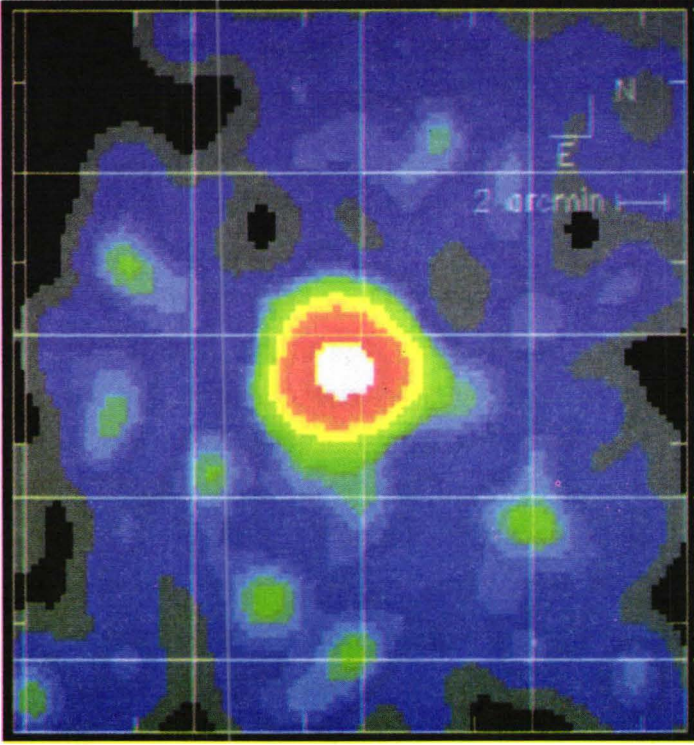
চিত্র-১১১

– বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী 'আলবার্ট-আইনস্টাইন' জানিয়ে গিয়েছেন বিশ্বাবাসীকে যে, গ্যালাক্সিগুলো মহাকাশে উড়ে যাওয়ার পথে আলোর গতি প্রায় লাভ করার কারণে এক সময় গতিমুখের বিপরীতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হতে হতে এক সময় মহাসূক্ষ্ম বিন্দুবত অবস্থায় পৌঁছে যাবে। তখন সমগ্র গ্যালাক্সি ও তার ভেতরকার সমস্ত জগত ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে যাবে এবং বিন্দুবত (Singularity) অবস্থানে সমস্ত বস্তুভর প্রচণ্ড চাপে জমে যাবে। তারপর এক পর্যায়ে ঐ বিন্দুতে প্রচণ্ড চাপের কারণে সৃষ্টি হবে বর্ণনাতীত তাপ। ফলে প্রচণ্ড চাপ ও তাপে বিন্দুটিতে ঘটবে এক 'মহাবিস্ফোরণ'। আর সাথে সাথে বিন্দুটি মহাসম্প্রসারণে নিয়োজিত হবে এবং সৃষ্টি হতে থাকবে তাতে পূর্বের ন্যায় নতুন নতুন জগত। আইনস্টাইনের সেই ভবিষ্যৎ বাণী বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে। 'গামা-রে বার্স্ট' (GRB)-এর আলোক ঝলক পরকালের সেই বাস্তবতার সংবাদ মানব জাতিকে জানিয়ে যাচ্ছে। এবার সাবধান হবে কী?

৩. 'নক্ষত্রবিহীন গ্রহ ব্যবস্থা থাকতে পারে না,' পূর্বের এ ধারণা বর্তমানে 'ওরিয়ন নেবুলা'-তে আবিষ্কৃত নক্ষত্র ছাড়াই অনেকগুলো গ্রহের মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে পাস্পরিক আকর্ষণজাত কারণে ভারসাম্য সৃষ্টি করে টিকে থাকা এবং মহাকাশে অন্যত্র মাত্র দু'টি গ্রহ পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে ভারসাম্য এনে টিকে থাকা আবিষ্কৃত হয়ে পূর্বের তথ্যকে বাতিল করে দিয়েছে।

৪. 'Big Bang' তথা মহাবিস্ফোরণ-এর মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া এ মহাবিশ্ব আবার 'Big Crunch'-এর ভেতর দিয়ে একদিন যবনিকাপাত ঘটাবে বলে বিগত কয়েক দশক থেকে বিজ্ঞান বিশ্বের নামকরা প্রায় সকল বিজ্ঞানী একমত হয়ে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা দিয়ে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন এবং অনেকেই যার যার মতো করে এ বিষয়ে প্রচুর ব্যাখ্যাও প্রদান করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, এ বিষয়ে যখন তারা প্রায় তিন-চার বছর পূর্বে প্রমাণ করতে নামলেন মাঠে, তখন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা বাস্তবভাবে দেখলেন এ মহাবিশ্বের এখনও যে দুর্বার গতিতে মহাসম্প্রসারণ চলছে এবং তাদের পূর্বের ধারণার তুলনায় মহাবিশ্বে বস্তুর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে এতো কম যে, যার 'মহাকর্ষ বল' সেই মহাসম্প্রসারণকে টেনে থামাতে কখনই সম্ভবপর হবে না। ফলে মহাসম্প্রসারণ থেমে গিয়ে মহাবিশ্বের মহাসঙ্কোচন বা 'Big Crunch' তাদের কথা মতো যে ঘটবার কথা ছিলো, তা তারাই এখন বাতিল করে দিয়েছেন। মুখ থুবড়ে পড়েছে তাদের 'Big Crunch Theory'। তারা এখন বাকরুদ্ধ ও হতবাক। পূর্বে তারা এ মহাবিশ্বকে বলে ছিল 'Closed Universe' কিন্তু উল্লিখিত এক্সেপেরিমেন্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এখন নাম দিয়েছেন 'Open and flate Universe'।

এভাবে বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী সময়ের (Intermediate period) অনেক বড় বড় আবিষ্কারই এখনকার চূড়ান্ত পর্বের বিজ্ঞান এসে বাতিল করে দূরে নিক্ষেপ করছে, যার কোন বিরোধিতা বা অস্বীকার কেউ করছে না যথার্থ

"আমি (আল্লাহ্) কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনরায় সৃষ্টি বিষয়ে ওরা সন্দেহ পোষণ করবে?" (৫০ ঃ ১৫)

চিত্র-১১২

– না, এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে পরকাল কোনো কাল্পনিক বিষয় নয় বরং 'গামা-রে বার্স্টের'-এর মাধ্যমে পরকালে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে তার প্রমাণ এখন সেই বিজ্ঞানীদের হাতে যারা পূর্বে পরকালকে, বিচার দিবসকে, হাশরের জন্য সৃষ্ট নতুন জগতকে, জাহান্নামকে এমনকি পুলসিরাতকে অস্বীকার করতো। এখন তাদের হাতে আরও প্রমাণ হাজির হয়েছে– নক্ষত্র ছাড়াই যে গ্রহ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়ে মহাশূন্যে মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে সেই চমকপ্রদ রহস্যও। আল্-কুরআন দাবী করেছে পরকাল আলোকিত হবে আল্লাহ্‌র বিশেষ 'নূর' দিয়ে, যে কারণে সেখানে সূর্যের (নক্ষত্রের) প্রয়োজন হবে না। এতে অবিশ্বাসী বিজ্ঞানী সমাজ পূর্বে উপহাস করেছিল এই বলে যে, নক্ষত্র ছাড়া গ্রহ ব্যবস্থা কিভাবে কায়েম হবে? অথচ এখন তারাই তা প্রমাণিত করেছে বিজ্ঞানের বদৌলতে।

"আমি (আল্লাহ্) মহবিশ্ব সৃষ্টি করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই এর মহাসম্প্রসারণকারী।" (৫১ ঃ ৪৭)
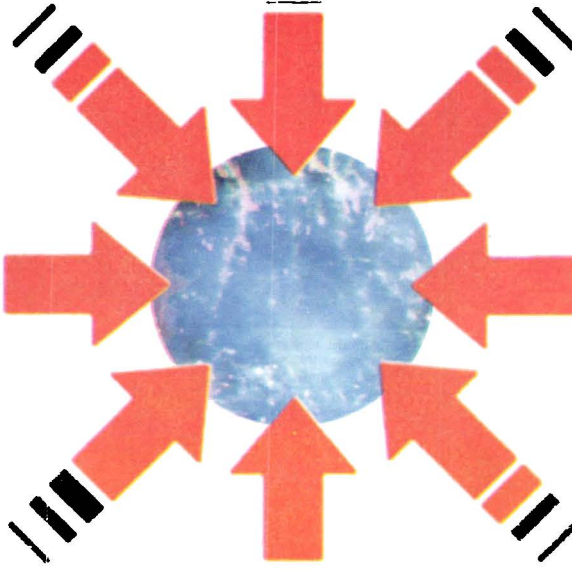
চিত্র-১১৩

– বিগত কয়েক দশক আগ থেকে এ মহাবিশ্বের ধ্বংস বিষয়ে বিজ্ঞানী সমাজ একতাবদ্ধ হয়ে 'Big Crunch' বা 'মহাসঙ্কোচন' বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, তারা কুরআনের ৫১ ঃ ৪৭ উপরে উদ্ধৃত আয়াতকে লক্ষ্য করেনি যেখানে আল্লাহ্ এ মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণের ব্যাপারে 'বর্তমান কাল' (Present tense) ব্যবহার করেছেন। ফলে প্রমাণিত হচ্ছে এতে– এ মহাবিশ্বের মহাসম্প্রসারণ কখনো থামবে না এবং এ অবস্থাতেই অন্য এক পদ্ধতিতে তার ধ্বংস সাধন ঘটবে, যা আমরা ৪র্থ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি।

এখন বিষয়টি প্রমাণ করতে গিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানী সমাজ হাতে নাতে প্রমাণ পেলেন যে, এ মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি 'Big Crunch'-এর মাধ্যমে ঘটার কোন সম্ভাবনাই নেই, কারণ দুর্বার গতিতে মহাবিশ্ব কেবলই মহাসম্প্রসারণ ঘটিয়ে চলেছে এবং মহাবিশ্বে এত বস্তুভর নেই যার 'মহাকর্ষবল' মহাসম্প্রসারণকে টেনে ধরে থামাতে পারে ও বিপরীতে আবার সঙ্কোচন চালু করে 'বিগ ক্রাঞ্চ' সফল করতে পারে।

সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান যতোই অগ্রগতি লাভ করবে, ততোই বিজ্ঞানী সমাজ তাদের পরিপক্কতা দিয়ে, আবিষ্কার দিয়ে এক আল্লাহ্‌র মহাসত্যের নিকটবর্তী হতেই থাকবে। এটাই পরম সত্য কথা। সৌভাগ্যবান কেউ আছে কী? থাকলে এগিয়ে আসুন! আমরা সবাই এক সাথে হাত ধরে চলি এবং সামনে সত্যের পানে এগিয়ে যাই!

কারণে। সেই যথার্থ কারণটা কি? কারণটা হলো– জ্ঞান-বিজ্ঞান এখন মানব সমাজে সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। তাই এখন কোনো 'তথ্য ও তত্ত্বই' আন্দাজ এবং অনুমানের উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্বীকৃতি পেতে হলে, প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সকল প্রকার তথ্যকেই অবশ্যই প্রমাণিত হতে হবে।

আমরা উল্লিখিত বিষয়গুলোর ভেতর দিয়ে গভীরভাবে তাকিয়ে লক্ষ্য করেছি এক অলৌকিক ব্যাপার। আর তা হলো যে, যে আবিষ্কারগুলো পূর্বে আল-কুরআনের তথ্য ও বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারেনি বিভিন্ন কারণে, সেই আবিষ্কারসমূহ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে আরো বিকশিত হয়ে, আরো মজবুত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানব সমাজের সম্মুখে বর্তমানে উপস্থাপিত হচ্ছে। যা বর্তমানে পরিপূর্ণভাবে আল্-কুরআনের সাথে সুসামঞ্জস্য ও সাযুজ্যপূর্ণ। ফলে বৈজ্ঞানিক এই নতুন তথ্যগুলো একদিকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের প্রেরণকৃত 'আল্-কুরআন'-এর সাথে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে, অপরদিকে সমাজের জ্ঞানী-গুণীজনকে এক মহাসত্যের দিকে, এক ও একক মহান আল্লাহ্র দিকে, আল্-কুরআন-এর দিকে, পরকালের কল্যাণময় জীবনের দিকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। আমরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে খুবই দরদের সাথে আমাদের সেই জ্ঞানবান ভাই-বন্ধুদের মহাসাফল্যে ভরা আলো ঝলমল একই পথে উপস্থিত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। তাঁরা সত্য ও প্রকৃত কল্যাণের সেই সুন্দর পথে সাড়া দেবেন কী? আমরা মানব জাতির প্রত্যেক সদস্যের জন্যই সত্য, সুন্দর ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

'ওয়া মা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ্।'

Glossary – (পরিভাষা সংগ্রহ)

Atom (পরমাণু) ঃ বস্তুর উপাদানের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

Asteroid (গ্রহাণু) ঃ ছোট পাথুরে বস্তু বা শীলাখণ্ড যা সূর্যকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে আবর্তন করে থাকে। সৌরজগতের ভেতর মঙ্গল এবং বৃহস্পতিগ্রহের মাঝখানে লক্ষ-লক্ষ শীলাখণ্ড দিয়ে বিরাট বেল্ট তৈরী হয়ে আছে। তাছাড়া শনিগ্রহের চতুর্দিকেও অনুরূপ পাথুরে-শীলাখণ্ডের বেল্ট বর্তমান আছে।

Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান) ঃ মহাবিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরে যত প্রকার বস্তু বর্তমান আছে, এদের বিজ্ঞানভিত্তিক (Scientific) পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ-ই (Study) হচ্ছে 'এ্যাস্ট্রোনোমি' (জ্যোতির্বিজ্ঞান)।

Atmosphere (বায়ুমণ্ডল) ঃ মহাকাশে নক্ষত্র, গ্রহ বা উপগ্রহের চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী গ্যাসীয় স্তরকে Atomosphere (বায়ুমণ্ডল) বলা হয়।

Aurora (মেরুজ্যোতি) ঃ গ্রহের মেরুদ্বয়ের নিকটবর্তী স্থানে সূর্যের প্রবাহমান উত্তপ্ত বায়ু (Solar wind)-র দ্বারা ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে আলোর যে বৈচিত্র্যময় রংয়ের প্রদর্শনী সৃষ্টি হয়, এটাকেই Aurora বা মেরুজ্যোতি বলা হয়। মেরুজ্যোতি সবসময়ই নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে।

Big Bang (মহাবিস্ফোরণ) ঃ যে মতবাদ কল্পনাতীত এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কীয় ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করে, এটাই 'Big Bang' নামে পরিচিত।

Binary Star (যুগ্ম নক্ষত্র) ঃ খুবই পাশাপাশি অবস্থানরত দু'টি নক্ষত্রের একটি অপরটিকে ঘিরে যদি আবর্তন করে এবং পরস্পর পরস্পরের অভিকর্ষ

(Gravitation) বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাহলে ঐ নক্ষত্রদ্বয়কে Binary star বলা হয়। অধিকাংশ নক্ষত্রই Binary পদ্ধতিতে মহাকাশে আবর্তিত হচ্ছে।

Black hole (নক্ষত্র ধ্বংসস্থান) ঃ মহাকাশে বৃহৎ নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বাস্তব অথচ অদৃশ্য এমন স্থান যেখানে অভিকর্ষ বল (Gravity) অকল্পনীয় টানে (enormous pull) সকল কিছুকে কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে। এই টান থেকে সবচেয়ে দ্রুততম 'আলোকরশ্মি'ও আত্মরক্ষা করতে পারে না, ব্ল্যাক হোলের মুখে পড়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। Black hole মহাকাশে 'মৃত্যুকুপের' ভূমিকায় রত।

Cluster (গুচ্ছ) ঃ বহু সংখ্যক নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সির কাছাকাছি নিকটে 'গ্রুপ' হয়ে অবস্থান করাকে ক্লাসটার বলা হয়।

Comet (ধূমকেতু) ঃ ধূলাবালি, শিলাখণ্ড ও পাথরকুঁচি এবং বরফের সমন্বয়ে গঠিত বস্তু খন্ডকে 'ধূমকেতু' বলে। ধূমকেতু উপবৃত্তাকারে (Oval orbit) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Coma (কোমা) ঃ ধূমকেতুর বরফাচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে সূর্যের কিরণে সৃষ্ট ব্যাপক গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জকে 'Coma' বলে।

Constellation (নক্ষত্রপুঞ্জ) ঃ খুবই নিকটবর্তী হয়ে অবস্থানগ্রহণকারী একগুচ্ছ তারকা, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে দেখতে কোন জিনিসের একটা আকৃতির তো দেখায়, এটাই নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellation) নামে পরিচিত। পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্য জুড়ে সর্বমোট ৮৮টি Constellation নির্দিষ্ট আছে।

Core (মধ্যবর্তী স্থান) ঃ নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা Asteroid বা Comet-এর কেন্দ্রীয় অংশকে core বলা হয়, যা এর চতুর্দিকের একাধিক স্তরের বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

Corona (কোরোনা) ঃ সূর্যের আবহমণ্ডলের বাইরের দিকে সবচেয়ে দূরের (Outermost part) অংশকে 'Corona' বলা হয়।

Cosmic ray (মহাজাগতিক রশ্মি) ঃ খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা (Highly energetic particles) যা মহাশূন্যে প্রায় আলোর গতিতে ভ্রমণ করে থাকে। Gamma-ray, X-ray, Ultra violet ray সবই Cosmic ray- এর অন্তর্ভুক্ত।

Cosmology (সৃষ্টিতত্ত্ব) ঃ মহাবিশ্বের সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসম্পর্কে 'গবেষণাই' হচ্ছে' Cosmology.

Day (দিন) ঃ কোন গ্রহ তার অক্ষের উপর একবার পূর্ণ ঘুর্ণনে (Spin around once) যে সময়ের প্রয়োজন হয়, এর সমষ্টিকে দিন (Day) বলা হয়।

Dwarf Star : আমাদের সূর্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট সূর্যকে Dwarf star বলা হয়।

Eclipse (গ্রহণ) ঃ মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় আবর্তন করতে গিয়ে কখনও একটি বস্তুকর্তৃক অপর কোন বস্তু পূর্ণ বা আংশিক ঢেকে যায়, এটাই 'Eclipse'. যেমন চন্দ্র যখন সূর্যের সম্মুখ দিয়ে গমন করে, তখন পৃথিবী থেকে সূর্যকে পরিপূর্ণরূপে দেখা যায় না, ঐ অবস্থাকেই তখন সূর্য গ্রহণ (Eclipse) বলে।

Electron (ইলেকট্রন) ঃ সকল পরমাণুর ভেতর নেগেটিভ চার্জযুক্ত বস্তুকণিকা যা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে অনবরত পরিভ্রমণ করতে থাকে। সংখ্যায় এরা সবসময় নিউক্লিয়াসের উপাদান 'প্রোটন' কণিকার সমানসংখ্যক হয়ে থাকে। এদের ওজন প্রায় $9.1 \times 10^{-31} kg.$

Element (উপাদান) ঃ একই রকম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত পদার্থ। যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ।

Escape Velocity *(মুক্তগতি)* ঃ কোন বস্তুর পৃষ্ঠদেশের আওতাভুক্ত এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে পালিয়ে যেতে সর্বনিম্ন যে গতির প্রয়োজন হয়, তাই Escape velocity. পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মহাশূন্যে পূর্ণরূপে পালিয়ে যাওয়ার সর্বনিম্ন 'মুক্তগতি' হচ্ছে ১১.২ কিঃ মিটার/সেকেণ্ড।

Event horizon : ব্ল্যাক হোলের চতুর্দিকে সৃষ্ট 'বাউণ্ডারী' (Boundary) যেখানে 'মুক্ত গতি' (Escape velocity) আলোর গতির প্রায় সমান। এস্থানে কোন বস্তু আসার পর তার রক্ষা নেই, বস্তুটি মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে 'ব্ল্যাক হোলে' চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়।

Gas Giant : তুলনামূলকভাবে ছোট কোর (Core) বিশিষ্ট এবং ঐ কোরকে ভিত্তি করে চতুর্দিকে গ্যাস ও তরল পদার্থ দিয়ে সৃষ্ট গ্রহকে 'গ্যাস জায়ান্ট' বলা হয়।

Light Second (আলোক সেকেণ্ড) ঃ এক সেকেণ্ড সময়ে আলোকরশ্মি যতটুকু পথ অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট সেকেণ্ড বলা হয়। এক সেকেণ্ডে আলোকরশ্মি প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে।

Galaxy (নক্ষত্র শহর) ঃ নক্ষত্রসমূহ, ধূলাবালি ও গলিত পদার্থের মেঘপুঞ্জ (নেবুলা), স্টার ক্লাস্টার, গ্লোবুলার ক্লাস্টার ইত্যাদির একত্রে মিলিত এক বিরাট দল বা গ্রুপকেই বলা হয় গ্যালাক্সি। বিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান লাভ করেছেন।

Gaint Star ঃ আমাদের সূর্যের চাইতে অপেক্ষাকৃত বড় সূর্য হচ্ছে 'Giant Star'.

Gravity (অভিকর্ষ) ঃ যে শক্তি (The force of Attraction) বস্তুসমূহকে পরস্পরের দিকে টানে, তাই অভিকর্ষ বল বা Gravity, উদাহরণস্বরূপ পৃথিবী ও চাঁদ উভয় সবসময় অভিকর্ষ (Gravity) বলের টানে আবদ্ধ হয়ে আছে।

Gamma-ray (গামা-রে) ঃ সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) বিশিষ্ট হাই এনার্জি রেডিয়েশন (High energy radiation), যা জীব এবং প্রাণীর দেহকোষের সংস্পর্শে আসা মাত্র কোষগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ধ্বংসসাধন করে থাকে। সকল প্রকার আলোকরশ্মির মধ্যে Gamma-ray সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ও বিপদজনক।

Light Minute (আলোক মিনিট) ঃ পূর্ণ এক মিনিটে আলোকরশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট মিনিট বলে।

Light Year (আলোকবর্ষ) ঃ আলোক রশ্মি (Ray of light) এক বছর সময়ে যতটুকু পথ যেতে পারে, ঐ দূরত্বকে 'এক আলোকবর্ষ' (One light year) বলা হয়। প্রমাণিত হয়েছে এক আলোকবর্ষ সমান দূরত্ব হচ্ছে ১০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার (৬ ট্রিলিয়ন মাইল)।

Magnitude ঃ মহাশূন্যে নক্ষত্রসমূহের 'উজ্জ্বলতা'কে বলা হয়।

Moon (চাঁদ) ঃ ধূলাবালি, শিলাপ্রস্তর দিয়ে তৈরী প্রায় দুই হাজার মাইল ব্যাস সম্পন্ন বিরাট বল, যা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Meteor (উল্কা) ঃ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাথরকণা বা কুঁচি যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করামাত্র বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আলোর ফুলকি সৃষ্টি করে, যা Shooting Star হিসেবেও পরিচিত।

Meteorite (ভূপাতিত উল্কা) ঃ যে সকল উল্কা বায়ুমণ্ডলে পুড়ে-পুড়ে পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত আঘাত করে এদেরকে Meteorite বলা হয়।

Meteroid : যে সমস্ত উল্কা আকারে একটু বড় এবং সূর্যকে কক্ষপথে পরিক্রমণ করে, এদেরকেই বলা হয় Meteoroid.

Meteor shower ঃ পৃথিবী যখন কোন ধূমকেতুর কক্ষপথ ছেদ করে পরিভ্রমণ করে তখন ঐ ধূমকেতু থেকে নির্গত ব্যাপক Meteor (উল্কা) পৃথিবীর আবহমন্ডলে প্রবেশ করে (স্বল্প সময়ের জন্য) বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে পুড়ে বিরাট এলাকা নিয়ে একই সাথে যে ব্যাপক আলোর ফুলঝুরি প্রদর্শনীর সৃষ্টি করে তাকেই Meteor shower বলে।

Matter ঃ বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যা দিয়ে মহাবিশ্বের সকল বস্তু অস্তিত্ব ধারণ করছে।

Molecule (অনু) ঃ রাসায়ণিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক পরমাণু মিলিত হয়ে 'অণু' গঠিত হয়। অনুকেই সাধারণত পদার্থের মৌলিক (এক হিসেবে) ধরা হয়।

MilkyWay Galaxy ঃ আমাদের এই সৌরজগত যে গ্যালাক্সির অন্তর্গত, তাকেই Milkyway galaxy বলা হয়। গ্যালাক্সিটির মাঝখানে অত্যাধিক বিকিরণের কারণে দুধের মত সাদা ধবধবে পথের ন্যায় চিহ্ন থাকায় ঐ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

NASA (নাসা) ঃ The National Aeronautics and Space Administration যা আমেরিকান সরকারের নির্দেশে মহাকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের পেছনে সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

Nebula (নেবুলা) ঃ ধূলাবালি এবং গ্যাসের সমন্বয়ে বিশাল মেঘপুঞ্জ, যে মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি নামে না, কিন্তু জন্ম নেয় শত-সহস্র নক্ষত্র। অর্থাৎ, নক্ষত্র সৃষ্টির কাঁচামাল হচ্ছে নেবুলা।

Neutron (নিউট্রন) ঃ বস্তুর ক্ষুদ্রতম Unit- 'এ্যাটমিক নিউক্লি'-র ভেতর এক

প্রকার ক্ষুদ্র কণিকা (Sub atomic particle) যা নিরপেক্ষ, চার্জবিহীন (Zero electric charge) এবং এদের ওজন হচ্ছে প্রায় $1.67 \times 10^{-27} kg$ । পরমাণুর ভেতর প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' তৈরী করে।

Neutron Star (নিউট্রন স্টার) ঃ বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র (Supergiant Star) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের ধ্বংসাবশেষে ছোট আকারের যে প্রচণ্ডগতিতে আবর্তনশীল অংশটি (Small spinning part) থেকে যায়, তাকেই 'নিউট্রন স্টার' বলা হয়। এটা 'নিউট্রন' নামক ক্ষুদ্র কণিকাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।

Nova (নোভা) ঃ যে সকল নক্ষত্র হঠাৎ করে ব্যাপক থেকে ব্যাপকহারে উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে পরবর্তীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গিয়ে চিরতরে ম্লান হয়ে যায়, ঐ নক্ষত্রগুলোকে নোভা বলা হয়।

Nucleus ঃ জ্যোতিশাস্ত্রে গ্যালাক্সির মধ্যস্থানে ঘনসন্নিবিষ্ট অংশকে 'nucleus' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ধূমকেতুর সম্মুখে ঘন সন্নিবিষ্ট অংশকেও Nucleus হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

Nuclear Fusion ঃ যে বিগলন পদ্ধতিতে নক্ষত্রের ভেতর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্যাসীয় কণা (Atoms) পরস্পর মিলিত হয়ে বড় বড় ভারী বস্তুকণা সৃষ্টি করে, ঐ পদ্ধতিকেই 'Nuclear fusion' বলা হয়। উক্ত পদ্ধতি সংঘটিত হওয়ার সময় ব্যাপক-বিশাল পরিমাণে তেজস্ক্রিয়তা (Radiation) উৎপন্ন হয়ে থাকে।

Orbit (কক্ষপথ) ঃ মহাশূন্যের মাঝে কোন একটি বস্তু যে কাল্পনিক পথের উপর দিয়ে পরিভ্রমণরত অবস্থায় আরেকটি বস্তুর চারদিকে আবর্তন করে ঐ পথটিকেই 'Orbit' বা কক্ষপথ বলে। যেমন পৃথিবী তার কক্ষপথের উপর দিয়ে সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে থাকে।

Planet (গ্রহ) ঃ নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত অপেক্ষাকৃতভাবে বড় বস্তুকে গ্রহ বলা হয়। নক্ষত্রের মতো এদের ভেতরে তাপ এবং আলো সৃষ্টি হয় না। আমাদের সৌরপরিবারে এ পর্যন্ত ৯টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

Pulsar (পালছার) ঃ নিউট্রন স্টার থেকে নির্গত আলোকরশ্মি (Radiation), যা নক্ষত্রের অক্ষের চতুর্দিকে প্রচণ্ড গতিতে আবর্তিত হয়ে থাকে।

Planetary nebula : ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের বাইরের দিকের স্তরের নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত গ্যাসপুঞ্জ যা মহাশূন্যে মেঘের ন্যায় ছড়িয়ে থাকে বিরাট এলাকা জুড়ে।

Prominence : সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, যা কখনও লম্বায় প্রায় চার লক্ষ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আট হাজার মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Protostar : একটি পূর্ণ নক্ষত্র সৃষ্টি হওযার পথে 'প্রাথমিক একটা পর্যায়', যে পর্যায়ে তখনও ঐ নক্ষত্রের কেন্দ্রে 'নিউক্লিয়ার ফিউশন' শুরু হয়ে পারমাণবিক চুল্লী চালু হয়নি।

Proton (প্রোটন) : পরমাণুর অভ্যন্তরে পজেটিভ চার্জযুক্ত ক্ষুদ্র কণিকা, যা নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সাথে মিলিত হয়ে অবস্থান করে। এর ওজন হচ্ছে $1.67 \times 10^{27} kg$ ।

Photon (ফোটন) : আলোর ক্ষুদ্রতম কণিকাই হচ্ছে 'ফোটন'। মহাশূন্যে এর চলার গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল।

Parsec (পারসেক) : ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ সমান এক 'Parsec'. মহাশূন্যে ব্যাপক-বিশাল দূরত্বের হিসাবকে সংক্ষিপ্ত করে সহজ করার নিমিত্তে 'পারসেক' হিসাবের অবতারণা করা হয়েছে।

Quasar (কোয়াসার) : টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণকৃত সীমানার প্রায় শেষ প্রান্তে আবিষ্কৃত খুবই উজ্জ্বল মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক, যা দেখতে একটি নক্ষত্রের মতো কিন্তু এটা উজ্জ্বলতা ছড়ায় প্রায় ১০,০০০ মিলিয়ন গড় গ্যালাক্সির তেজস্ক্রিয়তার সমান এবং আলো ছড়ায় প্রায় ১০০টি গড় গ্যালাক্সির আলোর সমান।

Radiation (তেজস্ক্রিয়তা) : কোন বস্তু থেকে নির্গত তাপ যা শক্তি হিসেবে ঢেউয়ের (Wave) মতো চলার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে।

Red gaint (লাল বামন) : আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় নক্ষত্রের ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত, যখন তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কমে গিয়ে আয়তনে বহুগুণে বেড়ে যায়।

Satellite (উপগ্রহ) : মহাশূন্যে কোন গ্রহকে অপর কোন বস্তু কক্ষপথে আবর্তন করতে থাকলে ঐ আবর্তনকারী বস্তুটিকে উপগ্রহ বলা হয়। যেমন চাঁদ

পৃথিবীর উপগ্রহ। মানুষের তৈরী উপগ্রহ ও মহাশূন্যে (Satellite) পৃথিবীকে, চাঁদকে আবর্তন করছে, তবে শর্ত হচ্ছে উপগ্রহের আবর্তনগতি আবর্তনকৃত বস্তুর কমপক্ষে 'মুক্তগতির' সমান হতে হবে।

Solar System (সৌর জগৎ) : একটি নক্ষত্রকে ঘিরে যে কয়টি গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহাণু চতুর্দিকে আবর্তন করে এবং নক্ষত্রের অভিকর্ষবলের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকে, নক্ষত্রসহ ঐ সকল গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহাণুগুলোকে একত্রে সৌরজগত বলা হয়ে থাকে।

এক কথায় নক্ষত্রের চারদিকে কক্ষপথে আবর্তনশীল সকল বস্তুকে একত্রে সৌরজগত নামে অভিহিত করা হয়।

Solar wind : সূর্যের পৃষ্ঠদেশ (Surface) থেকে মহাশূন্যে অদৃশ্য ক্ষুদ্র বস্তুকণার (Invisible particles) অনবরত যে আলোক ধারা (Stream) প্রবাহিত হতে থাকে, এটাই Solar wind।

Space Craft : মহাশূন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানকার্যে পরিভ্রমণ করার জন্য যা আকাশযান রূপে তৈরী করা হয়।

Space probe : মনুষ্যবিহীন আকাশযান, এর কাজ হচ্ছে মহাশূন্যে মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কসমূহের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরক্ষণে তা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের নিকট প্রেরণ করা।

Space Shuttle : যে আকাশযানের (Space craft) মাধ্যমে নভোচারী এবং প্রয়োজনীয় মালামাল মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়, তাকে Space shuttle বলে। একে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয় কিন্তু অবতরণ করে বিমানের মতো। Space shuttle বার বার ব্যবহার করা যায়।

Space Station : এটা বড় ধরনের মনুষ্যবাহী উপগ্রহ বা Satellite মহাশূন্যের মধ্যে, মহাশূন্যে দীর্ঘ সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানকার্য চালাবার জন্য একে ভাসমান ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Universe (মহাবিশ্ব) : মহাশূন্যে বিরাজমান সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসমূহ যে আয়তনের জায়গায় বিস্তৃত হয়ে আছে, ঐ স্থান এবং বস্তুসমূহসহ পুরোটাকেই মহাবিশ্ব বলা হয়।

Sun (সূর্য) ঃ একটি মাঝারি ধরনের নক্ষত্র, যা আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এর অভ্যন্তরে 'ফিউশন' পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন তাপ ও আলো ছড়িয়ে গোটা সৌরজগতকে ভাসিয়ে রাখছে।

Supergiant star ঃ খুবই উজ্জ্বলতা সম্পন্ন বৃহৎ নক্ষত্র। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েক মিলিয়ন বছর। নক্ষত্র যত বড় হবে তার আয়ুষ্কাল তত কম হবে।

Supernova (সুপারনোভা) ঃ বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রের (Supergiant star) ধ্বংসজনক 'মহা বিস্ফোরণ-ই হচ্ছে 'সুপারনোভা', যা কল্পনাতীত আলো এবং উত্তাপ সৃষ্টি করে থাকে। এই সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেয় 'নিউট্রন স্টার' কিংবা 'ব্ল্যাক হোল'।

Star (নক্ষত্র) ঃ অবিরত বিস্ফোরণশীল গ্যাসীয় বল যার ভেতর থেকে উৎপন্ন হয় আলো এবং তাপ (Light and heat). আমাদের সূর্য অনুরূপ একটি নক্ষত্র।

X-ray (এক্স-রে) ঃ খুবই সংক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Short Wave length) বিশিষ্ট 'ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন', জীব এবং প্রাণীদেহের জন্য খুবই বিপদজনক আলোকরশ্মি।

Year (বছর) ঃ একটি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে কক্ষপথে একবার আবর্তন করে আসতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ঐ সময়ের দৈর্ঘ্যকেই 'বছর' বলা হয়। পৃথিবী ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট ও ৪৭ সেকেণ্ডে সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে একবার ঘুরে আসে, যা গণনায় এক বছর ধরা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. আল-কুরআনুল কারীম– ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ইং।
2. The Holy Quran- Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Saudi Arabia.
3. The Translation of The Holy Qur'an in Simple English- SMH, QADRI.
4. তাফহীমুল কুরআন– সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)।
5. Guide to Space-Peter Bond-1999.
6. Night Sky-Discovery Channel-1999.
7. A Photographic Tour of the Universe-Gabriele Vanin- 1996.
8. The Search for Infinity-Gordon Farser, Egil Lillestor & Inge sellevag- 1999.
9. The Universe Revealed-Pam Spence- 1996.
10. Astronomy From the Earth to the Universe-Pasa Choff-1995.
11. Stars & Planets-Ian Ridpath-1997.
12. Astronomy & Space-Lisa Miles and Alastair Smith- 1999.
13. Astronomy Dictionary-Philip's – 1999.
14. Inventions-G.I.Brown – 1996.
15. Man in Space – Eugene A. Cernan – 1999.
16. The Changing Universe, Big Bang and After-Trinh Xuan Thuan – 1993.
17. Astronomy & Astrophysics – Zeilik, Gregory – 1998.
18. Space Atlas – Robin Kerrod – 1996.
19. Embracing Earth – Payson R. Stevens and Kevin W. Kelley – 1992.
20. The Universe Explained – Colin Ronan – 1994.

21. The Visual Dictionary of the Universe – Eywitness Visual Dictionaries - 1994.
22. How the Universe Works-Eyewitness Science Guides-1994.
23. Inventors and Discoveres-Changing Our World-1988.
24. LIFE-Eyewitness Science-1996.
25. ECOLOGY-Eyewitness Science-1995.
26. Guinness Book of Knowledge-1997.
27. Force & Motion- The Science Museum, London-1993.
28. MATTER-The Science Museum-1992.
29. Time & Space-Eyewitness Science-1994.
30. Astronomy- Eyewitness Science – 1995.
31. Atlas of the Universe – Patrick Moore – 1999.
32. Qur`an for Astronomy and Earth Exploration from Space- S. Waqar Ahmed Husaini-1996.
33. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১ কাজী জাহান মিয়া
34. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-২ কাজী জাহান মিয়া
35. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান- ড. মরিস বুকাইলি-১৯৮৬
36. মহাকাশের হাজারো জিজ্ঞাসা – সুধাংশু পাত্র-১৯৮৫
37. চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব– অনুবাদক ঃ সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান–১৯৯৫
38. The Universe Seen Through The Quran – Mir Anees-ud-din – 1999.
39. Great Scientific Discoveries – Chambers Compat Reference-Gerald Messadie – 1992
40. Astronomy Magazine (U.S.A), from July – 1998 to June 2000.
41. Astronomy Magazine (England), from July 1998 to June 2000

‘কোয়াসার’ জাহান্নামের
এক বিস্ময়কর নিদর্শন

একটি কোয়াসার-এর
মধ্যে লক্ষ-লক্ষ,
কোটি-কোটি নক্ষত্রের
ঠাসাঠাসিভাবে অবস্থান,
ভয়ংকর এক অগ্নিদূর্গে
পরিণত হয়ে
মহাবিশ্বের মহাকাশে
প্রদক্ষিণ করে চলেছে।
কোয়াসার আবিস্কার
বিজ্ঞানবিশ্বে আজ
আতঙ্ক ছড়িয়ে
দিয়েছে।